জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭

বৃক্ষ রোপণ করে যে
সম্পদশালী হয় সে

স্মরণিকা

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭

স্মরণিকা

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

জাতীয় বৃক্ষরোপণ ২০১৭
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

উদ্বোধন
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
আগারগাও

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৭
বানিজ্যমেলার মাঠ
শেরে বাংলানগর, ঢাকা

সম্পাদকমন্ডলী
মোঃ জায়েদ হোসেন ভূইয়া
জহির উদ্দিন আহমেদ
অবনী ভূষন ঠাকুর (পিএলআর)
মোঃ সাহাব উদ্দিন

বন অধিদপ্তর বাংলাদেশ
কর্তৃক প্রকাশিত

Pulished by
Forest Department Bangladesh

ডিজাইন ও মুদ্রণ
এনভিশিও, ২/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২ ৯৫৮৭৯৪২

প্রকাশকাল
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বৃক্ষরোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে	মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী	১৩
রোম নয়া রোমা (ভ্রমণ কাহিনী)	মোঃ জায়েদ হোসেন ভূইয়া	১৬
Agro Forestry In Bangladesh :an Overview	Md.Yunus Ali	১৯
ECONOMIC VALUATION OF ECOSYSTEM GOODS AND SERVICES (EGS) AND ECO-SENSITIVE DECISIONMAKING: A CRITICAL ANALYSIS FOR BANGLADESH MNGROVES	Shaikh Mizanur Rahman	২১
Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project Highlights	Uttam Kumar Saha & Md. Iklil Mondal	৩৩
Synergies between forestry and other sectors in Bangladesh	Laskar Muqsudur Rahman	৩৬
Haors in Bangladesh and its Biodiversity	Ashit Ranjan Paul & Md Golam Rabbi	৪৫
আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাঘ সংরক্ষণের গুরুত	ড. তপন কুমার দে	৪৭
Restoring Forest Ecosystems	Ram Sharma	৫৫
Development of Sustainable Forestry Plantations in Bangladesh-Myths and Realities	Dr. Mohammed Kamal Hossain	৬২
বৃক্ষরোপণ: ভাবনায় বাংলার বুনো ফল	ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন	৭১
সাঙ্গু নদীর উজানে	মনিরুল এইচ খান	৭৩
Protected Areas and Ecotourism in Bangladesh	Professor Md. Jasim Uddin	৭৮
ওয়ান হেলথ : পরিবেশ, প্রাণি ও মানব স্বাস্থ্যের যৌথ যাত্রা	অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, ডাঃ এইচ বি এম গোলাম মাহমুদ, মোঃ জাহিদুল কবির	৮৩
Forest Genetic Resources in the CHT Headwater Reserve Forests	Dr. Md. Zahidur Rahman Miah	৮৬
Development aid in the forestry sector of Bangladesh: politics and implications	Dr. Md.Saifur Rahman, & Dr. Lukas Giessen	৯১
মহামায়া ইকো-পার্ক ঃ ইকো-ট্যুরিজম সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ	ড. মোঃ জগলুল হোসেন	৯৫
Forest Academy, Chittagong.	Neela Dutta	১০১
The National Land Representation System of Bangladesh.	Rashed Jalal, Mariam Akhter, Khan Zarin Tasnim	১০৫
বৃক্ষ ও চট্টগ্রাম শহর	জয়দীপ দে	১১২
Potential of rubber wood- as a source of timber	Dr. Khurshid Akhter	১১৪
Importance of Zoonosis in Captive Wildlife Conservation	S M Golam Mowla	১২০
DRONES FOR WILDLIFE CONSERVATION	Md. Modinul Ahsan	১২৮
A Short Focus on Soil Erosion in Bangladesh	Dr. Mohammad Zahirul Haque	১৩৫
আগর প্রজাতির বনায়নে বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে অধিক লাভ	এম এ তাহের হোসেন	১৩৯
বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেত চাষাবাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা	শেখ এহিউল ইসলাম, মোঃ মাহাবুব আলম, মোহা. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া	১৪১
আমাকে বৃক্ষ করে দাও	মোঃ জায়েদ হোসেন ভূইয়া	১৪৭
Medakocchopia National Park: Challenges to overcome	Mohammad Yousuf	১৪৮
সবুজ হবে মোদের মন	এ,বি,এম নজরুল ইসলাম	১৫২
টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন সংরক্ষণ: সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস -২০১৭	মার্জিয়া লিপি	১৫৩
জাতীয় স্বার্থে বন সৃজন অপরিহার্য	আফতাব চৌধুরী	১৫৭

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

বাণী

দেশের বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ০৪ জুন, ২০১৭ থেকে তিন মাসব্যাপী 'জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৭' শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। মানুষের জীবন ধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেনসহ বিভিন্ন উপকরণ আমরা পেয়ে থাকি বৃক্ষ থেকে। তাই বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু। একটি বীজ কিংবা চারা মাটিতে রোপণ করে রাখলেই এক সময় সেটি সম্পদে পরিণত হয়। তাই এ বছরের গৃহীত প্রতিপাদ্য "বৃক্ষরোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে"- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা বাংলাদেশকে আরও সবুজময় করতে অধিক হারে বৃক্ষ রোপণের জন্য আমি দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

সামাজিক বনায়নের জন্য যারা লভ্যাংশ পাচ্ছেন তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৬" এবং "বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ করজারভেশন-২০১৭" অর্জন করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বেশী বেশী বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা হলেও কমাতে পারি। আসুন নিজে গাছ লাগাই, অন্যকেও গাছ লাগাতে উৎসাহিত করি।

আমি 'জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৭' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ-বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

বাণী

বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা বিষয়ে দেশের জনগণকে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।
জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার এবারের প্রতিপাদ্য 'বৃক্ষরোপন করে যে, সম্পদশালী হয় সে' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানব সৃষ্ট কর্মকান্ডের বিরূপ প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তন ঘটছে জলবায়ুর। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ূ পরিবর্তন রোধ করে বৃক্ষই পারে ধরণীকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে।

জীবন ও জীবিকার জন্য বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। অক্সিজেন, আসবারপত্র এবং নির্মল সবুজের উৎস হচ্ছে বৃক্ষ। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয়রোধ, মরুকরন রোধ, কার্বন আধার তৈরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোবাবিলায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, জ্বালানী ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে দেশের বানাঞ্চলের ওপর চাপ বাড়ছে। বৃক্ষের সবুজ বেষ্টনী ঝড়-ঝঞ্জা ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাস করে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। তাই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বৃক্ষরোপণকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ জারি করেন। পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা পরিবেশের উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃজনে বৃক্ষের অবদান অনুধাবন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায়, সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথের দুই পাশে, চরভূমি, বাড়ির আঙিনা ও চারপাশ, পতিত ও অন্যান্য প্রান্তিক ভূমিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এ দেশকে আরও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি সকলের প্রতি উদাও আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছর যাঁরা 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৬', 'বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ২০১৭' অর্জন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

বাণী

বৃক্ষ মানুষের শুধু বন্ধুই নয় জীবন জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশও। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা থেকে শুরু করে জীবনধারণের উপকরণ সরবরাহ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃক্ষ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও ০৪ জুন থেকে তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এ আয়োজনে দেশবাসীকে অংশগ্রহণের জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণের মাধ্যমেই নগণ্য বিনিয়োগে কয়েকশতগুণ বেশি সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। তাই এবারের বৃক্ষরোপণ অভিযানের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "বৃক্ষরোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে"।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি এ আয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগুহণ থাকবে।

এ বছর যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরুস্কার-২০১৬" এবং "বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন-২০১৭" অর্জন করেছেন তাদের সকলের জন্য আমার অভিনন্দন। আশা করছি দেশবাসীর অংশগ্রহণে তিন মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা সাফল্য মন্ডিত হবে।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি

উপমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

বাণী

বৃক্ষরোপণ একটি সমৃদ্ধশালী খাত। জীবন ও জীবিকার জন্য বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃক্ষরাজি তপ্ত পৃথিবীকে স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় রূপান্তর করে বাসোপযোগী করে তুলছে, প্রাণ দান করছে নিযুত প্রাণির মাঝে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগান দিচ্ছে অন্ন, বস্ত্র এবং চিকিৎসার। অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহে অনাদিকাল থেকে বৃক্ষ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

জনগণকে সম্পৃক্ত করে সৃষ্ট সামাজিক বনায়ন দরিদ্র জনগণের জীবিকার দ্বার উন্মোচিত করেছে। পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারকে সাবলম্বী করে তোলা, অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অন্য নির্মল পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক বনায়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য বিষয় "বৃক্ষ রোপণ করে যে, সমৃদ্ধশালী কয় সে" মথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বন বনানীর কূজনে ঘেরা বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আজ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বৃক্ষ ও বৃক্ষরাজির ভূমিকা অপরিসীম। বৃক্ষ দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির চালিকা শক্তি। প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য প্রতিটি দেশের প্রয়োজন ২৫ভাগ বনভূমি। সে তুলনায় বাংলাদেশে বনের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রয়োজন সীমিত বনভূমিতে সকলের সহযোগিতায় বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃজনে বৃক্ষের অবদান অনুধাবন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাই সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে বসতবাড়ীর আঙ্গিনা, পতিত ও প্রান্তিক ভূমিসহ সর্বত্র ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রমে দলমত নির্বিশেষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমি সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

এ বছর যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৬", "বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ করজারভেশন ২০১৭" এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নে লভ্যাংশ পেয়েছেন আমি তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০১৭ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এম.পি

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ উপলক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের শুভেচ্ছা।

জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ
সভাপতি

জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু
সদস্য

জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব
সদস্য

জনাব নবী নেওয়াজ
সদস্য

জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী
সদস্য

জনাব টিপু সুলতান
সদস্য

জনাব মজিবর রহমান চৌধুরী
সদস্য

জনাব মোহাঃ গোলাম রব্বানী
সদস্য

জনাব মোঃ ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী
সভাপতি

বেগম মেরিনা রহমান
সভাপতি

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৪ জুন ২০১৭

বাণী

বৃক্ষ প্রকৃতিক একটি নয়নাভিরাম ও উপকারী উপঢৌকন; জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং শিল্পের প্রসারে বৃক্ষের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বৃক্ষের প্রধান আধার বন। কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্বির কারণে বৃক্ষ নিধন করে বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর, নগরায়ন, শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠাসহ বহুবিধ কারণে বাংলাদেশে বনের পরিমান আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে, হারিয়ে যাচ্ছে জানা অজানা প্রাণী ও উদ্ভিদসহ প্রাণ বৈচিত্র্যের অনেক উপাদান। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে বনভূমি সুরক্ষা করে ক্রমাগত বন সৃজনসহ সরকারি বনভূমির বাইরে উপযোগী স্থানে বৃক্ষরোপনের বিকল্প নেই।

ভৌগলিক অবস্থান এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় বৃক্ষের পরিমাণ কম থাকায় ভূমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা হ্রাস, পাহাড়ী ভূমি ধস, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে নির্ধারিত বনায়নসহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যাপক বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

দেশের পতিত ও অব্যবহৃত প্রতিটি স্থানে যেমন বসতবাড়ী, শহরের বাড়ীর ছাদ, প্রতিষ্ঠান, পার্ক, সড়ক-মহাসড়কের পাড়, বেড়ীবাঁধ, চরভুমি ইত্যাদি স্থানে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের উপার্জন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই সব ধরনের ভূমিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "বৃক্ষরোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে"। সে লক্ষ্যে এ বছরের বৃক্ষরোপণ অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যা করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বছর যারা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরষ্কার ২০১৬", "বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ২০১৭" এবং উপকারভোগী সামাজিক বনায়ন হতে লভ্যাংশের চেক পাচ্ছেন আমি তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি "জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ইসতিয়াক আহমদ

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৬ শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ২০১৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেঁতুল গাছের চারা রোপন করে
জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৬ শুভ উদ্বোধন করেন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপনে
প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপনে
প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় পবিেশ ও বন মন্ত্রী জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৬ এর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন

বিশ্ব পরিবেশ দিরস এবং জাতীয় বৃক্ষরেপণ অভিযান ২০১৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বৃক্ষ রোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে সারাদেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বছর জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উদযাপন এবং বন বিভাগ কর্তৃক সামাজিক বানায়ন কর্মসূচী চলমান থাকায় এ দেশে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বৃক্ষ রোপণের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে অনেকেই ইতোমধ্যে বৃক্ষ রোপণ করে সম্পদশালী হতে পেরেছেন। বৃক্ষ রোপণের ফলে একদিকে যেমন বৃক্ষ রোপণকারী তাঁর পরিবারের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছেন, পাশাপাশি পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলা কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সারাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধিসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা পাচ্ছে। ভূমির ক্ষয় রোধ হচ্ছে এবং কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে লাভবান হচ্ছে এদেশের অর্থনীতি। প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ আয়োজন করা হয়েছে। এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে "বৃক্ষ রোপণ করে যে, সম্পদশালী হয় সে"।

ঘরের আশেপাশে, বসতভিটায়, পতিত জায়গায়, রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ এ দেশের সাধারণ মানুষের সহজাত অভ্যাস। বনজ, ফলজ, ঔষধী গাছসহ প্রায় সব ধরণের প্রজাতির গাছ লাগাতে মানুষ পছন্দ করেন। তবে এলাকা ভিত্তিক উপযুক্ত প্রজাতির গাছ নির্বাচন, নির্বাচিত প্রজাতির গাছের উৎপাদনশীলতা বা গুনগত মান নির্ধারণ, সৃজিত চারার রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ তথ্য সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে বৃক্ষ রোপণের সুফল আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ইতোমধ্যে প্রায় ৬.০ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষকে নার্সারীতে গাছের চারা উত্তোলন, বনায়নের জন্য প্রজাতি নির্বাচন, বৃক্ষ রোপণ কৌশল, সৃজিত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এদের অনেকেই ইতোমধ্যে গ্রাম পর্যায়ে নার্সারী স্থাপন করে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা উত্তোলন ও বিপনন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং তাতে স্বাবলম্বী হয়েছেন। অনেকেই আবার গণমুখি সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করে এ কার্যক্রমকে স্বার্থক করে তুলেছেন এবং নিজেও তার লভ্যাংশের টাকা গ্রহণ করে সম্পদশালী হয়েছেন। সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণ করে এ বছর শ্রেষ্ঠ পুরুষ উপকারভোগী হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলা নিবাসী জনাব মোঃ লোকমান হোসেন ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৯৬ টাকার চেক এবং শ্রেষ্ঠ মহিলা উপকারভোগী হিসেবে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলা নিবাসী মোছাঃ কদবানু ৭ লক্ষ ৭২ হাজার ২০০ টাকার চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত হতে গ্রহণ করবেন।

সামাজিক বনায়ন এখন একটি সফল কর্মসূচী এবং এতে গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে যেমন জীবিকা নির্বাহের পথ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলকে পুনরায় বৃক্ষাচ্ছাদনের আওতায় এনে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। আজ অবধি সামাজিক বনায়নেয় আওতায় সৃজিত বাগানে মোট ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৬২৭ জন উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে ০১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৩৬ জন মহিলা উপকারভোগী। এ যাবৎ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮০ জন উপকারভোগীকে নগদ ২৬১ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩৭ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সামাজিক বনায়নের আওতায় ১০,০০০ জন উপকারভোগীর মাঝে লভ্যাংশ বাবদ ২৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯ শত টাকা বিতরণ করা হবে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ২০১৬-২০২০ মেয়াদে দেশের বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির শতকরা হার ২০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ কার্যক্রমকে স্বার্থক করার জন্য চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বন বিভাগ কর্তৃক প্রায় দুই কোটি চারা উত্তোলন করা হয়েছে যা ব্লক বাগান ও স্ট্রিপ বাগান সৃজনসহ বিক্রয় বিতরণে কাজে লাগানো হবে । উল্লেখ্য যে, বেসরকারী পর্যায়েও বিভিন্ন নার্সারীতে প্রচুর চারা উত্তোলন করা হয় এবং তা সারা দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সুরক্ষাসহ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৩৯৮ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর।

রক্ষিত এলাকা রয়েছে যার মধ্যে মোট ২১ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ১৭টি জাতীয় উদ্যান ও ১টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা রয়েছে। পাশাপাশি ৪৭৩৮০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ২টি শকুনের নিরাপদ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকৃতি সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম সুবিধা সৃষ্টির জন্য ৮৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৮টি ইকোপার্ক, ২১ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ২টি সাফারি পার্ক, ২টি উদ্ভিদ উদ্যান ও ১টি এভিয়ারী পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১৯ টি জেলায় বসবাসকারী মানুষ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য উল্লেখিত জেলাসমূহে সবুজ বেষ্টনী তৈরীর জন্য ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে উঠা চর সমূহে উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে চরের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ যাবৎ প্রায় ২.০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় উপকূলীয় বনায়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর চরভূমি কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় যেমন দরিদ্র জনগোষ্টির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ভাবে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে হাজারো মানুষের জীবন মাল রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যাই থাকুক না কেন এ জনপদের জান-মাল রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করার বিকল্প নেই।

বিশ্ব ব্যাপী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয় ও মরুময়তা রোধ, কার্বন নিঃসরণ কমানো, মহিলাদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। বৃক্ষ রোপণ মানুষকে শুধু সম্পদশা-লীই করে না বরং তা মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন ভাবে অবদান রাখে যেমনঃ পণ্য উৎপাদনে, অর্থনৈতিক উৎপাদনে, বাস্তুসংস্থান ভিত্তিক সেবা প্রদানে ও সাংস্কৃতি ও নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে কাঠ আহরণ বন্ধ থাকায়, দেশের আনাচে কানাচে ও বসতবাড়ীতে বৃক্ষ রোপণ করে কাঠ ও জ্বালানী কাঠ উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে আট মিলিয়ন ঘন মিটার জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ৫.১০ মিলিয়ন ঘন মিটার জ্বালানী কাঠ শুধুমাত্র গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহৃত হয়। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ জ্বালানী কাঠ গ্রামাঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। গ্রামাঞ্চলে জ্বালানী কাঠের বিকল্প না থাকায় গ্রামের জনগণ রান্না-বান্নাসহ অন্যান্য কাজের জন্য জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট স্ট্রীপ বাগান থেকে প্রাপ্ত মধ্যবর্তীকালীন আহরিত ডাল-পালা জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নয়নশীল দেশে ভূমিহীন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য অপ্রধান বনজদ্রব্য জীবন-জীবিকার উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। বাড়িঘর তৈরী করার জন্য কাঠ, ফার্নিচার ও রান্নার জন্য জ্বালানী কাঠ, খাবারের জন্য খাদ্য, চিকিৎসার জন্য ঔষধ ইত্যাদির চাহিদা পূরণেও বৃক্ষ রোপণের বিকল্প নেই। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব অনেক। বাংলাদেশে জিডিপিতে বন সেক্টরের অবদানের পরিমাণ প্রায় ১.৫ শতাংশ। যদিও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার, অপ্রধান বনজদ্রব্যের অবদান এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে হিসাব করা হয় না। বৃক্ষ রোপণ ব্যাপক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ ভাগ মানুষ বন সেক্টরের বিভিন্ন কাজে জড়িত। পাশাপাশি সুন্দরবনের মাওয়ালী, বাওয়ালী এবং মৎসজীবি প্রায় ০.৪ মিলিয়ন লোক সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। একটি গাছ মানে একটি কার্বন আধার। গ্রীণ হাউজ এফেক্টসহ বায়ু দুষণের অন্যতম উপাদান কার্বন বৃক্ষের মাধ্যমে শোষিত হয়ে বৃক্ষের অভ্যন্তরে মজুদ থাকে। এ কার্বন বৃক্ষের অভ্যন্তরে মজুদ থাকায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন ইত্যাদির মত ক্ষতিকর গ্রীণ হাউজ গ্যাস বায়ুমন্ডলে কমে গিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রশমিত হয়। সুন্দরবনে মোট ১৬০ মিলিয়ন টন কার্বনের স্টক পাওয়া গেছে যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিরল দৃষ্টান্ত। এক জরিপে দেখা গেছে ইনানী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ৪.৯৬ মিলিয়ন টন, দুধপুকুরিয়ায় ৬.৬৪ মিলিয়ন টন, ফাঁসিয়াখালী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ১.২২ মিলিয়ন টন, সীতাকুন্ড সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ১.০৪ মিলিয়ন টন, মেধাকচ্ছপিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ০.২৬ মিলিয়ন টন এবং টেকনাফ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ৯.৫৯ মিলিয়ন টন কার্বন আবদ্ধ আছে।

বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই বৃক্ষের পত্র পল্লব, বাকল দ্বারা এবং বনের মেঝে বিয়োজিত ও অবিয়োজিত জীবাংশ দ্বারা শোষিত হয়। বৃক্ষের কারণে বৃষ্টিপাতের গতিবেগ হ্রাস পেয়ে, বৃক্ষের শিকড়ের কারণে ভূঅভ্যন্তরে ফাটল সৃষ্টি জনিত কারণে ভূপৃষ্ঠ ছিদ্রময় হওয়ায়, হিউমাসের কারণে ভূপৃষ্ঠ স্পঞ্জের মত হওয়ায় ভূমিতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে বৃষ্টির

পানির অধিকাংশই ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের উচ্চতার বৃদ্ধি ঘটায়। এতে সারা বছর পাহাড়ী ঝর্ণা, ছড়া ও নদ-নদীর পানি প্রবাহ অব্যাহত থাকে। বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকায় সুষম তাপমাত্রা বিরাজ করে। সাধারণত বৃক্ষহীন এলাকার তুলনায় বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশী হতে দেখা যায়। বৃক্ষাচ্ছাদনের কারণে ভূমির ক্ষয় রোধ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। গাছপালা মাটির গঠন, বুনন, বিক্রিয়া, উর্বরতা, গভীরতা ইত্যাদি ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর অনুকূল পরিবর্তন ঘটিয়ে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হ্রাসে বৃক্ষ রোপণ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এক সময়ে জীব-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে জীব-বৈচিত্র হুমকীর মুখে পড়েছে। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নগর জীবনের ব্যস্ততার ফাঁকে আনন্দ ও প্রাশান্তির প্রত্যাশায় মানুষ ছুটে চলে নির্মল প্রাকৃতিক বন ও বনানীর কাছে। সারা বিশ্বে ইকো-ট্যুরিজম বা পরিবেশ পর্যটন ১টি জনপ্রিয় শিল্প হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক বিকাশ ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টিতেও বৃক্ষ রোপণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রখর সূর্য কিরণের সময় ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত পথিক, শ্রমিক, দিন মজুর, রিক্সাচালক, কৃষক ও অন্যদেরকে বৃক্ষের ছায়া অনাবিল তৃপ্তি ও শান্তি দেয়। এতে তাদের কর্মস্পৃহা ও কর্মদক্ষতা বাড়ে। তাই বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে নিজেকে সম্পদশালী করাসহ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাড়ির আঙিনা ও চারপাশ, পতিত ও প্রান্তিক ভূমি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তার পাশে, বসৎ ভিটায় বৃক্ষ রোপণের এ মহৎ উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই।

রোম নয়া রোমা

(ভ্রমণ কাহিনী ২৫ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর/১৬)

মোঃ জায়েদ হোসেন ভূইয়া

২৫শে নভেম্বর যখন বিকাল ৪.০ টায় রোম শহরের উপর তার্কিস এয়ার ডলফিনের মতো একবার ডানে একবার বামে ঝাকি খাচ্ছিলো, আমি জানলার পার্শ্বে সম্পূর্ণ একা নিশ্চুপ। থিতু হয়ে হীম হয়ে ছিলাম। নিচে পাহাড় টিলাগুলো বরফে আবৃত, উপত্যকাগুলো বরফের চাদরে মোড়ানো। কিছু এলাকায় সাজানো গুছানো ছোট ছোট খামার বনায়ন। গাছগুলো কি বোঝা যাচ্ছিলো না? হঠাৎ গমের ক্ষেত, একটা দু'টো খামার বাড়ি। কখনও উঁচু উঁচু পাহাড়ী পথ। হঠাৎ হঠাৎ একটি দু'টো লরি চলে যাচ্ছিলো। বিমানটি মাতালের মতো দুলছিলো, আর রোম শহর কপালে রুপোলি ডিমের কুসুমের মত টিপ পড়ে লাল গালে টোল ফেলে হাসি নিয়ে সেজে বসেছিলো। সে কি মনোমুগ্ধকর পরিস্থিতি। আমি নির্বাক! পার্শ্বে অনুভূতি শেয়ার করার মত কেউ নেই। তখন অন্তর আত্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই তুই কি ভাবছিস? অন্তর আত্মা অনেকক্ষণ বোবা হয়ে গিয়েছিলো, ও মনে মনে ভাবছিলো? জীবনে প্রথম ইউরোপ তাও আবার ভেনিসের বোন রোমকে দেখা, ছোঁয়া এবং একটু পর তার বুকে ঠাঁই নেয়া। যেমন হঠাৎ শিশু মাকে হারিয়ে, ফিরে পেয়ে নির্বাক হয়ে থাকার মতো। তার্কিস বিমান ধিরে ধিরে ডানায় ভর করে এক সময় কাকড়াঁর মতো পা বের করে রোম এয়ারপোর্ট ছুঁয়ে দিল। অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রাতজাগা পাখির মতো একা একা বিমান থেকে বের হলাম। সবাই অপরিচিত, বাহির হয়ে অপেক্ষায় সাদা টেক্সি। হঠাৎ বাঙালীর গলা, স্যার কই যাইবেন? প্রথম স্তব্ধ এবং অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞাস করলাম, আপনার টেক্সির কি রং? বললো কালো। একটু থতমত খেয়ে বললাম, আমার সাদা টেক্সি চাই? এরপর নোয়াখালী ড্রাইভার বললো, স্যার কালোও বৈধ। হায়রে দেশী, সুদুর রোমে। স্যার ভাড়া একটুও বেশী নিবো না। মিটার দেখে ভাড়া দিবেন। অবশেষে ওকে বললাম, আপনার টায় যাবো না। পরে সাদা টেক্সি চড়ে রওনা দিলাম। ড্রাইভার লিবিয়ান। জিপিএস দেখে দেখে বিশাল নিরিবিলি রাস্তায় ছুটে চললো রোম শহরের দিকে। ও আমাকে বললো, আমরা বলি 'রোমা' রোম নয়। আমি বললাম, কত সময় লাগবে? ও বলে আধ ঘন্টার বেশী। বিশাল স্বরণীর লেন বেয়ে আশি মাইল স্পিডে চালালো। মাঝে মাঝে অন্য ভাষায় কার সঙ্গে যেনো কথা বললো, কিছু বুঝলাম না। তখন দেশী ড্রাইভারটার কদর বুঝলাম।

রাস্তার পার্শ্বে লাগানো গাছের সারি। মাঝে নানা রকম ঝোঁপ, মাঝে মাঝে লতা -গুল্ম। আমি যখন তার্কিস বিমানে ঢাকায় নির্দ্ধারিত সিট পাওয়ার পর নিজের সীটে বসলাম। পাশের সিটে যিনি বসলেন, তার বয়স চল্লিশ এর উপর। পাসপোর্টের লাল রং দেখে প্রথম আলাপে জিজ্ঞাসা করলাম, আমেরিকা থাকেন? পরিবার কোথায় থাকে? বিয়ে করেছেন? বললো বিয়ে করার সময় পায় নাই। পরিবারের সবাই আমেরিকায় থাকে। উনি পৌর মেয়র আছেন। লাল পাসপোর্ট দেখালো কিন্তু কখনো বিদেশে যায় নাই। একটু অবাক হলাম কিন্তু কিছু বললাম না। একসময় তার্কি মুরগীর মৌ মৌ ঘ্রাণযুক্ত সুস্বাদু খাবার খেয়ে নাক ডেকে ডেকে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গলো নিচে তাকিয়ে দেখি একটি পানির সাগর কিন্তু আগুনের আলো। কোন রেড সি নামক কিছু হবে। তার প্রায় দুই ঘন্টা পর সকাল হলো। আবার ব্রেকফাষ্ট, আমরা তখন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। ওরহান পামুরের দেশে যিনি ২০০৬ সালে ''মাই নেম ইজ রেড" লিখে নোবেল পেয়েছিলেন, যা আমার সদ্য পাঠ করা ছিল।

ড্রাইভার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলো। হোটেলে লাগেজ নিয়ে ঢুকলাম। এক সুন্দরী রিসেপশনিস্ট ফরম এগিয়ে দিলো, আমি বলপেন দিয়ে নাম, ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে ফরম পূরণ করলাম। সব শেষ করার পর সুন্দরী এক কাপ কফি খেয়ে নিতে অনুরোধ করলো। রোমের ললনার অনুরোধ না রাখা ঠিক হবেনা। একখান ম্যাপ ধরিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়ান ও ভিক্টেরিয়ায় বাঙালীর হোটেলের খবর দিলো। রাতে রুমের হোটেলে ডিনার করে নিজের রাখা ফলমূল খেলাম।

সকালে এক মরিসাসের প্রফেসর ম্যাডামের পিছে পিছে এফ.এ.ও অফিসে হেটে হেটে গেলাম। সময় নিলাম আধ ঘন্টা। কনকনে ঠান্ডা কিন্তু প্রফেসর মহিলা দ্রুত হাটছিলেন। হাটছি আর গাছ, লতা, ঝোপ দেখছি অনেক গুলো অপরিচিত গাছে আমড়ার মতো ফল দেখলাম। হঠাৎ হঠাৎ বাঙালী শ্রমিক দেখলাম। মোবাইলে বাংলায় কথা বলছে। আমি ও কম্বোডিয়ান কনজারভেটর দ্রুত হাটছিলাম। মরিসাসের বাদামী মহিলা পেন্সিল হিলে দ্রুত হাটছিলেন। আমরা দ্রুত তাল মিলালাম। আমাদেরহোটেল একটি পুরাতন তিনতলা বাড়ী যা রিনোভেশন করা নাম, 'লেনচেট'। হোটেলের সামনে অনেক বড় বড় ওক ও

উপ-প্রধান বন সংরক্ষক

রোমের ফলের গাছ-গাছালি। এছাড়া রোমের সবাই দ্রুত গতিতে হিল পড়ে হেটে যায়, কথা বলার কোন সুযোগ দেয় না। আমি মাথা ঘুঁরিয়ে ঘুঁরিয়ে পাইন গাছ ও পাশে গির্জা আবার চার্জ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এত কেন? এবং এত উচুঁ বাউন্ডারী কেন? মানুষজন কোথায়? গাড়ী সব রাস্তায় পার্কিং কেন? সব উত্তর পেলাম ধিরে ধিরে। রাস্তার মধ্যে বাসগুলো ট্রামের মতো। মাটির নীচে মনোরেল। দুপাশে দুমুখে রাস্তা, মধ্যে রেলিগাড়ি ও ষ্টেশন। সাধারণ জনগণ ইংরেজী জানে না। ক্রমে ক্রমে বাঙালী কর্মচারীর শত শত দোকান পেয়ে গেলাম। যতই ওদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে চাইতাম, ওরা বলতো আপনি বাঙালী না। কি খাবেন, ফ্রি দেব বলেন? ফ্রি খাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলতাম, ডায়েবেটিস বুঝে শুনে খেতে হবে। প্রত্যেক হোটেলের দরজায় নায়িকা মাধুরী, ঐশ্বরিয়ার ও ক্যাটারিনার ছবি কেন? জিজ্ঞাসায় জানা গেলো, এগুলো পূর্বে ভারতীয়দের খাবার হোটেল ছিল।

প্রথম রাতে খাবার খেয়ে ফেরার পথে পথ হারিয়ে ফেলা এবং রাতের গভীরে বাঙালি ফুটপাতের দোকানি ভাইদের সহায়তায় আমার হোটেলে ফিরে আসা রোমাঞ্চকর স্মৃতিময় হয়ে রয়েছে। যদিও হারিয়ে যাওয়া সময়টায় ভয় ও আনন্দের, এখন মনে হয় 'আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা'। পরের দিন গাছ, লতা-গুল্ম চেনার চেষ্টা। চেনা যাচ্ছে না। বড় বড় গির্জার ঢং ঢং আওয়াজ, নিশ্চুপ নিরিবিলি সুনসান রোম শহর সকালবেলা বেশী স্নিগ্ধ লাগতো। কিন্তু বিকালে পায়ে হেটে একা একা যখন একঘন্টায় হোটেলে এফ.এ.ও অফিস হতে ফিরতাম, সেলফি তুলতাম, পাইন গাছের সারি সারি অভিবাদন গ্রহণ করতাম। বিশাল বিশাল পাইন গাছের নিচে সুন্দর কোনাকৃতি ফলটি হাতে নিয়ে নেড়ে দেখতাম। পাশের একটি দর্শনীয় স্থানে ঢুকে পড়লাম। তিন চার হাজার বৎসর আগের স্থাপনা অথবা রাজার বাড়ি। ঘরের ছাদ ভাঙ্গা কিন্তু দেয়ালগুলো পরিস্কার। বড় বড় জানালা। পুরাতন রাস্তার উপর সেই আমলের একটি কালভার্টের মতো পুল। পর্যটকগণ দেখছে, ছবি তুলছে, জোড়া হয়ে বসে আছে। অন্য রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার পর অনেকগুলো হকার ঘিরে ধরলো। কেহ বলে আন্টির জন্য চাদর নেন, কেহ বলে আঙ্কেল এক বোতল পানি নেন, কেহ বলছে সেলফির স্ট্যান্ড নেন। আমি একটু বিরক্ত হলাম। দুরে পুলিশের গাড়ীর সাইরেন। মূহুর্তে সবাই উধাও। আমি একটু অবাক হলাম। সবাই বোধ হয় অবৈধ শ্রমিক। একজন জানিয়েছিলো, ওরা হোটেলের কাজের পাশাপাশি বিকালে পর্যটন স্পটে ফেরি করে। না হলে দেশে টাকা পাঠাতে পারে না। রাস্ত-ঘাট, মার্কেট কোথাও এক টুকরা সিগারেটের শেষ অংশ খুজে পেলাম না। মনে মনে খুজছি, এত সিগারেট টানে পুরুষ/মহিলা, তাহলে শেষ অংশ কোথায় ফেলে। অবশেষে পেলাম। প্রতিটি দৃষ্টিনন্দন স্পটের পাকা দেয়ালে একটু দুইটি ইট সরিয়ে এসট্রের মতো করে রাখা রয়েছে। ঐখানে সবাই ওটাতে রেখে দেয়। পরিচ্ছন্ন কর্মীরা সব প্রতিদিন সরিয়ে নিয়ে যায়। একদিন রাত একটার পর ঘুম আসছিলো না, শীতের জন্য বিছানা থেকে উঠে জানালা দিয়ে খুঁজছি কোথাও ভুত, পরী জ্বীন ইত্যাদি কিছু খুঁজে পাই কি না, তা দেখার চেষ্টা করলাম? কিছু দেখলাম না। আবার ঘুমও আনতে পারলাম না। দূরে শুধু দেখলাম এক বাড়ীর একটা জানালার পাট খুলে গেছে বাতাসে, একটি টেবিল ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানের বাতাসের সাথে পর্দা তাল মেলাচ্ছে। কোথাও কোন জীবনের নড়াচড়ার ছাঁয়া দেখলাম না।

পরদিন নেপালী অফিসারের সাথে খুব ভাব হয়ে গেলো। ও অনেক তথ্য দিলো রোমের। ও জানালো, ভুলেও জুতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ না কিনতে। কারণ দেশে নিয়ে পস্তাতে হবে। শপিংমল সব রোম শহরের বাহিরে। বাংলাদেশী টাকায় আড়াই/তিন হাজার টাকা ভাড়া লাগে। তার উপর ইংরেজী কম বোঝে। লিবিয়ান মহিলার কাছ থেকে অল্প ইউরোতে নানা প্রকার ক্রিসমাসের মিষ্টি মন্ডা সস্তায় নিলাম, ও আবার মুসলিম শুনে কিছু ফ্রি দিলো। দিনের বেলা আমি ও নেপালী ফরেস্ট অফিসার যিনি আমার বয়সী অনেক গল্প হলো। ও আর আমি অনেক ছবি তুললাম ক্যামেরায়। এফ.এ.ও ছাদের বারান্দায় বিশাল বুফে লাঞ্চের ঘর। সব কিছু কিনে খেতে হয়। রোমবাসী একটু লতা-পাতা, পানিয় ও বিন জাতীয় খাবার খায়। আর আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খেয়ে থাকি। কোন মোটা পুরুষ/মহিলা দেখলাম না। এফ,এ,ও এর বার তলা ছাদ বারান্দায় দাড়ালে সুন্দর রোম শহর দৃষ্টিতে আসে। মনে হয় শিল্পির তুলিতে আঁকা ছবি। কোথাও উঁচু উঁচু ভবন নাই। কংক্রিটের জঙ্গল মনে হয় না। মনে হয় সবুজের মাঝে মাঝে সাজানো গুছানো একটি তৈলচিত্র। কোথাও কাক খুঁজে পেলাম না। জিজ্ঞাসায় জানা গেল ময়লা নাই। কাক খাবে কি? তিনদিনের ভিতর ওয়ার্কশপের সব জুনিয়রদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ইরানী মেয়ে অফিসার আমার কার্ড নিলো, কিন্তু জানালো ওর কার্ড নাই। সম্ভবতঃ ওর নাম মালিহা। আমার পাশে সুদানের ডিজি পরিবেশ বসতো। মাইক্রোফোনে যে কোন ভাষায় বক্তব্য দিলে সবার হেড ফোনে ভাষা রুপান্তরিত হয়ে যেত। বাংলাদেশ হওয়ায় আমি প্রথম সারিতে বসতাম। ওয়ার্কশপের প্রথমদিন ওয়ার্কশপের প্রধান ইভা মিলারের সাথে খুব পরিচিত হয়ে পড়লাম। শেষদিন নেপালী ফরেস্ট অফিসারের পর ওয়ার্কশপের সবাইকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানালাম। ওরা আমাদের সামাজিক বনের

সফলতা, টি.এফ.এফ ফান্ড ও উপকূলীয় বনায়নে পাইওনিয়ার হওয়ার গল্পটা শুনে মজা পেয়েছিল। ওয়ার্কশপটি ছিল ইউ.এন.ই.এফ. (UNEF) এর গ্লোবাল ফরেস্ট কাভার পরিমাপের ইনডেক্স বাহির করা এবং এমডিজি আলোকে পয়েন্ট ১৫ এর বিভিন্ন পয়েন্টে জীববৈচিত্র ও বনের গ্রীণ কাভার পরিমানের জন্য কমন বৈশ্বিক ইনডেক্স ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ণয় করা এবং পরবর্তীতে বৈশ্বিক বনের পরিমাপ ও কার্বনের পরিমাপ র্নিণয়ের সহায়তা করা। হয়তবা বলতে পারেন যে আমার বর্ণনাটা একটু বেশী বেশী বাহুল্যতায় পরিপূর্ণ। আমার লেখাটিতে আবেগ বেশী নেই। এর কারণ আমার বক্তব্য হিসাবে রোমান সাম্রাজের ইতিহাস আমার খুব কম জানা আছে।

আমি আসলে গ্রামের বাঙালি মানুষ। অনেক জনপদ. সভ্যতা, অনেক সি বিচ দেখেছি। কিন্তু আমার কছে সব সময় আমার গ্রাম, আমার মফস্বল শহরের নিশ্চুপ মেঠোপথ, আমাদের নিঝুপ দ্বীপ, মাধবকুন্ড, কুয়াকাটা, কক্সবাজার ও টেকনাফের সি বিচ, জাফলং, কাপ্তাই লেক, সাজেক ভ্যালি, তাজিডং, ওয়াই জংশন সবসময় বেশী আমাকে শিহরিত করে।

ভালো লাগে আমার জন্মভূমি, মা ও মাটি। কারণ বাংলার সোঁদা মাটি যে বীর শহীদের রক্তস্নাত।।

Agro Forestry In Bangladesh :an Overview

Md.Yunus Ali

Introduction:

When the artificial regeneration in Forestry started in the subcontinent ,Taungya system came into being . The primary objective of Taungya was to use the fertile forest floor for cereals and other vegetables production by combining with forest plantation .The present scenario of Agro Forestry is more than a mere combination of tree and crop production. Agroforestry today is a broad umbrella concept which encompasses a number of sustainable farming system , viz , agro- silviculture , Silvio pastoral , agro-Silvio - pastoral , agro-Silvo-fishery, Silvio fishery, agro -Silvo horticulture and even agro -Silvo- horti - pastoral system .The traditional farming system can no more sustain such an overwhelming farming community, agroforestry system of her scope an opportunity to ameliorate the situation by alleviating poverty especially in rural settings. Sustainable agroforestry farming system for farm(crop) lands, homesteads and forest lands can make life of the toiling masses economically more diversified and prosperous.

Agro Forestry in crop land(farm land):

The country traditional agricultural land(Khet land)has two distinct characteristics situations-the high khetland and low khetland .The low khetlands are practically seasonal wetlands where the tree production cannot be combined easily . The high khetland is available in the northern, northwestern and central region have tremendous potentials of combining tree and crop production.

Means of attaining sustainable farming system:

• Establishing nursery on entrepreneur basis for the supply of planting stock at the grass root level.

• Introduction of tree crop in a farm land including ridges and boundaries with active participation of the farmers.

• Providing know how to the farmers through appropriate extension mechanism and trading programmers.

In Bangladesh agroforestry formally started in early 80' from northern district. Local and traditional knowledge were used to develop scientific module like boundary planting, alley cropping, wood lot in block and cropping asides etc. The principles of light demanding species creating minimum shade bearer in nature is followed in agroforestry system. Usually in our country first two years the gap among the seedlings is sufficient for agro crop .Following the 3rd year the gap gets diffused light. In that situation pineapple, turmeric, ginger grows fairly. First and 2nd year the cereals grow luxuriantly. The tree species having light crown are suitable in agroforestry. The choice of tree species depends primarily on landforms i. e, hills, terrace and alluvium. The species is related to drainage, texture, structure, salinity and organic matter content of Soil . There are few other limiting factors could be considered to avoid the scheme of agroforestry like Water logging, marshes etc. Few other limiting factors like plough pan, piedmont soil and acid sulfate soil can be ameliorated by agroforestry. The young laterite soil is suitable for woodlot, particularly on the ridges. However, the furrows are essentially suitable for agro crop in terrace area of the country.

Agroforestry Module:

1. Planting trees with spacing not less than 10*10m right inside the crop land.
2. Planting along the farm land ridges /boundary with a linear spacing of 10 m from plant to plant.
3. Combined ridge planting and field planting.
4. Alley cropping with various alley width (10, 15,18m and planting strips .
5. Four corner boundary planting.

To make the system more sustainable, a pastoral component may be integrated. However, the small wood lots in the high khetland farms can contribute significantly in supplying wood and wood fuel fruits and fodder.

Home Garden:

Traditionally farmers grow trees in mixture with other woody perennials, vegetables and cash crops around almost each and every homesteads on their generations old experience to sustain their multifarious needs. The homestead tree covered areas of the country have attained 1.677 million hectare. I the home stead agroforestry, the farmers main preferences are mainly

Chief Conservator of Forests (P.L.R)

Multipurpose Trees to meet their food, fodder, fuel and timber needs. The traditional system can be turned into a more profitable and sustainable one through better management, tree renovation and replacement of the old uneconomic and low yielding ones with improved variety of fruits and MPTs.

Agroforestry in forests land :

The state forest land of the country including Unclassified State Forests is. 2.6 million hectare. Bangladesh, having a land mass of 147570 Sq Km sustain a population of 160 million which is presently growing at the rate of 1.4 percent.

Agroforestry Potentials of the Sal forests:- The present day forests are secondary or tertiary coppices. Over exploitation is poor management is responsible for the degradation of the forest which has intensified because of encroachment of the forest land. The Bahawal –Madhupur tract in the center and the Barind tract in the north western part of Bangladesh are dissected , unconsolidated unfolded upland of the Plio-Pleistocene age. The homogeneity of the sediments both in verticals and horizontal direction is indicative of their estuarine origin (Hasan,1992,1994).The degraded Sal forest area has already been under intensive land use systems including agroforestry practices .Agroforestry potential of the terrace areas is by no means lower than any other land form of the country given proper attention to site suitability assessment (Mazumdar A.H 1994). Forest department created agroforestry plantation first in Barind tract under community forestry project (1981-86) in Dinajpur , Rajshahi and Rangpur forest division, and subsequently in Dhaka Tangail, Mymensingh and Comilla forest division under Thana Afforestation and Nursery Development Project(1987-94).In the later project approximately 3070 hectare of encroached forest land have been brought under agroforestry plantation.

Agroforestry plantation harvested in all those forests divisions on sale .The plantation areas , sale proceeds, govt. revenue, share to the participants, Tree Farming Fund are summarized against each forest division as follows:

Table: Agro forestry in the forest land raised by Bangladesh Forest Department

Data source: Respective Divisional Forest Officers

Name of Forest Division	**Area planted	No.of Participent	**Plantation Felled	*Sale proceeds	*Govt. Revunue	Participant share	***TFF	Not felled	Remarks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dhaka	816.30	816	291.05	97.94	44.08	44.07	9.79	525.25	The difference between column 1 and 3 is due to failure of the plantation and /or immature plantation.
Tangail	1521	1789	320	114.16	57.08	51.37	11.42	1201	
Mymensingh	1088	1088	465	1049.72	472.37	472.37	104.97	623	
Rajshahi		352	107.04	29.14	13.11	13.11	2.91		
Dinajpur		879	694.45	48.59	19.70	19.70	4.86	230.52	
Rangpur	392.23	654	270.33	11.41	7.66	2.48		121.9	
Comilla	130	156	41.22	11.96	5.39	5.39	1.84	88.78	

*Bangladesh Taka in Million ** Area in Hectares *** Tree Farming Fund

On analyzing the performance of different agroforestry models it has been found that 18 m alley (81 %area) with three rows of trees (19%area) provides highest benefit to the farmer. Growing agricultural crop in conjunction with tree crops in different models shows that agroforestry gives higher return than the monoculture of trees or crop production (Bose, S .K ,1994).

The Forestry Sector should aim at addressing issues as detailed below by employing agroforestry production systems as an effective strategic tool (Fazlul Hoq . A K M, 1994):

- Rehabilitate man and land through tree planting, and thereby increase production of goods and services in the country ;
- Reforest the denuded and degraded state forest land ;
  Improve Environmental situation to support agricultural and other biological production systems;
- Develop Protected Areas and core natural forests as conservation areas to preserve the gene pool, wildlife and biodiversity;
- Create employment opportunities for the land less, poor, marginal farmers and women.

ECONOMIC VALUATION OF ECOSYSTEM GOODS AND SERVICES (EGS) AND ECO-SENSITIVE DECISIONMAKING: A CRITICAL ANALYSIS FOR BANGLADESH MNGROVES

Shaikh Mizanur Rahman

Mangrove Ecosystem

Mangroves are wide variety of trees and shrubs having characteristics of being adapted to condition of high salinity, low oxygen and changing water level, and these are tropical vegetation that grows in swampy areas and have tangled roots located above ground. Due to its salt tolerant characteristics they also called halophytes, and are adapted to harsh coastal conditions and contain special salt filtration system and complex root system to cope with salinity, low oxygen and waterlogged condition. And they are adopted with special root system of Pneumatophores, which allow mangroves to absorb gases directly from the atmosphere and other nutrients such as, iron and other mineral nutrients from the inhospitable condition.

An **ecosystem** is a community of living organisms that live in conjunction with the nonliving components of their environment interacting as a system. In other words it is the network of interactions among organisms, and between organisms and environment. Living organisms cannot live in isolation, the non-living environment provides food and energy for their survival and there exists interaction between biotic community and the physical environment. Everything that lives in an ecosystem is dependent on other species or elements, and is also part of that ecological community.

Structure and Components of Ecosystem

The ecosystems generally have three common properties that include the presence of (a) biotic and (b) abiotic components and their (c) interactions. The biotic component of the ecosystem is the communities of organisms, and the abiotic component includes chemical and physical environments in which the organisms' survive and make their living. In the ecosystem biotic and their abiotic environment that interact to form a stable and self-supporting system.

Components of ecosystem:

- **Abiotic components:**
- Climatic factors that include rain, temperature, light, wind, humidity, shade etc;
- Edaphic factors and soil contain a mixture of weathered rock fragments, altered soil mineral particles, organic matters, sediments and living organisms.
- **Biotic components:** These are plants, animals and micro-organisms and functionally they are classified as producers, consumers and decomposers or reducers.
- **Producers** may be of green plants and chemosynthetic bacteria; and they are autotrophs and chemoautotrophs.
- Autotrophs produced their own food and are consumed by:
- **Primary consumers** (herbivores), these are the animals which feed on plants or the producers, e.g. deer, goat, cattle etc.;
- **Secondary consumers** (carnivores), they feed on the herbivores e.g.. cats, foxes, snakes etc.;
- Then by **tertiary consumers,** they feed on the secondary consumers e.g. wolves;
- Then by **quaternary consumers,** they are the largest carnivores and feed on the primary/ secondary/tertiary consumers, e.g. lions, tigers etc.; and
- **Omnivores** they actually feed on everything e.g. humans (Homo sapiens).
- **Decomposers and reducers** are bacteria and fungi, they break down the dead organic materials and foods that released in the environment and converted into simple inorganic and organic substances.
- These simple substances are reused by the producers and functions in the cyclic exchange of materials between the biotic community and the abiotic environment of the ecosystem.

Deputy Chief Conservator of Forest (Rtd.)

Ecosystem Goods and Services (EGS)

The mangrove ecosystems are highly productive, extremely sensitive and fragile. Major constituents of the mangroves are trees and shrubs; fishes, shellfish and crustaceans; birds, reptiles, tigers, dears, monkeys, otters, fishing cats and wild pigs. Mangroves perform protective, productive and regulatory functions through providing various goods and services. Benefits, goods and services provided by the mangrove ecosystem are summarized in the following figure (Figure-1).

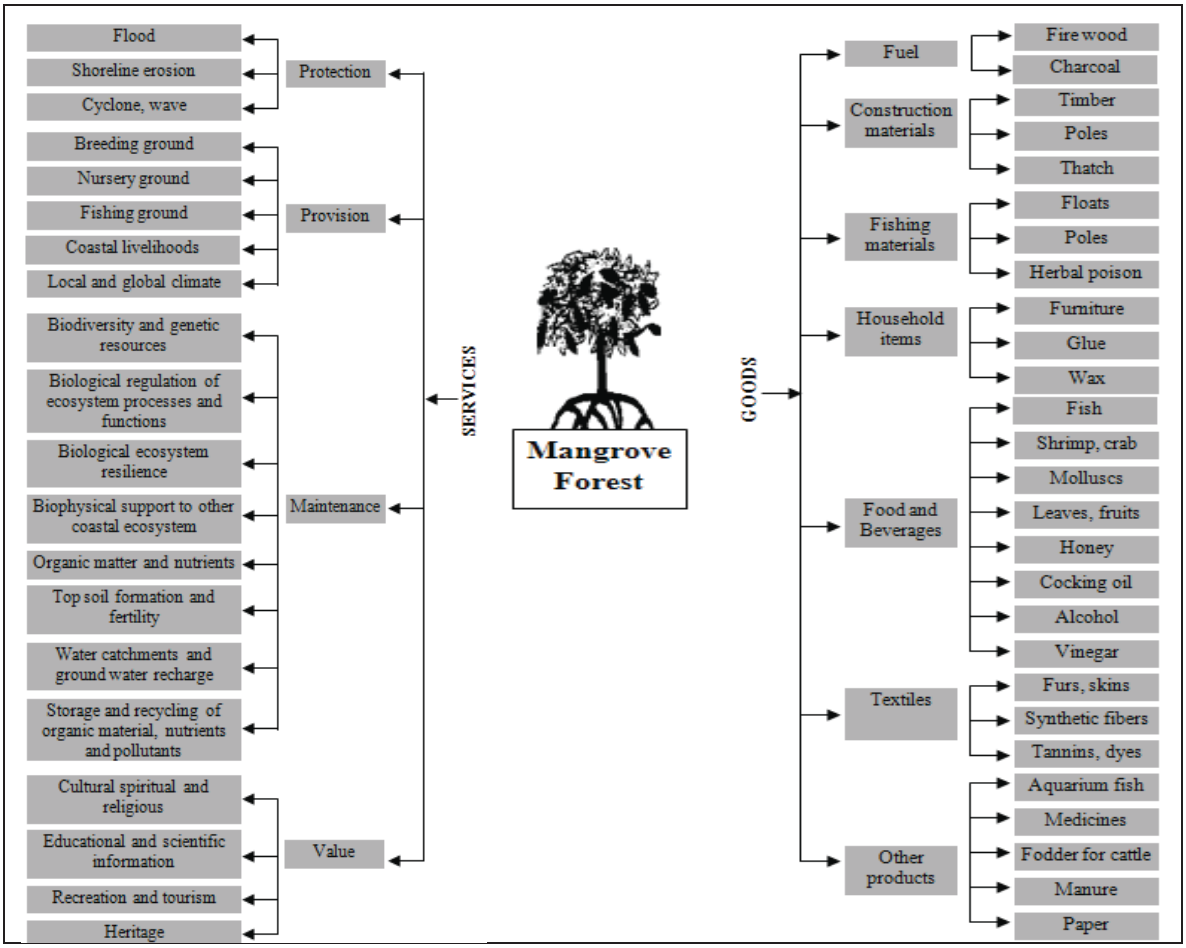

Figure-1: Protective functions and goods and services of mangrove ecosystem (EGS) (Hossain, M.S., 2009).

The coastal mangroves provide number of important ecosystem goods and services (EGS) and the EGS can be categorized as follows:

- Provisioning: timber, fuel wood, charcoal, food and medicines;
- Regulating: flood, storm and erosion control, and prevention of salt water intrusion;
- Habitat: breeding, spawning and nursery ground for commercial inshore and offshore fish species and biodiversity ; and
- Cultural services: include recreation, heritage, spiritual and religious, scientific, aesthetics and other nonuse values.

Mangrove Enhance Fisheries

Mangroves are the 'root of the sea'. There exists correlation between prawns and Hilsa with healthy mangrove. If there is no mangrove or degraded mangrove along the coast, there will no or fewer fish and sea will be less functional without its root i.e. the mangroves.

- Mangroves ecosystems are highly productive and level of productivity close to the average of tropical terrestrial forests and there exist as much as 25 times more fish in the areas close to mangrove than in areas where mangroves have been cut down or degraded.
- Mangroves forests enhance fish production, through providing food and shelter. Their leaves and woody matter i.e. detritus form a key part of the marine food chains that supports fisheries, and detritus decomposed by micro-organisms such as bacteria and oomycetes, as well as some commercially important crab species.
- In these process the leaves and woody matters decomposed into more palatable fragments for other consumers. Mangrove productivity is further enhanced by productivity of periphyton and phyto plankton occurring on mangrove trees, in their soils and in the water column.

Mangrove as Fishery Food-web: In the mangrove food-web products come from the mangrove trees, algae growing on tree roots and on the forest floor and phytoplankton in the water column. Additionally, the system receives nutrients from external sources with sediments from upstream (as in figure-2).

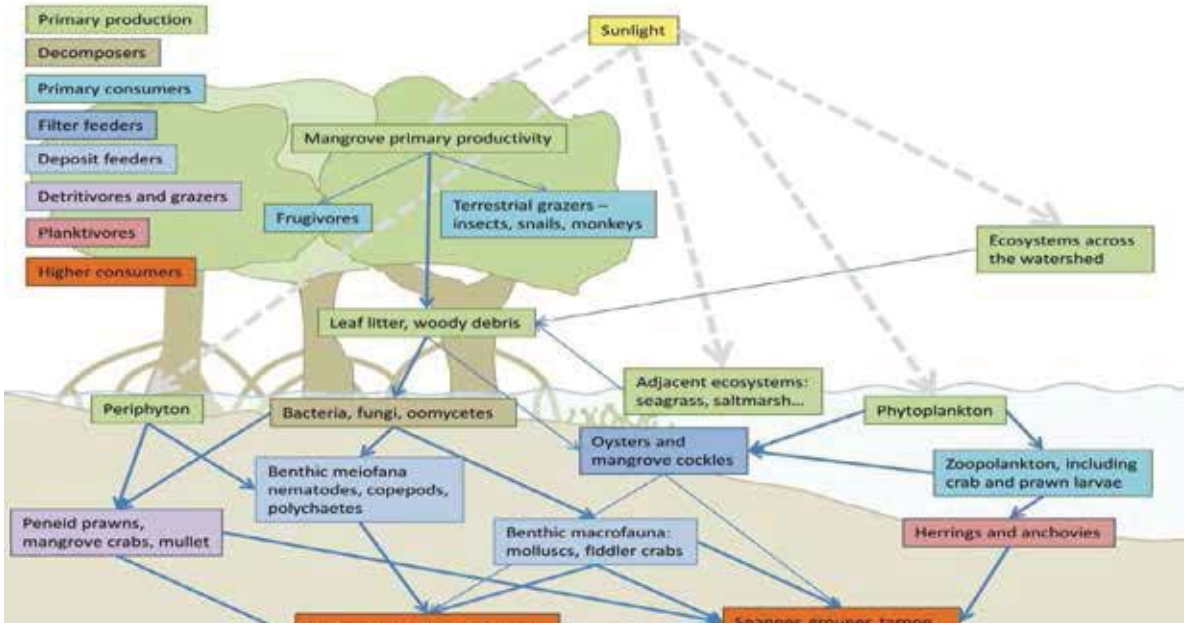

Figure-2: Mangrove food web showing the broad trophic groups (Source: Hutchison. J.et al. 2014).

Mangrove ecosystems are highly productive and some of the estimations, that have been made are:

- Current estimates suggest an average above ground net primary production is of 11.1 t dry weight /ha/yr. Phytoplankton, periphyton, planktonic products like benthic and epiphytic algae, zooplankton including crustacean larvae are the main component of the food web. The tidal and hydrological regime determines the degree to which phytoplankton is retained within the mangrove or flushed out to sea.
- A study in the Indus delta found planktonic productivity in the mangroves ranged from 0.5 – 3.7 t C /ha/yr (Hutchison, J et al. 2014).
- As reported by Naik N.R et.al in 1991, mangroves shed and drops about 18 and a half tons of leaf litter per ha/year. The system constantly shed leaves and are quickly broken down by crabs, fungi and bacteria and released into water making food available for sea-life.

- In another review of mangrove litter fall found that an average of 9.6 t DW /ha/yr of leaves, propagules, twigs and branches fall to the forest floor, where it is processed by a range of consumers and decomposers (Hutchison, J et al. 2014).
- Coastal mangroves are valuable sources of food for inshore and offshore fisheries and up to 80% of the global fish catches are directly or indirectly dependent of mangroves food-web (Barua, P et.al. 2010).
- **Nutrient export:** The quantity of carbon exported is often substantial, with global estimates ranging from 29 to 46 Tg C yr-1, and as much as 11% of the total terrestrial carbon exported to marine ecosystems are mangrove-derived (Hutchison, J et al. 2014).

Therefore, through **fertilizing the sea** mangroves serve as breeding and feeding grounds to support near-shore and off-shore fisheries and marine lives.

Shelter from predators: The structural complexity of the mangrove ecosystem provides shelter from predators. Stilt roots, prop roots, flying buttresses, pneumatophores reduce prey visibility and create obstacles to access of large predators. Moreover, shade of the mangrove canopy and turbid water, make harder for predators to detect the preys. Thus the process reduces predation pressure on juvenile fish and prawns, increasing the number that survive and can be recruited into the fishery resources. The intricate root system of the mangroves supports higher numbers of fish near to mangrove than in clear habitats.

Mangroves as nursery grounds: Mangroves support fisheries by providing a "nursery ground" where juvenile and larvae get proper nursing and can grow to a size where they are less prone to predation and therefore have higher survival. Species that use mangroves as nursery grounds often move out of the mangrove as adults, perhaps to coral reefs, other offshore habitats or even freshwater rivers.

As the mangroves are highly productive and provide abundant food and shelter; and thus the system facilitate high growth of the larvae, juveniles and as well as the adults.

Mangroves as Coastal Defense

The role of coastal mangroves in protecting coasts against natural hazards such as storms, tsunamis, cyclones, tidal surges, waves and coastal erosion has been widely recognized.

Mangroves for coastal risk reduction: Wind and swelling of waves are rapidly reduced as they pass through mangroves and thus lessening wave damage during storms.

Mangroves as Buffer and Bio-shield: Mangrove forests act as a buffer against wave energy. Structures of trees enable to withstand wave impacts and help to reduce damage from wave storms. Mangroves act as bio-shield and can defense the costal property and livelihood and make the coastal area more climates resilient.

- Analytical model shows that 30 trees per 100 sq m in a 100 m wide belt can reduce the tsunami/high wave flow and reduce pressure by more than 90% (Hiraishi, et. al, 2003);
- Hundreds of meters needed to reduce the wave height, e.g. per 100 m of mangrove belt reduce wave height by 13—60%;

The dense vegetation of coastal mangroves with dense aerial root systems and branches can create more obstacles; and can reduce tsunami heights and impacts of cyclones and tidal surges and thus helping to reduce loss of life and damage to property in areas behind the mangroves. Some of the studies and examples are given below:

- A Rhizophora dominant forest of 150 meters wide can reduce a wave' energy by 50%;
- Similarly, a Sonneratia dominated forest of 100 meters wide can reduce wave energy by 50% (Mazda et al, 2006).

The dense network of trunks, branches and above ground roots of mangrove species minimize the tidal current, which ultimately reduces erosion as well.

On the basis of the above studies, the IUCN recommends a green belt should be established and maintained along the coast, with the plantation of a minimum of **500 meters** in width at all times.

Valuation of Ecosystem Goods and Services

As some of the goods and services of the ecosystem does not have any market value, it is difficult to measure many of the services such as protective, regulatory and cultural are intangible and difficult to measure. Even then, methodologies have been evolved for estimating the value of ecosystem services.

Conceptual Framework for Economic Valuation: Economic valuation is a powerful tool for measuring and comparing various benefits of ecosystems, and that will ensure wise use and management of EGS. In this context environmental/ecosystem valuation techniques adopt **total economic value (TEV)** framework to measure the economic value of the goods and services provided by the ecosystem and natural resources; and to measure the incremental change resulting due to change in management scenarios.

In principle, to arrive to an aggregate measure of the **total economic value (TEV)** of a resource, it consists of its **use value (UV)** and **non-use value (NUV)**. Use values are further classified into **direct use values (DUV)**, the **indirect use values (IUV)** and the **option values (OV)**.

In the **value estimation** process mangrove EGS can be broadly categorized as:

TEV= use value + non-use value

1. Thus: **Use value = direct use value + indirect use value.**
2. **Non-use value = existence value + option value + quasi-option value + bequest value.**
3. And to sum up:**TEV= use value (direct use value + indirect use value) + non-use value (existence value + option value + quasi-option value + bequest value)** (Hecht. J. E., 1999).

Figure-3: Schematic representation of total economic value (TEV) of mangrove ecosystem (Adapted from Turner.R.K et al., 1994 and Billah. A.H.M.M., 2003).

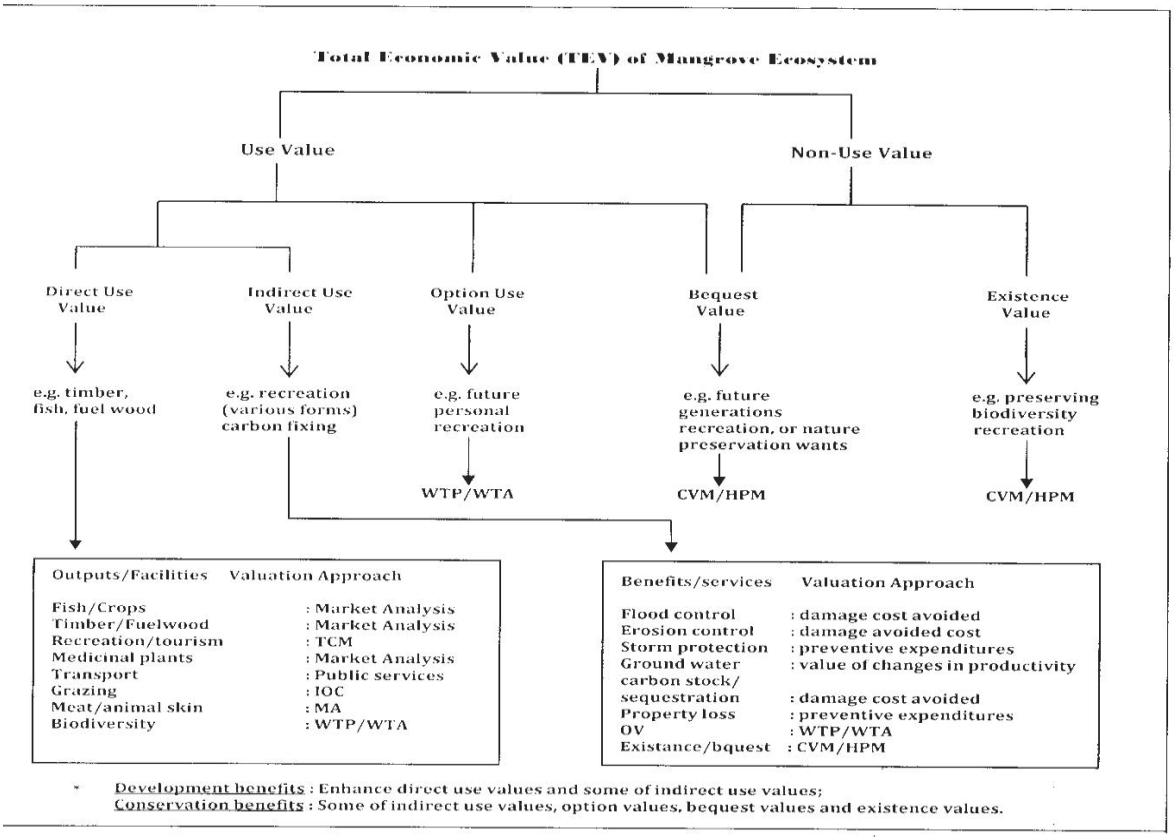

Ecosystem Valuation Techniques

Mangrove ecosystem provide goods and services that are being produced, consumed and used directly, that would include forest products, fish, wildlife, food, medicines, supply of raw materials, amenity services, research and education.; these are use values and market put on values on those commodities. Moreover, to make valuation more rational, some of the features of natural resources need to be considered during valuation process.

The economic valuation techniques commonly used the methods of: **Replacement costs, Effects on production, Damage costs avoided, Mitigation or aversive expenditures i.e. Defensive expenditure, Hedonic pricing method (HPM), Travel costs method (TCM), Contingent valuation method (CVM)** etc.

Beside these **dose-response approach, shadow project, opportunity cost approach, welfare measure, substitute goods** etc. are also used for economic valuation of EGS.

Analysis of Mangrove Ecosystem Valuations

Ecosystems provide services and goods like, life support, raw materials, waste disposal services and amenities. As we know, market system does not put a price for most EGS. Economists have developed techniques for imputing monetary values to them. The valuation techniques and conceptual framework often used by the environmental economists as a tool and means to ensure sustainable management of natural resources.

The main intention of these initiatives are to help the individuals working in this field to give a clear picture of environmentally sustainable growth in conformity with ecologically sensitive decision-makings. It provide a introduction to the role of environmental goods and services in the economy and why free market and technocentric1 thinking lead to depletion of natural resources and cannot ensure environmentally sound resource use (Turner. R.K et al., 1994).

Valuation of Ecosystem Goods and Services (EGS)

Some efforts that have been made to estimate the value of EGS, in South and Southeast Asia, that have been summarized below:

- In a study in Myanmar, average value of ecosystem goods and services was $2297.0 per ha/year. They included the value of forest ecosystems such as mangrove coastal protection, watersheds, mangrove fisheries including nursery and breeding habitats, carbon sequestration, timber and NTFPs and tourism.
- In a similar and recent study in Myanmar, where coastal protection value of healthy mangroves was estimated by MOCAF in 2013 on the basis of avoided loss of property and lives. In this valuation:
  - The value for **coastal protection and erosion** was $ 940.0 per ha per year, and benefits for **storm protection and damage avoidance** was $ 620.0 per ha per year.
- WWF in 2013 conducted a study in Mekong Basin and estimated the EGS value of coastal mangroves as $ 2670.0 per ha per annum (Emerton, L. 2012).
- A meta-analysis of the economic valuation of ecosystem services provided by mangroves was conducted in Southeast Asia by Brander, L. M et al., in 2012. In this study 130 value estimates were analyzed and values were standardized to 2007 price. The values are highly variable due to bio-physi cal characteristics of the site and the socio-economic condition of the beneficiaries of the particular mangrove ecosystems.
  - The mean **EGSs value** was found to be as high as $ 4185/ha/year.
- Similar study was conducted in Sri Lanka by IUCN in 2007. Both direct and indirect benefits make significant contribution to the local economy of the country.
  - Direct value (fish, shrimp, timber, poles, herbs and fuel wood) was calculated as $ 9,201 per ha per year,
  - Economic value of the **near shore fishery** account about $ 474/ha/year,
  - Fish **breeding ground** functions of mangrove value was estimated as $ 218/ha/year, and
  - That for **shoreline protection value** was estimated at $392 /ha/year,
- A survey was conducted by IUCN in Kapuhenwala village in Sri Lanka, and estimated that intact and

healthy mangroves can have an overall use value of as much as US$ 14,000/ha/year per household (Sarker, S et al, 2010)

- Economic valuation studies were undertaken to demonstrate the economic value of the goods and services of mangrove forests. It has been estimated that in Sri Lanka, per hectare annual total economic value **(TEV)** of a conserved mangrove forest was about **US$ 12,229** (GEC, 2009).
- **Mangroves for Reducing Damage and Protecting Lives:** In 1970, almost 500,000 people died in Bangladesh due to the catastrophic cyclone where the wind velocity was 224 km/hr, whereas the number of death was reduced to 138,000 in the cyclone of 1991 though the wind velocity was higher (225 km/hr) in comparison to 1970.
- Similarly, the super cyclone SIDR that affected the coast of Bangladesh on 15 November, 2007 could not severely damage the lives and properties of coastal people. The number of death was 3500 though the wind velocity was higher (280 km/hr) in comparison to cyclone of 1970 and 1991. As we know BFD implemented massive coastal afforestation initiatives on newly accreted land in the coastal areas of Bangladesh, that including the early warning system protected the lives and property from severe damage (Uddin. M.M. et al., 2013).
- As reported by Das, S. et.al in 2009, mangroves significantly reduced the number of deaths during the 1999 cyclone that struck the eastern coast of India. In the study it was found that, there would have been 1.72 additional deaths per village if there was no mangrove.
- **Live saving value:** Where there was mangrove, live saving impact was massive and mangroves saved 0.0148 lives per hectare. Which in turn implies that the average opportunity cost of saving a life by retaining mangrove forests was $ 174,627.0 per life saved? (GEC, 2009), and it in turn account about $ 2,584 per ha.
- **Damage Avoided Cost:** A study was conducted in Orissa, India, and found that in the mangrove-pro tected village the adverse impact of cyclone was reduced significantly, and damage to houses and crops were less (Mclvor. A et al., 2012).
  - And **damage avoided costs and protection** benefits of mangroves in terms of averted damages to residential property including livestock's and agricultural products were estimated as $ 121 per hectare of forests.
- **Food security:** Food security exists when all people have access to sufficient, safe, nutritious and culturally appropriate food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.
  - It can protect human habitation, lives, properties, and agricultural crops from extreme weather events resulting from climate change;
  - Directly provide food and medicines in the form of fishes, shellfishes crustaceans, honey etc.;
  - Create employment opportunities and livelihood support;
  - Coastal mangroves in the form of windbreak/shelterbelt of trees protect agriculture crops from physical damage through reducing and preventing wind and water erosion, evapo-transpiration from soil and crops, retention of moisture; moderate extreme temperature, mechanical damage of crops and livestock, reduce salt spray and salinization etc. Therefore, by reducing crop failure and protecting livestock the mangroves **ensure food security**.
- **Land Accretion Value:** Other indirect benefits include accretion of agricultural land. In Bangladesh, the planting of mangroves have enhanced the deposition of sediments to such an extent that 60,000 ha have raised beyond tidal limit and is not getting any inundation and as a result the lands are no longer suitable for mangrove.
  - And **land reclamation value** has been estimated as $ 800/ ha/year (Saenger and Siddiqi, 1993).
- Carbon Sequestration: The capacity of mangroves to sequester carbon dioxide from the atmosphere is of extreme importance under the context of climate change. Of the total biological carbon, captured in the world 55% is captured by mangroves, and this also known as 'blue carbon'. Mangrove vegetations sequester carbon up to 100 times faster and more permanently than terrestrial forests. Mangrove forests store up to five times more carbon than tropical forests. This ability of mangroves

to store large amounts of carbon is due to the deep organic rich soils in which they thrive.

- Mangroves provide great benefits to control global climate change, e.g. a 20 year old mangrove plantation can accumulate and store 11.6 kg/sq m of C in the soil, where carbon burial rate account about 580 g /sq m/year (Fugimoto, 2000).

Value of Mangrove Fisheries

In order to estimate the extent to which a given area of mangrove will benefit fisheries within and around, it is necessary to understand the drivers of fish productivity and fishery value.

- A number of authors have summarized mangrove-associated fishery values with estimates suggesting mean values often in excess of US$1000 per hectare per year (Hutchison. J. et.al, 2014).
- In tsunami affected Thailand, the study was carried out in two sites on fishery production an its value, and it was found:

- Present value of the contribution of mangrove ecosystems to fisheries production for Ban Naca (using 10% discount rate for 8 years time horizon) was US$ 20,174 per household and US$ 2,853 per hectare;
- And that in Ban Bangman was also calculated, and the value of fish habitat account about US$ 30,822 per household and US$ 12,843 per hectare (IUCN, 2008).

Coastal Mangroves of Bangladesh

Mangrove Biodiversity: The coastal zone are rich in diversity of natural resources, including coastal fisheries and shrimp, forest, salt and minerals. The coastal zone also contains several ecosystems that have important conservation values.

These ecosystems are not only biodiversity hotspots, but they also provide the ecological foundation for important common property resources i.e. the fisheries of Bay of Bengal. The coastal fauna of Bangladesh are shown in the following table (Table-1).

Table-1: Biodiversity (fauna) of mangroves and offshore estuaries of coastal Bangladesh

Category	No of Species	Category	No of Species
1. Sponges	3	7. Echinoderms	4
2. Corals	66	8. Fish e.g. Hilsa	442
3. Mollusks Marine	336	9. Amphibians	22
4. Shrimp/Prawns	56	10. Reptiles	17
5. Lobsters	3	11. Birds	628
6. Crabs	16	12. Mammals	3

The mangroves of Bangladesh are extraordinarily rich in phytoplankton, zooplankton and ichthyoplankton production. Mangroves are of exceptionally higher primary productivity than any other wetland habitat type, and nutrient-rich waters of the coastal mangroves also yield a considerable harvest of shrimps, prawns, Hilsa and lobsters.

- In Bangladesh the mangrove-based artisanal fisheries has been contributing around 95% to the total marine fishery production (Islam. M.S. et. al., 2005).
- About 10 million people of the coastal regions are dependent directly or indirectly on the mangrove for a variety of purposes including fishing, foods and employment opportunities.
- Along with the artisanal and subsistence fishing by numerous small fishermen, large-scale exportoriented aquaculture industries have been developed in the coastal areas of Bangladesh, using the mangroves as the basic productive unit.

Thus, the coastal mangrove is playing significant roles in uplifting the coastal, regional as well as the national economy.

Value Estimation of Bangladesh Coastal Mangroves

The Sunderbans and coastal plantations provide invaluable goods and services in the form of fisheries and shrimp, forest products, salt and minerals, coastal protection, land accretion, protection against natural calamities, biodiversity and gene pool, wildlife habitat and carbon sequestration. Additionally, the coastal mangroves have a large potential for tourism as well.

Bangladesh has total 7, 26,000 ha of mangrove forests (6,00,000 ha (Sundebans) +1,26,000 ha coastal plantations). Coastal mangroves of the country are highly productive due to high biodiversity and sediment rich in nutrients. Some of the facts are summarized as follows.

The system constantly shed leaves and are quickly broken down and released into water making food available for sea-life.

- Mangroves of the country add **13.43 million** tons/year (at the rate of 18 and a half tons of leaf litter per ha per year) of leaves and woody matter i.e. detritus to the marine food chain, and export carbon and fertilize sea and in turn that supports near shore and offshore fisheries.

Ecosystem goods and services value estimates of different countries have been analyzed and a conservative value has been used in the process of value estimation. Though the mangroves of Bangladesh are much richer in biodiversity, have luxuriant growth and higher carbon sequestration and protection against natural calamities; even then during value calculation example from similar countries like Myanmar, India and Sri Lanka have been used.

- Different authors have summarized mangrove-associated **fishery values** as in excess of US$1000 per hectare per year, for Bangladesh mangroves it accounts about **$ 726.0 million/yr.**
- **Fish breeding and nursery ground functions** of mangroves would be $ 158.26 million a year at the rate of value as $ 218/ha/year.
- **Shoreline protection and erosion** value for the mangroves accounts about **$ 450.126 million/yr** against estimated value of $620 /ha/year.
- **Damage avoided costs and protection** benefits of mangroves in terms of averted damages to residential property would be **$ 884.2 million a year** @ $ 1,218/ha/yr.
- As per met–analysis conducted in Southeast Asia mean **EGS value** for Bangladesh's mangrove would be **$ 3.03 billion annually** at the rate of $ 4185/ha/year.
- **Live Saving Value:** Study conducted in eastern coast of India and it was found that, the average opportunity cost of saving a life by retaining mangrove forests was $ 174,627.0 per life saved? And it in turn account about $ 2,584 per ha. So, total live saving value of Bangladesh mangroves would be **$ 1.87 billion/yr.**
- **Land Reclamation Value:** Coastal afforestation on newly accreted land has accelerated the siltation process and 60,000 ha land have risen beyond tidal limit and is not getting any inundation. Total land reclamation value would be **$ 4.8 million a year** at the rate of $ 800/ ha/year.
- **Total Economic value (TEV):** Studies were analyzed to demonstrate the economic value of the goods and services of mangrove forests of Bangladesh. So, total economic value (TEV) of mangrove forests would be **US $ 8.87 billion per year** at the rate of $ 12,229/ha/year.

Conversion of Mangroves, Should We Continue ?

Coastal wetlands-mangroves are particularly under severe threat and remain under valued despite their immense economic and ecological importance. Under valuing of mangroves is a serious problem where outright conversion of the mangrove area is at stake at present in Bangladesh; and under severe pressure from anthropogenic activities. Loss and degradation of these vital ecosystems impact heavily on the coastal population; as they are traditionally dependent on mangroves for food production such as fish, vegetables, fuel wood, medicines, and construction materials etc. as well as through the provision of vital life support and protection services.

Should we continue the conversion of mangrove for agriculture/aquaculture/salt pan or any other purpose? Except for national interest we should not. For an ecologically sensitive decision-making we need to consider all the goods and services provided by the coastal mangroves.

So, in case of conversion scenario we are going to lose:

timber, fuel wood; fish, crabs and crustaceans; food and shelter for fishes of both near shore and offshore fisheries; marine food chain functions, production of phytoplanktons, periphytons, benthic and epiphytic algae and zooplanktons; breeding and nursery ground; damage avoided costs of cyclone and tidal surges; pollution control and shoreline protection value; live saving value; land reclamation value and lastly the total economic value of EGS. Which one is more worthy? Conversion? Or conservation and enhancement/eco-restoration; It's a big question.

Ecologically Sensitive Decision-making

The decision-making is founded on cognitive process of **cost benefit analysis** (CBA) based on comparing the potential advantages and disadvantages of course of actions. Conventional CBA uses market costs and benefits to determine the options or projects that contribute most towards the growth of the economy without considering of who the beneficiaries are. To rationalize and improve decision-making process **social cost benefit analysis** (SCBA) should be included to deal the issues beyond the market costs and benefits and to address the costs and benefits to the society (Hecht.J.E et al, 1999). Here **shadow pricing** may be used for estimating actual values of goods and services, where markets are failed or subsidized. The comparison of the EGS values of mangrove under two different scenarios would tell the planners and policy-makers which option would contribute more to the economy. When mangroves are converted for any development options, **what we are going to lose?;** and what would be the **foregone value?** Therefore, the following things should be considered for an eco-sensitive decision making (as shown in the following Box-1).

Box- 1: Adjusted total economic value (TEV) of EGS for eco-sensitive decision-making

In the decision-making process we determine options through comparison of different development project/conversion options (for agriculture/aquaculture/salt pan) where we consider costs of the project, the benefits of the project (benefits from agriculture/aquaculture/salt pan). But for mangrove ecosystem, we should also consider the TEV that we are going to lose (ecosystem goods and services provided by the mangroves) by the attempt of development (Pearce, D et al, 1989).

More formally, the basic equation we can write as:

a. **We proceed with the development if,**

- $B_D - C_D \pm E_B > 0$ (1)

where,

B_D refers to the benefits of development/conversion;

C_D refers to the costs of the development;

E_B refers to benefits of ecosystem including all EGS.

b. Equation (1) is the fundamental equation of cost-benefit analysis. It tells us that for any project or policy to be considered as potentially worthwhile, when benefits of development (B_D) less its costs of development (C_D) plus or minus the benefits of ecosystem, and all discounted to a present value, must be positive.

c. But in case of an environmental/ecosystem restoration/conservation/enhancement programs e.g. afforestation, conservation, restoration or forestry project value of E_B would be always positive (Equation-2). And restoration/conservation option would be worthwhile.

- $B_D - C_D + E_B > 0$ **(2)**

d. For a development/conversion option where the most of the EGS value would be negative and lost by the development (Equation-3), we shall have to give up or forgo all EGS benefit and then the equation would be:

- $B_D - C_D - E_B < 0$ **(3)**

The equation implies:

- Benefits of conversion/development
  - Less costs of conversion/development;
  - Less the EGSs values (in this case all would be minus value) and that includes:
    - less forest products,
    - less fishery values,
    - less shoreline protection and erosion value,
    - less damage avoided costs and protection value,
    - less fish breeding and nursery ground functions,
    - less live saving value,
    - less land reclamation value,
    - less cultural, spritual and recreation value,
    - less GHG mitigation,
    - less CHG^2 emission,
    - i.e. Less the total economic value of EGS.

Taking into account of all EGS values the development/conversion of mangrove options would **always be negative** (or less than 0) and cannot be worthwhile; and we cannot go with the development/conversion option.

All these EGS values would be available and positive only under the sustainable management/conservation/restoration/afforestation scenario.

e. **Benefits of mangrove conservation/restoration:** It is not so simple to estimate the TEV for EGS or value of other environmental services provided by the ecosystem i.e. values of conservation might not be

interesting to the planners and policy-makers. Most of the cases land use decisions are not based on careful comparison and estimation of costs and benefits of alternative land use (Turner, R.K et al, 1994).

f. Here, it is the question of protecting the mangrove ecosystem along the coast, and that have more ecosystem value than anything else; and conservation or restoration benefits would be higher than any other development and conversion options of land use. So, the basic equation would be as follows (Equation-4), and conservation would be economically justified when (Turner. R.K et al., 1994):

- $[B_C - C_C] > [B_D - C_D]$ (4)

Where,

B_C refers to benefits of conservation of mangroves,

C_C refers to costs of conservation (management/administrative costs and is very nominal)

g. Here, development refers to non-conservation use, and the benefits and costs of the development are relatively simple to measure, primarily most of the cases they are marketable goods.

h. The expression $B_D - C_D$ is the opportunity cost of conservation/restoration and for a development/conversion options all EGS values have to be surrendered.

i. Considering TEV for EGS or value of other environmental services provided by the ecosystem would be higher and more than the values of all development options (non-conservation use of the mangrove ecosystem). Though it is difficult to estimate the EGS values, but above mentioned features and values would be a tool to understand the functions and services provided by the ecosystems and it will give a foundation for **ecologically sensitive decision–making.**

Considering TEV of all EGS of the eco-restoration/conservation/environment enhancement projects, the value of ecosystem benefits (E_B) would be positive and worthwhile. Moreover, the conversion/restoration/forestation activities will ensure livelihood options and would be climate resilient for community and ecosystem as well.

Valuation of all goods and services provided by mangroves is difficult, methodologies for estimating the intangible services are still evolving, and here effort has been made to analyze the value of all the tangible and provisioning services of the coastal mangroves.

Conclusions

The objectives of this initiative is to focus on **"making ecosystem's values visible";** and inclusion of the values of biodiversity and ecosystem goods and services into decision-making process at all levels.

Valuation failure by planners and decision makers along with **wrongful interventions** by politicians coupled with poor and uncoordinated government policies i.e. the **policy failure** will make southern coastal zone more vulnerable to the climate risk and natural disasters.

Moreover, this effort aims to achieve this goal by following a structured approach of valuation techniques that helps decision-makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystems and biodiversity, and demonstrate their values in economic terms, and ensure appropriate use of those values in **eco-sensitive decisionmaking;** and these will reduce the attempt of **unintentional wrongdoing** by planners and policy makers in **conformity with building climate resilient ecosystem and livelihood of communities** of coastal Bangladesh.

REFERENCES

1. Barua P, Kuri K. C, Chowdhury M. S. M and Rahman M. T, 2010. Climate change and its risk reduction by Mangrove ecosystem of Bangladesh. In: Bangladesh research Publication Journal, Vol-4, 2010.
2. Billah. A.H.M.M., 2003. Green Accounting. Tropical Experience. Palok Publishers. Dhaka.
3. Brander et al, 2012. Ecosystem service values for mangroves in Southeast Asia: A meta-analysis and value transfer application. Environmental Systems Analysis Group, Wageningen University, The Netherlands.
4. Emerton, L., 2012. Valuation of Economic Services in the Mekong Basin. WWF Greater Mekong Program, Bangkok.
5. Fugimoto, K., 2000. Belowground carbon sequestration of mangrove forests in the Asia-Pacific region. Proceedings of Asia-Pacific Cooperation on Research for Conservation of mangroves, Okinawa, Japan, pp. 87-96.

6. GEC (Gujarat Ecology Commission), 2009. Socio-Economic and Ecological Benefits of Mangrove Plantation. GEC, India.
7. Hiraishi T and Harada K,, 2003. Greenbelt tsunami prevention in South-Pacific Region. http://eqtap.edm.bosai.go.jp/
8. Hecht.J.E.,1999. The Economic value of the Environment; Case for south-asia. IUCN.
9. Hossain, M.S. 2009. Coastal Community Resilience Assessment: Using Analytical Hierarchy Process. pp. 1-11. In: Hossain, M.S. (ed.), Climate Change Resilience by Mangrove Ecosystem. PRDI, Dhaka, Bangladesh.
10. Hutchison, J et.al. 2014. The Role of Mangroves in Fisheries Enhancement. The Nature Conservancy and Wetlands International : www.nature.org.
11. Islam M. S & Haque M., 2005.The mangrove-based coastal and near-shore fisheries of Bangladesh: Ecology, exploitation and management.
12. IUCN, 2007. Environmental and Socio Economic Value of Mangroves in Tsunami Affected Areas. Rapid Mangrove Valuation Study, Panama Village in South Eastern Coast of Sri Lanka.
13. IUCN, 2008. Ecological and socio-economic values of Mangrove ecosystems in tsunami affected areas: Rapid ecologicaleconomic-livelihood assessment of Ban Naca and Ban Bangman in Ranong Province, Thailand. IUCN Asia.
14. Mazda, Y., Magi, M., Ikeda, Y., Kurokawa, T. and Asano, T. 2006. Wave reduction in a mangrove forest dominated by Sonneratia Sp. Wetlands Ecology and Management.
15. MOECF, 2013 The economic value of Forest Ecosystem Services in Myanmer and Options for Sustainable Financing.
16. Naik N. R et. al., 1991. Mangrove Ecosystem and Its Importance in Fisheries. In : Aquafind.
17. Pearce, D et al. 1989. Blueprint for a green economy. Eartscan Publications Ltd, London.
18. Saenger. P & Siddiqi N.A, 1993. Land from the Sea: The Mangrove Afforestation Program of Bangladesh. In : Ocean and Coastal Management 20, 1993.
19. Sarker, S et.al, 2010. Mangrove: A Livelihood Option for the Coastal Community of Bangladesh. Institute of Marine Sciences and Fisheries. University of Chittagong, Chittagong-4331,Bangladesh.
20. Das, S & Jeffrey R. Vincent., 2009. Mangroves protected villages and reduced death toll during Indian super cyclone.
21. Soalding. M et al, 2014. Mangrove for coastal defence. Guidelines for coastal managers and policy makers. The Nature Conservancy. Wetland International.
22. Turner R. K., D. Pearce and I Bateman. 1994. Valuing concern for nature. In: Environmental Economics. An elementary introduction. Harvester Wheat-sheaf. Cornwall, UK.
23. Uddin. M. M et al., 2013. Status and protective role of mangrove plantations: A case study of Mirsharai coastal forest, Bangladesh. International Journal of Agricultural Science and Bioresource Engineering Research Vol. 2(2), October,2013

Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project Highlights

Uttam Kumar Saha
&
Md. Iklil Mondal

Project Info

- ❒ The first Climate Resilient Forestry Project in the country
- ❒ The Project became effective on July 02,2012 and ended on December31,2016
- ❒ Total cost of the project Tk 27624.00 lakh(GOB TK784.64lakh,RPA Tk26678.84lakh,DPA TK160.52lakh, as per2ND Revision). In US$ Total cost was 35.00million (BCCRF Grant33.80m,GOB in-kind 1.00m,AF Grant 0.2m)
- ❒ Development Partners: The Government of Australia, Denmark, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the United States and the European Union.
- ❒ Project jointly implemented by Bangladesh Forest Department and Arannayk Foundation
- ❒ Project covered 9 coastal and hill districts and 10 Forest divisions
- ❒ Project development objective: To reduce forest degradation and increase forest coverage through participatory planning/monitoring and to contribute in building the long- term resilience of selected communities in coastal and hilly areas to climate change
- ❒ The Project has strong dimensions of poverty reduction, community empowerment, ecological balance and climate resilience.

Project Achievements:

- ❒ Block plantations 17500ha and Strip plantation 2000 km (golpata943km, strip1057km) estab lished. Plantation target achieved.
- ❒ Out of 17500ha block plantations, 10199 ha have been established in the degraded hills of Chittagong and Cox's Bazar.
- ❒ Out of 17500 ha block plantations, 7301ha have been established in the coastal areas under Four Coastal Forest Divisions.
- ❒ Nine types of plantations have been established under the project .Except Mangrove, Jhaw and golpata, other six types of plantations have been established as mixed plantation using indigenous plant species.
- ❒ Buffer zone, Strip, Golpata, Mound, Jhaw and Non-mangrove plantations have been established on participatory basis. 28465 beneficiaries (Male20921, Female 7544) have been involved in the project plantations .The beneficiaries were selected in a transparent way by a 9 member committee formed at Forest Beat level.
- ❒ These beneficiaries include Landless, Destitute Women, Disadvantaged group, Tribal, Member of CPGs, Forest villager and Freedom Fighters.
- ❒ During project period, 836 Participatory Benefit Sharing Agreements (PBSA) have been handed over to the plantation beneficiaries on group basis. The PBSAs were prepared following Social Forestry Rules, 2004(Revised in 2010, 2011).
- ❒ For ensuring transparency in labor wage payment, Labor database has been created in every Forest Division using National ID Card information.
- ❒ Project generated 3.37 Million Person days of employment through Afforestation and reforestation activities.
- ❒ Under the project a Grievance Redress Mechanism (GRM) was formed at Forest Range level to address complaints and grievances about plantation site selection, plant species selection, labor and beneficiaries selections. The Grievance Redress Committee (GRC) involving 7 members was formed to ensure impartial hearings and transparent decisions.

Uttam Kumar Saha was the Project Director & Md.Iklil Mondal was the Project Manager

- ❒ Environmental and Social Screening have been carried out in every plantation site to avoid negative environmental and social impacts. Environmental Management Framework and Social Management Framework prepared for the project were followed.
- ❒ Plantation area, species planted and seedling survival % were monitored by Management Plan Divisions of Bangladesh Forest Department and IUCN. Seedling survival was more than 95%.
- ❒ IUCN Prepared Land Use and Land Cover (LULC) maps of Project Plantations, delineated the plantation boundaries, measured every plantation parcel using GPS survey. IUCN found 17900ha Block Plantations and 2083km Strip Plantations after field survey.
- ❒ Completed construction of76 Forest Camp Offices in 10 Forest Divisions . The camp offices have been furnished with necessary furniture. Electricity/Solar power have been provided. Water facilities have been developed. Eight Architectural Designs have been prepared for 76 Forest Camp Offices. The Camp offices will be used for office and accommodation purposes in the remote areas .
- ❒ Four fiber body boats have been prepared and given to four coastal forest divisions.
- ❒ Bangladesh Forest Department (BFD) formed the **National Forest Policy in 1994**.The policy laid emphasis on people oriented programs to manage the environment, to preserve existing values, to conserve plants and animals and to maximize benefits to local people.
- ❒ The forest policy enunciated in 1994 was needed to address the current and emerging issues including conservation challenges i.e. climate change, threatened biodiversity and challenges to sustainably manage forest ecosystems to provide goods and services for community wellbeing and overall national development.
- ❒ **The National Forest Policy 2016** has been prepared in both Bengali and English under the Project. After extensive consultations at local, regional and national levels, the Draft Policy has been submitted to the Ministry for approval.
- ❒ Bangladesh Forest Department developed a **Forestry Master Plan** for 20 years(1995-2015). The Master Plan is more than 20 years old and needed an update to address the coming issues and international commitments.
- ❒ Due attention was given under CRPAR Project to update the expired Forestry Master Plan (FMP). International and national Individual Consultants and Consulting Firm were recruited for updating FMP.
- ❒ **The Forestry Master Plan** has been formulated to pursue the following 8 overarching goals:
  - To bring 20% of the geographical area of the country under forest and trees with minimum canopy density of 50%
  - To conserve the remaining natural sal, hill and mangrove forests and to prevent further degra dation or deforestation
  - Strengthen the conservation of wildlife and biodiversity
  - Creation of strong coastal shelterbelt of climate resilient plantations on newly accreted char lands and other unused public lands
  - To improve the socio-economic condition of the forest dependent communities
  - To develop forest product industries and occupations in order to generate more employment
  - To strengthen applied forestry research including current and emerging issues like impacts of climate change
  - To strengthen the forestry sector institution in order to enable them to deliver on all the goals.
  - The FMP would be valid for the period of 2017-2037 after approval

- ❒ RIMS unit of BFD strengthen with soft ware ,hard ware and trained man power.
- ❒ 380 BFD officials and 17000 plantation beneficiaries were trained on social forestry and climate change.
- ❒ Five (5) officers received M.SC from the U.K, Twenty six(26) officers were sent to India for exposure visit, Twenty (20) officers were sent to Philippines, India for 2months certificate courses

and Five (5) officers were trained on MIS/GIS.

- ❒ The awareness raising and communication programs for the project were conducted by a consulting Firm under 4 sections named IPC(Inter Personal Communication) and outreach activities(future search conference, interactive group meeting, street drama and art competition), IEC material preparation and publication(poster ,factsheet ,leaflet ,sticker ,brochure, billboard etc),Advocacy at local and national level(website, face book page ,photo book, documentary etc) and Capacity development programs(workshops and trainings).
- ❒ To reduce forest dependence and enhance resilience of selected communities, alternative livelihoods program were implemented by Arannayk Foundation (AF) with partner NGOs under component 2 of the project.
- ❒ AF selected 6000 beneficiaries/households from 200 villages adjacent to forests for AIGAs. AF formed 200 Forest Dependent Groups(FDGs) and 55 Union Federations .Each FDG Federation established a monthly savings scheme in which each member deposited BDT 100 per month.
- ❒ Total savings of 55 Federations were BDT 13.27 million, while AF provided them BDT 95.18 million from the project. AF established 55 Mutual Rotating Savings and Loan Fund (MRSLF) at Union Federation Level.
- ❒ The Federation Leaders were trained in organizational and financial management functions.
- ❒ The Union Federations got registration from the Department of Cooperatives, Govt. of Bangladesh. The beneficiaries received loans from MRSLF for investing in various AIGAs. Almost 100% borrowers repaid their loan installments.
- ❒ To reduce fuel wood consumption of the FDG household, Improved Cook Stoves(ICS) have been provided to 6000 FDG households.
- ❒ AF provided 33 shallow tube-well, one deep tube-well and 3438 sanitary latrines to the beneficiaries to resolve their crisis of safe drinking water and access to sanitary latrines.
- ❒ AF formed 21 Community Patrol Groups for forest protection.
- ❒ Value chain improvement program has been initiated in 27 villages for four selected product lines namely local poultry ,fish and two types of handicrafts (a kind of floor /bed mat produced from Murta plants and Pebble Child brand of soft toys).
- ❒ Public Procurement Act and Public Procurement Rules were followed for procurement of Goods, Works and Services for the Project. Financial Management of the Project was also sound.
- ❒ In spite of short Project implementation period, the Project achieved all the RDPP Targets. The project incurred expenditure of BDT26499.09 Lac, which was 95.92% of RDPP Cost.
- ❒ Monitoring and Evaluation of Project activities were done carefully by the PMU ,BFD ,World Bank and the MOEF.
- ❒ The World Bank rated CRPAR Project performance for all the four components as Highly Satisfactory.

Synergies between forestry and other sectors in Bangladesh

Laskar Muqsudur Rahman, PhD

Introduction

Forests are key element of terrestrial ecosystem that helps in maintaining ecological balance, biodiversity conservation, protection of watersheds, and control of soil erosion and provide a wide array of essential life-sustaining ecosystem services beyond carbon storage and emissions offsetting- such as health, livelihoods, water, food, nutrient cycling and climate security. These services are essential for the well-being of people and the planet, however they remain undervalued and therefore cannot compete with the more immediate gains from the conversion of forests. Moreover, of late, forests have been adversely affected by growing pressure on account of numerous developmental and social needs such as diversion of forest land for non-forest purposes, timber, fuelwood, non-wood forest products (NWFP) and other goods and services. Inadequate allocation of resources and infrastructure has further aggravated the problems being faced by the forestry sector.

During 2014-2015, contribution of forest and related services to national gross domestic product (GDP) was 1.42% (BBS 2016). However, these figures do not reflect the real importance of the sector in terms of monetary value. The GDP figure does not count the large quantities of fuel wood, fodder, small timber and poles, thatching grass, medicinal herbs, and other forest produces harvested by the local forest dependent communities. The low contribution of the forestry sector to the GDP is also explained by several other factors, e.g. value added from wood processing is counted under the industry sector, rather than the forestry sector. Services provided by forests also cover a wide range of social and cultural considerations and processes. If the value of forest ecosystem services such as NWFP, recreation and carbon is considered in the system of national accounts (SNA) contribution of forestry sector could be as high as equivalent to 6.4% of the national GDP (FMP 2016).

Lack of public awareness and harmonized development policy about multiple functions of forests, valuation of goods and services provided by forest ecosystems has led to allocation of grossly insufficient funds and facilities to the forest department. To this end the article highlights potential interactions between forests and other national priority sectors and how some sectors adversely affect the forestry sector.

Cross-Sectoral Synergies

1. Forest and water

There are few resources, if any, more vital to life than water. The availability and quality of water are threatened by overuse, misuse and pollution, and it is increasingly recognized that both are strongly influenced by forests. Forests can help in alleviating excess surface run off through its leaf litter, acting as sponge that helps in infiltration of the water to underground water aquifers. The forest cover reduces the maintenance costs of water treatment by providing quality drinking water to millions of people. Forested catchments supply a high proportion of the water for domestic, agricultural, industrial and ecological needs in both upstream and downstream areas. A key challenge faced by land, forest and water managers is to maximize the wide range of multisectoral forest benefits without detriment to water resources and ecosystem function. Further, climate change is altering forest's role in regulating water flows and influencing the availability of water resources. Therefore, the relationship between forests and water is a critical issue that must be accorded high priority. To address this challenge, there is an urgent need for a better understanding of the interactions between forests/trees and water, for awareness raising and capacity building in forest hydrology, and for embedding this knowledge and the research findings in policies. Similarly, there is a need to develop institutional mechanisms to enhance synergies in dealing with issues related to forests and water as well as to implement and enforce action programmes at the national and regional levels (Calder et al. 2007).

2. Forest and energy

Wood is considered humankind's very first source of energy. Today it is still the most important single source of renewable energy in Bangladesh. Most Bangladeshi households in rural areas (99%) as well as urban areas

FAO. Consultant

(60 - 66%) use biomass such as wood, cow dung, jute sticks or other agricultural wastes for cooking (Energypedia 2017). Households require up to 2 tons of biomass for cooking fuel annually (Lele et al. 2013). In Bangladesh about 24.82 million cubic meter of fuelwood was consumed by households in 2013 (Factfish 2013). Severely lopped, hacked branches of trees adversely affect the health of trees and the utility of the ecosystem. Collection of leaves for fuel not only damages the plant but also resulted into poor regeneration on the forest floor. There is no affordable alternative for fuelwood in the country. Given that 95% of all staple foods need to be cooked, securing an affordable supply of energy for cooking is crucial. Fuelwood constitutes about 75% of the total wood harvested from the forest . In terms of direct influence on deforestation and degradation, fuelwood use is of particular importance. The improved cook stove that can save up to 50% fuelwood has not yet reached any significant scale in part due to lack of awareness, and lack of information. Biomass briquette plays a vital role in meeting cooking fuel demand of rural areas (Huda et al. 2014). Although the price of briquette is 60% to 70% more than fuelwood, it has growing demand for its better combustion characteristic. To make biomass use sustainable, a comprehensive supply and demand side approach is needed. Accurate and up to date national level data on fuelwood consumption is limited because of the informality of extraction and use, the high cost of conducting surveys to assess the demand and supply, and the highly location specific nature of fuelwood use.

3. Forests and health

The relationships between human health and well-being, biodiversity, healthy ecosystems, and climate change have in recent years received increasing attention in international discussion and policy processes; for example, the Millennium Ecosystem Assessment has listed ecosystem goods and services that are crucial for human survival and without which life on Earth would not be possible (WHO 2005). Forests and trees supply an abundance of ecosystem services that help in creating healthy living environments and in restoring degraded ecosystems. In addition to tangible products, forests for example mitigate floods, droughts, and the effects of noise, purify water, bind toxic substances, maintain water quality and soil fertility, help in erosion control, protect drinking water resources, and can assist with processing wastewater. Forests can mitigate climate change and may help in regulating infectious diseases. Woodlands and trees have a positive impact on air quality through deposition of pollutants to the vegetation canopy, reduction of summertime air temperatures, and decrease of ultraviolet radiation. Forests also provide recreational, cultural, spiritual, and aesthetic services. However, ecosystem services and goods that forests provide are threatened by deforestation, pollution, biodiversity degradation, and climate change (Karjalainen 2010). Forest biodiversity is linked with human health, particularly in the rural and ethnic communities where many people rely on medicinal plants to cure a wide range of diseases and where public health care services are limited. For instance, there are at least 69 species of medicinal plants occur in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh that are frequently used by the hill people to treat about 50 types of diseases (Yusuf et al. 2007).

4. Forest and tourism

The recreation and tourism functions of forests and woodlands are becoming more important around the globe, in particular, for their benefits on economic development, health and well-being and quality of life. Tourists are attracted by splendid scenic beauty of forest landscapes endowed with significant biodiversity. Tourism is one of the fastest growing industries in the country and can be a sustainable alternative to economic activities that would be damaging to forest and biodiversity. On the other hand, tourism may have a variety of negative impacts on biodiversity, particularly when there is no adequate management and number of tourists exceeds carrying capacity (Choudhury & Ahmed 2014). Irresponsible and unsustainable tourism can damage nature through habitat destruction, overexploitation of local resources, waste and pollution, invasive alien species, infrastructure development, and greenhouse gas emissions. The Sundarban is attracting more and more tourists from both home and abroad with its prestine beauty, richness of biodiversity and tranquility. But deficient management and anthropogenic hazards are increasingly jeopardizing the natural treasure's ecology and biodiversity (Molla 2017). Similarly, rush of tourists and tourists orientated but unplanned infrastructures; erosion, turbidity and sedimentation due to construction; removal of mangrove and sand dunes; noise pollution due to

generators and mechanized boats; coral extraction for souvenir trade; trash in water and sewerage disposal into sea all pose severe threat to the ecosystem of St. Martin island. Around 7,500 people live in the 8-square kilometre island and during tourist season another 6000-7000 people visit the island every day (Zinnat & Roy 2015). .However, forest tourism can be a sustainable alternative to more damaging industries. The money that tourists spend can serve nature, society and culture in the form of protected areas and other attractions what is the principle of ecotourism. Sustainable tourism can also make communities proud of maintaining and sharing their traditions, knowledge, and art, which contribute to the sustainable use of local biodiversity .

5. Forests and transport

Although much publicity regarding deforestation drivers is focused on land use activities such as farming or logging, such activities are made possible by infrastructure, such as roads for transportation. Transportation infrastructures, particularly roads and railways contribute to deforestation in both direct and indirect ways. For instance, the creation of roads may result in forest clearance while the roads themselves may facilitate additional activities that contribute to deforestation by opening up forests to agriculture or logging or facilitating human settlement in new areas or increasing access to the forest for non-timber products, due to poor governance and population pressures. The newly-expanded Dhaka-Mymensingh four-lane highway although relived agonizing travel, but tolled considerable area of forests. A portion of proposed 100 km railway track from Dohazari to Cox's Bazar via Ramu and another 28 km track from Ramu to Gundum will go through some parts of the reserved forest areas in Ramu, often roamed by elephants .

Roads have a relatively small impact on forest cover, but the development of roads contributes to habitat fragmentation, and increased mortality of animal populations due to loss of habitat or collision with vehicles. The separation of populations has an effect on animal behavior, as well as implications for genetic flows. Roads also have significant biophysical impacts, such as dust production, which has been shown to negatively impact vegetation growth and animal population movement. The increased sediment deposition from roads can lead to physical alterations of aquatic ecosystems. Roads also have effects on hydrologic cycles by increasing water runoff and reducing evapotranspiration, leading to increased erosion, reduced percolation and aquifer recharge rates, and increased peak discharge levels and frequency of downstream flooding. Transportation and use of chemical products on roads also increases pollution from herbicides, chemical fertilizers, deicing salt and heavy metals (e.g. lead, zinc, nickel) into roadside environments.

On the whole, road construction is recognized as contributing to deforestation and greater road density in nation in forest rich area is associated with higher deforestation. Policy of planned sectoral development should be adopted to mitigate the adverse effect on the forest and forest land of the country (Hossain et al. 2013). Increased monitoring capacity through technologies like satellite imaging may facilitate the more environmentally sensitive expansion of transportation networks (Barber et al. 2014).

As far as water transport is concerned shipping and navigation through the Sundarban is booming like never before. The vessels range from ocean-going mother and feeder cargo ships, container carriers, tankers, lighterage ships, mid-size bulk cargo and tankers from inland waterways.. Without any sort of environmental management in place, this increasing navigation and shipping are multiplying the risk of accidents/spills and regular pollution in the world's largest mangrove forest (Arju 2016).

6. Forests and agriculture

The agriculture sector sustains the livelihoods of millions of families and is at the center of national policies to alleviate rural poverty. However, this need of land for agriculture is also the main driver of deforestation and land degradation since the pre-historic period. At places agricultural land adjoining the forestland in Bangladesh is gradually increasing but at the cost of forest land. A major challenge is how to encourage pro-poor agricultural development while mitigating deforestation and associated greenhouse gas emissions. Stronger regulation and planning at a landscape level are critical ingredients in order to trade-off the prevailing situation. One commonly cited option to reconcile agricultural development and forest protection, which has garnered much support, is through agricultural intensification; the basic idea is to increase agricultural yields per area in order to meet growing food demand that will reduce the need for more land and hence avoid further encroachment

into forested areas (McNally 2015). There continues to be a lack of depth of understanding of the relationship between the forest and agriculture sectors. The situation calls for sustainable land management (SLM) policy and insights into the relationship help decision makers to identify and introduce appropriate interventions that can balance objectives in the forestry and agriculture sectors.

7. Forests and fishery

The Sundarban mangrove is highly productive ecosystem providing shelter, habitat and food for a variety of associated organisms. The Sundarban supports total 291 species of fishery resources and constitutes an important commercial and artisanal fishery industry in the country. Sundarban provides a considerable harvest of whitefish, shrimps, prawns, mud crabs, snails/oysters and billions of shrimp/prawn post-larvae for shrimp aquaculture farms. These industries support about 155,000 fishermen throughout the year (Haque 2004).

Mangroves provide ideal breeding grounds for much of the fish, shrimp, crabs, and other shellfish. Many fish species such as mackerel, pomfret and sardine, find shelter among the mangrove roots as juveniles, head out to forage in the seagrass beds as they grow, and move into the open oceans as adults. Vegetated areas (areas covered by mangrove trees), treeless mudflats and creeks are three main types of habitats of mangrove estuaries (Mukherjee et al. 2012). Fish depends on mangroves and estuaries as nurseries (food and shelter) and that these habitats are important for juvenile and adult fish for their survival and growth (Haque 2004).

Fish as juvenile use of mangroves and seagrass beds by habitats for many reasons including their function as a refuge from predation, the abundance of feeding resources, their ability to intercept planktonic fish larvae, the reduced predator density and the turbidity decreasing the foraging efficiency of predators (Mukherjee et al. 2012).

The soft soil beneath mangrove roots enables burrowing species such as snails and clams to lie in wait. Other species, such as crabs and shrimp forage in the fertile mud. The tons of leaves that fall from each hectare of mangrove forest every year are the basis of an incredibly productive food web. Water turbidity and shade provided by the mangrove leaves and pneumatophores reduce the perception distance of predators and increase the escape rate and consequently the survival rate of young fish and shrimps (Haque 2004).

On the other hand, local villagers often enter the forest and set fire to collect firewood. Subsequently the burnt patches of forest are submerged under water during monsoon and fishermen use the area to catch fish. Fishermen, in the Sundarban, greatly contribute to destruction of the forest resources, including forest wood collected for operating fishing gears and dry fish processing . About 10,000 fishermen on several hundred trawlers and boats go into the sea for collecting fish in the dry fish season every year .

At places in the coastal mangroves have been removed and replaced by coastal shrimp ponds. About 4,000 hectares of land under Chittagong Coastal Forest Division has undergone to shrimp culture. Another 7,450 hectares of natural mangrove forest of Chakaria Sundarban - one of the oldest natural mangroves of this subcontinent, was almost destroyed during eighties for shrimp culture (Islam 2014). In order to significantly reduce the impact of the storm surge - usually the most devastating cyclone hazard - several kilometres of coastal forests are required. Mangroves are more efficient at attenuating surface waves and wind as well as providing protection against erosion (Fritz & Blount 2007). There for coastal afforestation and its protection is inevitable to adapt the adverse impact of climate change.

8. Forests and industry

Although Bangladesh is predominantly an agricultural country, but importance of industry in the economy of Bangladesh cannot be overemphasized. Many industries have been developed in forest areas by the way of illegal possession of forest land (Ahmed 2008). Hasan (2015) reported that at least 59 owners of industries and other powerful individuals grabbed 4,986 hectares of forest land out of 27,033 hectares of forests in Gazipur district. In addition to land resources some industries either large or small such as construction, shipbuilding, pottery, agar, tobacco and puffed rice requires wood for their operation. Industrial and agro-chemical pollution are also potential threats for biodiversity (Rahman 2015).

Bangladesh currently produces around 17 billion bricks per year in around 5,000 to 7,000 brick making industries (BMI) consuming around 45 million tons of fertile soil-equivalent to around 2,600 hectares of agricultural

land (Tehjeeb & Bhuiyan, 2014; Haque 2016; Bharadwaj & Bhattacharjee 2015). Some studies show that annual production of bricks in Bangladesh is as high as 50 billion per year with annual increase rate of about 5.6% annually - tracking urbanization rate of 6% (Baum 2010). The estimated firewood consumption in the BMI is 11-12 tons per 100,000 bricks (Guttikunda 2014). Despite ban on burning fuelwood in the BMI under the Brick Manufacturing and Brick Kilns Establishment (Control) Act, 2013, fuelwood shares approximately 33% of the fuel used in the brick kilns in the country (Rahman 2012) and about 1.9 million tons of wood is burnt annually in the brick kilns, in addition to nearly 3.5 million tons of coal (Bharadwaj & Bhattacharjee 2015). Such use has adverse impact on the forestry sector (Guttikunda & Khaliquzzaman 2014) and resulted in loss of forest land equivalent to estimated 1,831 hectares, cultivated land 20,783 hectares and and village forests 2,454 hectares in 2015 (Islam et al. 2016). The Forest Department handed over 14,833 hectares of forest land to Forest Industries Development Corporation (BFIDC) for rubber gardening. Out of which around 13,207 hectares of rubber plantations have been raised since 1962 (BFIDC 2015).

9. Forests and livestock

Livestock resources also play an important role in the sustenance of landless people. Grazing of livestock on forest plantations in the country is a common practice. The local communities do not have adequate grazing land and livestock grazing in hilly and plain land sal forest areas are alarming. Similarly, grazing of buffalos causes excessive damage to coastal plantations. Livestock grazing has tremendous environmental consequences from land degradation and air and water pollution to loss of biodiversity.

Grazing affects the species composition of a plant community through herbivores selecting or avoiding specific plants, and through differential tolerance of plants to grazing (Szaro 1989). The physical structure of plant communities is often changed by grazing (Huntly 1991). Defoliation can promote shoot growth and enhance light levels, soil moisture, and nutrient availability (Frank et al. 1998). Overgrazing significantly reduce biomass production. Grazing animals can decrease flower and seed production directly by consuming reproductive structures, or indirectly by stressing the plant and reducing energy available to develop seeds. The most severe effect of trampling may be compaction of soils, which damages plant roots (Watkins and Clements 1978) and causes roots to become concentrated near the soil surface (Dormaar & Willms 1998). These changes may prevent plants from acquiring sufficient resources for vigorous growth (Belsky & Gelbard 2000). However, grazing animals can also disperse seeds by transporting seed in their coats (fur, fleece, or hair), feet, or digestive tracts and grazing ungulates may facilitate seed germination by trampling seed into the soil. (Wallander et al. 1995, Lacey et al. 1992).

Livestock often scrape and peel the bark off at the base of the tree. These injuries are points of entry for decay organisms that further reduce the quality of the tree. The value of the entire tree declines because most of the timber's value is in the butt log. Grazing also destroys important food and nesting habitat for many species of wildlife (Reid et al. 2010). Moreover, the local people deliberately set fire in the forest floor with belief that after monsoon new regeneration of vegetation would be more delicious for livestock. Such intentional fire is potential threat to forest regeneration and accelerates soil erosion and loss of organic matter.

10. Forests and mining

Major source of sand, gravel and stone in the country is from in-stream quarrying and mining which comes from different parts of Sylhet division. Although impacts of small scale artisanal mining on forest are believed to be limited and location specific, but Jaflong in Sylhet is a horrid example of stone quarry. The land grabbers occupied government khas land and reserved forestland at Jaflong and extract rolling stones from hills and riverbed using excavators contravening to a court order (Adhikary & Deshwara 2015). More than 250 crushers around Jaflong are crushing stones illegally occupying land belonging to Roads and Highways Department (RHD) and Bangladesh Forest Department (Siddiquee 2015). Sand is also an essential material for all major construction, found in large quantities in forest areas. Sand quarry, for example, in Satchari reserved forest, Raghunandan hill reserved forests in Habiganj and Karerhat in Chittagong (North) Forest Division caused degradation of the forest. In-stream sand quarry across forests and along periphery of the forest causes landslides that in turn result in loss of forest and forestland. Stone quarry in Hazarikhil Reserved Forests in

Chittagong caused considerable damage of the forests.

Although, oil and gas exploration is a risky business in terms of Health, Safety & Environment (HSE), ecosystem and other concerns, but discovery of oil and gas in Bangladesh has brought new hopes for Bangladesh's energy-starved economy. Exploration activities may bring a great change in land use and natural ecosystems by discharging wastes (solid and liquid) and gases on the surrounding environmental elements like land, air and water. Vulnerability of wildlife and biodiversity may come under threat for the activities as it disconnect ecological balance and natural settings of the area (Hoque et al. 2011). Besides, a devastating accident occurred while the exploration in one of the wells in Magurchara gas field. An unimaginable catastrophe broke out in the 840 meter below of surface level in the said gas field on 15 June 1997. The explosion cost too much for the environment. In addition to other sectoral damages it denuded about 300 hectares reserved forest amounting Tk 98.58 billion (Sddiqui 2015). An extensive Environmental Management Plan (EMP) requires to be prepared and followed properly (Hoque et al. 2011).

11. Forests and other land use

Bangladesh suffers tremendously from encroachment and non-forest use of forest land. During the last fifty years over 110,800 hectares of forest lands have been encroached upon in different forest areas and another 112,986 hectares of forestlands have been transferred to other agencies for non-forest purposes . Insufficient demarcation of boundaries of national forests and improper records has made the situation worse. Moreover, district administrations and court of wards lease out forest lands in many districts. This is quite discernible in the coastal region where forests lands have been leased out to individuals for shrimp culture and salt production pans. Nearly 11,830 hectares of forest land has been leased out by district administration during the last fifty years . Evidently, this is the major cause of disappearance of Chakaria Sundarban at Cox's Bazar, the second largest mangroves of Bangladesh (Rahman 2014).

The Ministry of Land passed an order not to lease out any notified forest land (khas land) to any person for any purpose without the consent of Ministry of Land and Ministry of Environment and Forests. Further, the Cabinet Division directed the Deputy Commissioners not to lease out any notified forest land to any person if the land is not returned by the Ministry of Environment and Forests. Further, Deputy Commissioners of Chittagong and Cox's Bazar are also directed by the Court not to lease out any notified forest land. Defying all such directives district administrations continue to lease out notified forest land for commercial shrimp or salt production to individuals (Islam 2014).

In plain land sal forest region, particularly in Gazipur, Tangail and Mymansingh, the problem related to protection of forest land from grabbers and prevention of encroachment is acute. Most of the forest lands were acquired under the provisions of the State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951). The Forest Department (FD) was entrusted as custodian of such forests, but the record of rights was vested with Deputy Commissioners. Meanwhile, many a individual succeeded to make fake documents and the administration leased out such forest land to many individuals. Such complex situations call for survey and demarcation of forest lands, correction of record of rights, cancellation of unlawful lease orders and records, and declaration of forest land as reserved forests under the provisions of the Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927) to protect the remaining forests of the region.

Conclusion

It is high time to take well thought steps to identify and minimize the adverse effects of any activities that lead to deforestation and forest degradation. These may include, but not limited to -

1. Protection of forests and biodiversity for maintaining ecological balance, water, health and renewable energy,
2. Regular forest assessment and monitoring, valuation of forest products, both tangible and non-tangible, for national system of accounts,
3. Non-destructive use of forests through promoting ecotourism with proper management guidelines,
4. Intellectual decision on transfer of forest land for non-forest use choosing the best alternate option, and

5. Giving priority to conservation and development of forest.

Massive afforestation is very much needed to deal with the impacts of a changing climate and every inch of the forest must be protected. Other sectors should not be given priority at the cost of forest and environment. Persistent environment degradation poses a long-term security threat- the sooner it is recognized, the better for the nation.

References

Adhikary, T.S. & Deshwara, M. (2015). Jaflong Ravaged: Stone traders turn beautiful Pyain river into mining site; labourers, not tourists, flock to the place. The Daily Star. December 07, 2015

Ahmed, A.I.M.U. (2008). Underlying Causes of deforestation and forest degradation in Bangladesh. Department of Sociology, University of Dhaka. A Report submitted to the Global Forest Coalition (GFC), the Netherlands. http://vh-gfc.dpi.nl/img/userpics/File/UnderlyingCauses/
Bangladesh-Report-Underlying-Causes-Workshops.pdf

Arju, M. (2016). Will Bangladesh and India turn the Sundarbans into a Busy Shipping Lane? https://thewire.in-/63779/will-bangladesh-india-turn-sundarbans-busy-shipping-lane/

Barber, C.P., Cochrane, M.A., Souza Jr, C.M., & Laurance, W.F. (2014). Roads, deforestation, and the mitigating effect of protected areas in the Amazon. Biological Conservation 177, 203-209.

Baum, E. (2010). Black carbon from brick kilns. Presentation for CleanAir Task Force, 2010.

BBS (2016). Statistical Year Book Bangladesh 2015, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Belsky, A.J. & Gelbard, J.L. (2000). Livestock Grazing and Weed Invasions in the Arid West. Bend (OR): Oregon Natural Desert Association. 31 p.

BFIDC (2015). Agriculture. Forest Industries Development Corporation (BFIDC). Government of the People's Republic of Bangladesh. http://www.bfidc.gov.bd/

Bharadwaj, R. & Bhattacharjee, S. (2015). Greening the brick industry in Bangladesh: Opportunities for South-South cooperation. Devpolicy Blog from the Development Policy Centre. Australian aid, PNG and the Pacific, Global development policy. http://devpolicy.org

Calder, I., Hofer, T., Vermont S., & Warren, P. (2007). Towards a new understanding of forests and water Unasylva 58(4):3-10.

Choudhury, J.K. & Ahmed, Z.U. (2014). Torism: Emerging as a threat to Sundarban ecosystem. The Guardian June 2014. p. 103-106.

Dormaar, J.F. & Willms, W.D. (1998). Effect of forty-four years of grazing on fescue grassland soils. Journal of Range Management 52:122-126.

Energypedia (2017). Bangladesh Energy Situation. https://energypedia.info/wiki/Bangladesh_Energy_Situation#Biomass

Factfish (2013). Bangladesh: Fuelwood, consumption by households (thousand cu. meters) http://www.factfish.com/statistic/fuelwood%2C%20production

FMP (2016). Technical study for review of Forestry Master Plan Task 1: Sectoral Studies for Forestry Master Plan updating Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project. Updating Forestry Master Plan for Bangladesh, Bangladesh Forest Department. 24 July 2016 – Draft for consultation.

Frank, D.A., McNaughton, S.J. & Tracy, B.F. (1998). The ecology of the Earth's grazing ecosystems. BioScience 48:513-521.

Fritz, H.M. & and Blount, C. (2007). Thematic paper: Role of forests and trees in protecting
coastal areas against cyclones. In: Braatz, S., Fortuna, S., Broadhead, J. & Leslie, R. (Comp. & Ed.). Coastal protection in the aftermath of the Indian Ocean tsunami: What role for forests and trees? RAP Publication 2007/07

Guttikunda, S.K. & Khaliquzzaman, M. (2014). Health benefits of adapting cleaner brick manufacturing technologies in Dhaka, Bangladesh. Air QualAtmos Health (2014) 7:103–112.

Guttikunda, S.K. (2014). Emissions from the brick manufacturing industries in Dhaka Megacity. Springer. p.

319-331.
Haque, M.A. (2004). The Sundarbans and coastal fisheries. The Daily Star, May 28, 2004.
Hasan, M. (2015). 12,000 acres of Gazipur Forest land in grabbers' hands. NEWAGE. October 30, 2015.
Hoque, M.M.M., Mondal, M.M., Shahriar, M.S.Z., Ansari, A. & Azad, A.K. (2011). Development of environmental management plan (EMP) for oil and gas exploration along the coastal areas of bangladesh. J. Innov. Dev. Strategy 5(1):50-60
Hossain, M.N., Rokanuzzaman, M., Rahman1 M.A., Bodiuzzaman, M. & Miah, M.A. (2013). Causes of Deforestation and Conservation of Madhupur Sal Forest in Tangail Region. J. Environ. Sci. & Natural Resources, 6(2): 109 -114 , ISSN 1999-7361
Huda, A.S.N., Mekhilef, S. & Ahsan, A. (2014) Biomass energy in Bangladesh: Current status and prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 30: 504–517.
Huntly, N. (1991). Herbivores and the dynamics of communities and ecosystems. Annual Review of Ecology and Systematics 22:477-503.
Islam, K.M.N., Poultouchidou, A. and Henry, M. (2016). Trade-offs between forest ecosystem services and fuelwood consumption of the brick making industry in Bangladesh. International Research Symposium 2016: Valuation of Forest Ecosystems and their Services. 17-19 October, 2016, BMICH, Colombo, Sri Lanka.
Islam, M.T. (2013). People's participation in Protected Areas of Bangladesh. First Asia Park Congress, Sendai City, Japan, 13-17 November 2013. (http://www.env.go.jp/nature/asia-parks/). Accessed 25 July 2016.
Islam, R.S.M.M. (2014). An overview of coastal forest division in Chittagong. The Guardian June 2014. p. 94-96.
Karjalainen, E., Sarjala, T. & Raitio, H. (2010). Promoting human health through forests: overview and major challenges. Environ Health Prev Med. 15(1): 1-8.
Lacey, J.R., Wallander, R., & Olson-Rutz, K. (1992). Recovery, germinability, and viability of leafy spurge (Euphorbia esula) seeds ingested by sheep and goats. Weed Technology 6:599-602.
Lele, U., Karsenty, A., Benson, C., Judicaël Fétiveau, Agarwal, M. & Goswami, S. (2013). Changing roles of forests and their cross- sectorial linkages in the course of economic development. Background Paper 2. Background paper prepared for the United Nations Forum on Forests. Tenth Session, 8-19 April 2013, Istanbul, Turkey.
McNally, R. (2015) Understanding the relationship between Forests and Agriculture: the need for a landscape approach. SNV, the Netherlands Development Organisation.
Molla, H.H. (2017). The Sundarbans: Mismanagement having ecosystem, tourists on the hook. DhakaTribune. February 16, 2017.
Mukherjee, A., Mandal, B., Majumdar, D. & Banerjee, S. (2012). Study on the distribution of fin fish juveniles in few selected rivers of Indian Sundarbans. World Journal of Fish and Marine Sciences 4(6): 554-565.
Rahman, L.M. (2014). Non-Forest Use of Forest Land: The Way Ahead. Souvenir. National Tree Panting Campaign and Tree Fair-2014. Forest Department, Bangladesh. p. 63-68.
Rahman, M. (2012). Brick Energy saving for brick making. Financial Express, Dhaka Sunday June 2, 2012.
Rahman, M.R. (2015).Causes of Biodiversity Depletion in Bangladesh and Their Consequences on Ecosystem Services. American Journal of Environmental Protection 4(5):214-236.
Reid, R., Bedelian, C., Said, M.Y. & Thornton, P.K. (2010). Global livestock impacts on biodiversity. In: Steinfeld, H., Mooney. H.A., Schneider, F. and Neville, L.E. (eds.) Livestock in a Changing Landscape. Drivers, Consequences and Responses. Island Press, Washington, DC, Vol 1, pp. 111–138.
Siddiquee, I. (2015) Illegal stone crushers on govt land at Jaflong. The Daily Star, March 8, 2015.
Siddiqui, M.S. (2015). Magurchara-Tengratila gas field accidents and Bhopal experience. The Financial Express 01 December 2015.
Szaro, R.C. (1989). Riparian forest and shrubland community types of Arizona and New Mexico. Desert Plants 9:69-138.
Tehjeeb, A.H. & Bhuiyan, M.A. (2014). Operation of brick kilns in Bangladesh: A comparative study. Asian Journal of Water, Environment and Pollution. 11(2): 55-65.
Wallander, R.T., Olson, B.E. & Lacey, J.R. (1995). Spotted knapweed seed viability after passing through

sheep and mule deer. Journal of Range Management 48:145-149.
Warren, S. D., Nevill, M. B., Blackburn, W. H. &. Garza, N.E. (1986). Soil Response to Trampling Under Intensive Rotation Grazing. Soil Sci. Soc. Am. J. 50:1336-1341Forests and livestock
Watkins, B.R. & Clements, R.J. (1978). The effects of grazing animals on pastures. In: Wilson JR, editor. Plant Relations in Pastures. CSIRO, East Melborne, Australia. p 283-289.
WHO (2005) Ecosystems and Human Well-being: Health Synthesis. A Report of the Millenium Ecosystem Assessment; 2005. World Health Organization [Available at http://www.millenniumassessment.org/documents/document.357.aspx.pdf].
Yusuf, M.,Wahab, M.A.,Yousuf, M., Chowdhury, J.M. & Begum, J. (2007). Some tribal medicinal plants of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Bangladesh J. Plant Taxon., 14(2):117-128.
Zinnat, M.A & Pinaki Roy, P. Biodiversity of St Martin's under threat. The Daily Star. October 16, 2015.

Haors in Bangladesh and its Biodiversity

Ashit Ranjan Paul & Md Golam Rabbi

Bangladesh is located in the transitional zone between the South and Southeast Asian flora and fauna biomes, which contributed to its historically rich biological diversity. Bangladesh possesses enormous area of wetlands including rivers and streams, freshwater lakes and marshes, haors, baors, beels, water storage reservoirs, fish ponds, flooded cultivated fields and estuarine systems with extensive mangrove swamps. The haors, baors, beels and jheels are of fluvial origin and are commonly identified as freshwater wetlands. These freshwater wetlands occupy four landscape units-floodplains, freshwater marshes, lakes and swamp forests.

Bangladesh possess about 7-8 million hectares of wetlands in different forms for instance, rivers and streams (480,000 hectares), estuarine and mangrove swamps (610,000 hectares), shallow lakes and marshes (120 000-290 000 ha), large reservoirs (90,000ha), small ponds and tanks (150 000-180 000 ha), shrimp ponds (90000-115000 ha) and seasonally submerged flood plains (5,770,000 hectares) (Nishat, 1993). Haors are bowl-shaped depressions between the natural levees of a river subject to monsoon flood every year, are mostly found in the eastern region of the country. There are about 373 haors comprising an area of about 858460 ha. dispersed of Sunamgonj, Sylhet, Moulvibazar, Hobigonj, Netrokona and Kishoreganj district.

District	No. of Haors	Area of District (ha.)	Area of Haor (ha.)	% of Haor area per District
Shunamgong	95	367,000	268,531	73.17
Sylhet	105	349,000	189,909	54.42
Hobigong	14	263,700	109,514	41.53
Moulovibazar	03	279,900	47,602	17.01
Kishoregong	97	273,100	133,943	49.05
Netrokona	52	274,400	79,345	28.92
Bramanbaria	07	192,000	29,616	15.37
Total	**373**	**1999,800**	**858,460**	**42.93**

Beels are comparatively large surface water bodies which accumulate surface runoff water through internal drainage channels; these depressions are mostly topographic lows produced by erosions and are seen all over Bangladesh. There are thousands of beels of different sizes are present in Bangladesh for instance, Chalan beel, Chand Beel, Arial beel, Baikka beel etc.

Baors are oxbow lakes, formed by dead arms of rivers, are situated in the moribund delta of the Ganges in western part of the country. In Bangladesh, oxbow lakes are quite visible in the older flood plains. Locally, the feature is also known as beel, baor, and jheel. Usually, oxbow lakes are deeply flooded during the monsoon, either through local rainfall and runoff water or by river flood. During the monsoon season oxbow lakes act as local water reservoirs, and help to control the local flood level. In some areas, these lakes serve as valuable sources of irrigation during the dry season.

Wetlands always support maximum number of life including wildlife, fisheries, aquatic plants and invertebrates. Most of the wetland in Bangladesh possesses resources for migratory birds especially in the winter season. Around 400 species of migratory birds visited Bangladesh. Huge numbers of migratory birds visit Hakaluki Haor, Hail Haor, Ramsagar and Tangur Haor which is an important Ramsar site.

Tanguar Haor has outstanding conservation value, being a natural freshwater wetland in the country, seasonally

harbouring up to 60,000 migratory waterfowl along with many resident birds. Tanguar Haor resources especially reeds and swamps support birds and wildlife. Based on Nishat (1993), Karim (1993), and NERP (1993a), it is estimated that a total of 141 fish species, 11 amphibians, 34 reptiles (6 turtles, 7 lizards and 21 snakes), 206 birds and 31 mammals occur in Tanguar Haor (Gieson and Rashid, 1997). A total of 12 butterfly species have also been identified (DoZ, 1997) from Tanguar Haor. However, the most recent survey (2011) of IUCN has recorded 19 species of mammals, 24 species of reptiles and 8 species of amphibians in this wetland (Alam et al., 2012). Based on Karim (1993) and BNH (1997), it is estimated that a total of 200 wetland plant species occurred in Tanguar Haor. The most recent survey (2011) of IUCN has recorded 104 plant species under 88 genera and 51 families in this wetland (Sobhan et al., 2012). But the floral and faunal diversity of Tanguar Haor is under extensive threat because of unsustainable use of resources.

158 species of wildlife were recorded from the Chanda beel; among them 7 amphibian, 21 reptiles, 111 birds and 19 mammal species (Chakraborty et. al., 2005); among the birds 19 were migratory species. Seven species of snails are found in Chanda beel among them 2 has commercial importance (Khan et. al., 2005).

The rims of the lakes are used for winter (boro) rice cultivation. The flooded felds in the monsoon became rich with minerals and are very fertile. There are also deepwater rice
verities. The deepwater rice has submergence toleration and elongation ability. At one time, undivided Bengal had about 15,000 varieties of cultivated rice but the germplasum
of most of them is lost leaving only about 6,000 (Khan et. al.1994). Lakes are the source of irrigation in winter. Almost every non-rice crops in Bangladesh grow in winter.

A majority of the people of Bangladesh are critically dependent on wetlands. Wetlands play a crucial role in maintaining the ecological balance of ecosystems. Wetland also provides habitat for a variety of resident and migratory waterfowl, a significant number of endangered species, and a large number of commercially important species. Wetlands habitat of Bangladesh is under constant threat due to increase of population, flash flood, intensive agriculture, overfishing, siltation, pollution, ill-planned infrastructures, lack of institutional coordination, lack of awareness, etc which play tremendous impacts on both biotic and abiotic components of wetlands. Additionally, industrialization as well as agriculture has resulted in serious levels of pollution due to ineffective environmental policy and policy implementation. Climate change risks are considered high in Bangladesh due to its limited land level elevation and its geographical location in a cyclone prone area. As a result biodiversity is reducing, many species of flora and fauna are threatened, wetlands-based ecosystem is degenerating, and the living conditions of local people are deteriorating as livelihoods, socioeconomic institutions, and cultural values are affected.

In order to balance human needs and wetlands conservation, a mainly community-based wetlands management approach has been taken in Bangladesh, but this is not enough to prevent the degradation of wetlands. Therefore, Bangladesh now needs a comprehensive strategy combining political, economic, social, and technological approaches to stop further degradation of wetlands. Policies, strategies, and management plans for sustainable use and conservation of wetlands of Bangladesh must be based on solid knowledge and understanding of their ecological and socioeconomic functions and processes.

***Ashit Ranjan Paul, Conservator of Forests (PRL), Bangladesh Forest Department & General Secretary, Nature Conservation Society.**

***Md Golam Rabbi, Wildlife & Biodiversity Conservation Officer, Bangladesh Forest Department.**

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব

ড. তপন কুমার দে

বাঘ আমাদের জাতীয় প্রাণী ও বীরত্বের প্রতীক। বাংলাদেশে বর্তমানে বাঘের একমাত্র আবাসস্থল হচ্ছে সুন্দরবন। সারা বিশ্বে বন উজাড় ও শিকারী কর্তৃক বাঘ হত্যার ফলে বর্তমানে এই প্রাণীটি মহাবিপন্ন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাঘ পৃথিবীর মাত্র ১৩ টি দেশে এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই ১৩টি বাঘ সমৃদ্ধ দেশকে Tiger Range Country (TRC) বলা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, ভূটান, নেপাল ও রাশিয়া অন্যতম। বাঘের ৮টি উপ-প্রজাতির মধ্যে ইতোমধ্যে বালিনীজ টাইগার, জাভানীজ টাইগার ও কাস্পিয়ান টাইগার বিশ্ব হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বাঘের (Penthera tigris) ৫টি উপ-প্রজাতি (sub-species) কোন রকমে টিকে আছে। এগুলো হল, বেঙ্গল টাইগার, সাইবেরিয়ান টাইগার, সুমাত্রান টাইগার, সাউথ চায়না টাইগার এবং ইন্দো-চায়না টাইগার। ১৯০০ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০টি এবং বর্তমানে বাঘের সংখ্যা প্রায় ৪,৬৬৪ টি, এর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বাঘ রয়েছে ভারতে । বাঘ বিশেষজ্ঞগণের মতে বাঘের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার এই প্রবনতা চলমান থাকলে আগামী কয়েক দশকে পৃথিবী থেকে এ সুন্দর প্রাণীটি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পৃথিবীতে যে ১৩টি দেশে বাঘের অস্তিত্ব এখনো বজায় রয়েছে, বিশ্বব্যাপী বাঘের বিপন্নতা লক্ষ্য করে, প্রকৃতি হতে বাঘ বিলুপ্তি রোধকল্পে ১৯৯৪ সনের মার্চ মাসে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে Global Tiger Forum (GTF) প্রতিষ্ঠিত হয়। Global Tiger Forum হচ্ছে বাঘ অধ্যুষিত এবং বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে সহায়তাদানকারী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। The Global Tiger Forum এর প্রথম General Assembly Meeting গত ১৮-২০ জানুয়ারী ২০০০ ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ১০ দফা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ GTF এর সদস্য দেশ।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী বাঘ ও বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চল সমূহ সংরক্ষণে সম্মিলিত উদ্যোগের সহায়তাদান করছেন বিশ্বব্যাংক; ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন; ইউ.এস.এইড; GTI (Global Tiger Initiative) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত Tiger Summit এ বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের (Tiger Range Country) রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য ঘোষণাপত্র তৈরী হয়।

বাঘ একটি বনের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা নিরূপনের ইন্ডিকেটর (Indicator) প্রজাতি। যে বনের অবস্থা ভাল সেখানে বাঘের সংখ্যা বেশী থাকে। বাঘ কমে যাওয়ার অর্থ বনাঞ্চলের অবস্থা/বাঘের আবাসস্থল বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন। তাই মহাবিপদাপন্ন প্রজাতির বাঘ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ-বিদেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বাঘের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত ১৩টি টাইগার রেঞ্জ দেশ বাঘ সংরক্ষণের জন্য National Tiger Recovery Program (NTRP) ও Global Tiger Recovery Program (GTRP) বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন দেশের বাঘের সংখ্যার সমীক্ষা ঃ

দেশের নাম	বাঘের সংখ্যা
বাংলাদেশ	১০৬ (২০১৩-১৫ সালের Camera Trapping জরীপ অনুসারে)
ভূটান	১০৩ (২০১৫ সালের Camera Trapping জরীপ অনুসারে)
কম্বোডিয়া	৫০
চীন	৪৫
ভারত	২,২২৬ (২০১৫ সালের Camera Trapping জরীপ অনুসারে)
ইন্দোনেশিয়া	৫০০
লাওস	১৭
মালেয়শিয়া	৫০০
মিয়ানমার	৮৫
নেপাল	১৯৮ (২০১৫ সালের Camera Trapping জরীপ অনুসারে)
রাশিয়া	৫৬২ (Camera Trapping জরীপ অনুসারে)
থাইল্যান্ড	২৫২ (Camera Trapping ও রেডিও টেলিমেট্রী জরীপ অনুসারে)
ভিয়েতনাম	২০
মোট = ৪,৬৬৪টি (প্রায়)	

উৎসঃ Global Tiger initiative Report 2016

উপ-প্রধান বন সংরক্ষক (অব:), বাংলাদেশ বন বিভাগএবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি

বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

বাঘ সুন্দরবনের Flagship species হিসাবে কাজ করছে। বাঘ বনের খাদ্য শৃঙ্খলের শীর্ষ অবস্থান করছে এবং এর উপর নির্ভর করছে ঐ বনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যতা। সেই জন্য বাঘ সংরক্ষণের অর্থ কেবলমাত্র একক প্রজাতি ব্যবস্থাপনা নয়; এর সাথে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের আবাস, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রজনন নিয়ন্ত্রন করা। ২৮-২৯ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে থাইল্যান্ডের হুয়া হিন এ মন্ত্রী পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী সভা The 1st Asian Ministerial Conference on Tiger Conservation (1st AMC) অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের ঘোষণাকে সংক্ষেপে Hua Hin Declaration on Tiger Conservation নামে অভিহিত করা হয়। এই যৌথ ঘোষণায় প্রতিটি দেশে মহাবিপন্ন বাঘ ও বাঘের আবাস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে পরিবর্তিত বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য টেকসই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্তস গৃহীত হয়।

Tiger Summit ঘোষণাপত্র ঃ

বিগত ২০-২৪ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে Tiger Summit অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৩টি বাঘ সমৃদ্ধ দেশের সরকার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত ঘোষণার মূল বিষয় গুলো নিম্নরুপঃ

১. আগামী ২০২২ সালে বাঘের সংখ্যা বর্তমান সংখ্যা থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুন করতে হবে।
২. বাঘ ও বাঘের আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত বনাঞ্চল সমূহকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
৩. বাঘের আবাসস্থল সমূহকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মুল আধার হিসেবে চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৪. বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে কোন শিল্প কারখানা স্থাপন, খনিজ পদার্থ উত্তোলন বা পরিবেশ দূষণের মত কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাবে না।
৫. বনাঞ্চলের চলমান টহল ব্যবস্থাকে উন্নতকরে বাঘ ও বাঘের শিকার প্রাণীর নিধন বন্ধ করতে হবে।
৬. বাঘ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইকোট্যুরিজমকে সম্প্রসারিত করে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৭. বাঘ ও মানুষের দ্বন্দ ও সংঘাত নিরসনের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৮. দুই দেশের সীমান্ত সংলগ্ন বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে বাঘের চলাচল যাতে ব্যহত না হয় তার জন্য ট্রান্সবাউন্ডারী ইস্যু নিয়ে যৌথ প্রটোকল স্বাক্ষর করতে হবে।
৯. বাঘ, বাঘের দেহাবশেষ ও চামড়া পাচার রোধ করার জন্য CITES, INTERPOL, ASIAN-WEN ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহয়তা গ্রহণ করতে হবে।
১০. বাঘ ও বাঘের শিকার প্রাণী নিধনের জন্য চলমান বন্যপ্রাণী আইনসমূহে শাস্তির বিধান বৃদ্ধি করে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
১১. বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
১২. বনাঞ্চলে বাঘ ও শিকার উপযোগী প্রাণীর অবস্থা ও সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য, উপাত্ত ও উন্নত বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।
১৩. বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে বনজদ্রব্য আহরণ সীমিত ও হ্রাস করতে হবে এবং এর বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হতে Forest Carbon Financing যেমন REDD+, PES GER ইত্যাদি সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।
১৪. প্রতি দেশকে বাঘ সংরক্ষণে কর্মপরিকল্পনা (Tiger Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৫. সরকার অনুমোদিত জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্মসূচি (National Tiger Recovery Programe) বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৬. প্রতি বছর ২৯ জুলাই ''বিশ্ব বাঘ দিবস'' উদ্‌যাপন করে বাঘ সংরক্ষনে ব্যাপক গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

ঢাকা ঘোষণাপত্র (Dhaka Recommendations)

২০১৪ সালে ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাঘ সমৃদ্ধ দেশ (Tiger Range Country) আন্তর্জাতিক সংস্থা, বাঘ ও বন্যপ্রাণী

সংরক্ষনে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সমূহের সন্মিলিত প্রয়াসে Second Stocktaking Conference of Global Tiger Recovery Programme (GTRP) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সন্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন এবং বাঘ সংরক্ষণে ঢাকা ঘোষণাপত্র (Dhaka Recommendation) প্রকাশ করা হয়। ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়গুলো নিম্নরুপ ঃ

১. বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিশেষ ভাতা/ঝুকিভাতা, রেশন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাসহ দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্য যোগাযোগ ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করতে হবে। এতে করে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত টহলের মাধ্যমে বাঘ ও হরিণসহ অন্যান্য শিকার প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধ করতে হবে।

২. বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলের চিহ্নিত বাঘের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রের ক্ষতিকর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে Smart Green Infrastructure (SGI) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩. বাঘ ও মানুষের দ্বন্দ নিরসনে মানুষ ও গবাদিপশুর জীবনহানি হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান, শিকার প্রাণী ও বাঘ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকার জন্য পুরস্কার প্রদান এবং স্থানীয় জনসাধারণের জীবন-জীবিকার জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪. বাঘ ও শিকার প্রাণী, চামড়া, হাঁড়, শিং, মাংস ইত্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে পাচাররোধের জন্য উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে (Transboundry Tiger Landscope) টহল জোরদার, অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা ও পাচাররোধে route চিহ্নিতকরণ, SAWEN (South Area Wildlife Enforcement Network), ASEAN-WEN (Association of South East Asian Nations Wildlife and Enforcement Network), UNODC (United Nation Office on Drugs & Crime) I INTERPOL এর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও Hotline চালু রাখতে হবে।

৫. যে সকল বনাঞ্চল হতে বাঘ বিলুপ্ত বা কমে গিয়েছে সেখানে বাঘ পূনর্বাসনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৬. প্রতি সদস্য দেশের সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমুহকে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করে নিরবিচ্ছিন্ন অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. বাঘ, চামড়া ও হাঁড়ের অবৈধ ব্যবসা ও বাজার চাহিদা কমানোর জন্য আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাপকভাবে গনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৯. (ক) বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঘ গণনা ও নিয়মিত পরীবিক্ষণ করার জন্য Camera Trapping, DNA Bar codin Tiger genome analysis ইত্যাদি আধুনিক পদ্বতি ব্যবহার করতে হবে।
(খ) প্রতিটি দেশের নিজ নিজ NTRP ও GTRP বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়মিত ভাবে পরীবিক্ষন ও মূল্যায়র করতে হবে।

১০. বাঘ ও শিকারী প্রাণীর তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।

বাঘ সংরক্ষণে দিল্লি ঘোষণা ২০১৬

বিগত ১৪ এপ্রিল ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাঘ সংরক্ষন সন্মেলনে বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের মন্ত্রী, বাঘ বিশেষজ্ঞ ও উর্দ্ধতন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উক্ত সন্মেলন নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রে সকল দেশ একমত পোষণ করেনঃ

বাঘ-মানুষের দ্বন্দ

বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে ৩০-৫০ জন মানুষ বাঘের আক্রমনে মারা যায়। এদের অধিকাংশ বাওয়ালী, জেলে, মৌয়ালী ও জ্বালানী কাঠ আহরণকারী। সুন্দরবনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে বিশেষ করে সাতক্ষীরা রেঞ্জ সংলগ্ন লোকালয়ে মাঝে মাঝে গবাদি পশু বাঘ দ্বারা নিহত হয়ে থাকে। গড়ে বছরে ২-৩ টি বাঘ লোকালয়ে মানুষ দ্বারা নিধন হয়। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা সুন্দরবনের প্রতিবেশ চক্রের পরিবর্তন, জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব, লবনাক্ততা বৃদ্ধি, হরিণ পাচার ও শিকার এবং খাদ্য সংকটসহ বিবিধ কারণে বাঘ-মানুষ দ্বন্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুন্দরবনে ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ (জুন) সাল পর্যন্ত বাঘ ও মানুষের দ্বন্দের একটি চিত্র ঃ

বছর	বিভাগের নাম	বাঘের আক্রমনে নিহত মানুষের সংখ্যা	মৃত বাঘের সংখ্যা			মন্ত ব্য
			মানুষ কর্তৃক নিহত	বার্ধক্যজনিত মৃত বাঘ	মোট	
২০০০	সুন্দরবন বন বিভাগ	৩০	০৫	০০	০৫	বাঘের আক্রমনের ঘটনা এবং গবাদি পশু হত্যার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নথিভূক্ত করা হয় নাই ।
২০০১	সুন্দরবন (পূর্ব ও পশ্চিম) বন বিভাগ	১৯	০১	০২	০৩	ঐ
২০০২	ঐ	২৮	০৩	০০	০৩	ঐ
২০০৩	ঐ	২১	০৪	০০	০৪	ঐ
২০০৪	ঐ	১৫	০৩	০০	০৩	ঐ
২০০৫	ঐ	১৩	০০	০১	০১	ঐ
২০০৬	ঐ	০৬	০০	০১	০১	ঐ
২০০৭	ঐ	১০	০৩	০১	০৪	ঐ
২০০৮	ঐ	২১	০১	০১	০২	৬৫টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ৩জন মানুষ আহত ও ৩২টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০০৯	ঐ	৩২	০৩	০০	০৩	৫৮টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ১জন মানুষ আহত ও ৪টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০১০	ঐ	৫০	০২	০০	০২	৫২টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ১৭জন মানুষ আহত ও ১৬টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০১১	ঐ	৪২	০১	০৪	০৫	৪৫টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ১৫জন মানুষ আহত ও ১৮টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০১২	ঐ	২৯	০০	০৩	০৩	৩৮টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ১১জন মানুষ আহত ও ১৬টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০১৩	ঐ	০৮	০০	০০	০০	২৩টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ৭জন মানুষ আহত ও ১২টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০১৪	ঐ	০৪	০২	০০	০০	১৩টি বাঘের আক্রমনের ঘটনা ঘটে । ৩জন মানুষ আহত ও ৯টি গবাদি পশু নিহত হয় ।
২০১৫ (জুন মাস পর্যন্ত) ২০১৬	ঐ	০০	০২	০০	০০	মাত্র ০১ জন মানুষ আহত হয়েছে ।
মোট =		৩২৮	৩০	১৩	৩৯	

উৎসঃ বাংলাদেশ বন বিভাগের প্রতিবেদন ।

সাম্প্রতিককালে বন বিভাগ ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সন্মিলিত কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির ফলে বাঘ-মানুষ দ্বন্দে জীবন হানির ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে লোকালয়ে চলে আসা কোন বাঘ মারা যায়নি এবং বাঘের আক্রমনে মানুষ মারা যাওয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে চোরা শিকারীর উৎপাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় র‍্যাব ও পুলিশের হাতে ৪টি বাঘের চামড়া ধরা পড়েছে।

সুন্দরবনের বাঘ জরীপে সমস্যা

সুন্দরবনের অবস্থা বাঘ সমৃদ্ধ অন্যান্য বনাঞ্চল হতে সম্পূর্ন ভিন্নতর। এখানে বাঘ চলাচলে কোন নির্দিষ্ট পথ (Track) নেই বিধায় Camera Trapping পদ্ধতি ব্যবহারে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। ২০০৪ সালের পূর্বে Camera Trapping পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। তাই ২০০৪ সালে টঘউচ অর্থায়নে ভারতীয় বাঘ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বাংলাদেশ সুন্দরবনে প্রথম পদচিহ্ন জরীপ (Pugmark Method) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি অন্যান্য বাঘ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলের মত নয়। এখানে কাঁদা ও নরম মাটির

আধিক্য বেশি এবং দিনে দুইবার জোয়ারে সমগ্র সুন্দরবন তলিয়ে যায়। অন্য বনাঞ্চলে একটি বাঘের পায়ের ছাপ উচু-নীচু সব জায়গায় প্রায় একই আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু সুন্দরবনে শুকনো জায়গায় ও নরম কাঁদা মাটিতে একই বাঘের পায়ের ছাপের আকার আকৃতি ভিন্নতর হয়ে যায়। তখন আমাদের হাতে গ্রহণযোগ্য কোন বিকল্প পদ্ধতি ছিলনা বলে উভয় সুন্দরবনে (Pugmark Method) এর ফলাফলের উপর নির্ভর করে বাঘের সংখ্যা ঘোষণা করা হয়। একই সময় এ পদ্ধতি ব্যবহার ভারতীয় সুন্দরবনে ২৫০টি বাঘ এবং বাংলাদেশ সুন্দরবনে ৪৪০টি বাঘ পাওয়া যায়।

বাঘ জরীপে Camera Trapping ব্যবহার

সুন্দরবনে বাঘ চলাচলে কোন নির্দিষ্ট পথ (Track) নেই বিধায় Camera Trapping পদ্ধতি ব্যবহারে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।

তবে ঢাকা ঘোষণাপত্রের আলোকে সকল TRC-কে Camera Trapping পদ্ধতিতে বাঘ জরীপে পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট "স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন" প্রকল্পের অর্থায়নে Wildlife Institute of India সহায়তায় বন বিভাগ Camera Trapping ব্যবহার করে সুন্দরবনের বাঘ গননার কাজ নভেম্বর'২০১৩ মাসে শুরু করে এবং উক্ত জরীপ এপ্রিল/২০১৫ মাসে শেষ হয়। এই যৌথ জরীপের কাজ একই সময় ভারতীয় সুন্দরবনও সম্পন্ন হয়।

ক্যামেরাবন্দি ছবি জরীপ পদ্ধতি নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবন ও বাংলাদেশ সুন্দরবনের কর্মকর্তাদের আপত্তি ছিল। তাই এ পদ্ধতিটিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য Wildlife Institute of India (WII)-এর বাঘ বিশেষজ্ঞ ডঃ রাজভেন্দর ঝালা নেতৃত্বে উভয় সুন্দরবনে Piloting করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট 'Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection' প্রকল্পের অর্থায়নে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা এর যৌথ প্রয়াসে মাঠ পর্যায়ের জরীপ দলকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

নমুনা জরীপের জন্য সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের কমপার্টমেন্ট নং-৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর সর্বমোট ৩০৯.১৮ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় প্রতিটি গ্রীডের আয়তন ৫ বর্গ কিঃমিঃ হিসাবে ধরা হয় এবং ৭১টি গ্রীড স্থাপন করা হয় ও বাঘের ছবি মূল্যায়ন করে ১৭টি বাঘ পাওয়া যায়। অনুরুপভাবে সাতক্ষীরা রেঞ্জের কর্মপার্টমেন্ট নং-৪৬, ৪৭ ও ৫০ (বি) এর ৩৬৬.৪৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় ৭১টি গ্রীড স্থাপন করা হয় এবং বাঘের ছবি মূল্যায়ণ করে ১৩টি বাঘ পাওয়া যায়। একই পদ্ধতিতে খুলনা রেঞ্জের কর্মপার্টমেন্ট নং- ৪১, ৪২ এর ৫৮৮.২০৮ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় ১২৪টি গ্রীড স্থাপন করা হয় এবং বাঘের ছবি মূল্যায়ণ করে ৮টি বাঘ পাওয়া যায়।

ব্লকের নাম	ট্রেপ নাইটে সংখ্যা	পলিগণের ন্যূনতম আয়াতন (ব.কিমি.)	ক্যামেরা বন্দী বাঘের সংখ্যা	বাঘের ঘনত্ব (প্রতি ১০০ ব.কিমি.)
শরণখোলা রেঞ্জ	২৩৮৯	৩০৯	১৮	৩.৭০
সাতক্ষীরা রেঞ্জ	২১৭৭	৩৬৬	১৩	২.৭০
খুলনা রেঞ্জ	৪২২১	৫৮৮	০৭	১.০৮

প্রতিটি গ্রীডে ২টি করে সুবিধাজনক গাছে ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। ক্যামেরাসমুহ প্রতি দুই দিন অন্তর চেক করে মেমেরী কাডের ছবি রেকর্ড করা হয়। এখানে সার্বক্ষনিকভাবে ৩০ জনের একটি জরীপ দল নিরবচ্ছিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় সুন্দরবনে মোট ৩৮টি পূর্ণবয়স্ক ও চারটি বাঘের বাচ্চার ছবি তুলতে পেরেছে বন বিভাগের জরিপ দল। বাকি ৬৮টি বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে খালে তাদের পায়ের ছাপ গুনে ও বিচরণের অন্যান্য তথ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে। ক্যামেরাবন্দী হওয়া ৩৮টি বাঘের ৩০ শতাংশ পুরুষ এবং বাকিগুলো মহিলা। জরীপের ফলাফল চুড়ান্তভাবে মূল্যায়ণ

করে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমবেশী ১০৬টি হবে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্রঃ সুন্দরবনে বাঘ জরিপের জন্য ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে।

বাঘ সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

বর্তমান সরকার বাঘ সংরক্ষণে বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচী ও আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুসারে সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার জন্য বন বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। চলমান তথ্য-উপাত্ত ও বাঘ বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় বাংলাদেশ সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুন করার কোন সুযোগ নেই। তবে আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুসারে সুন্দরবনে বাঘ ও হরিণের সংখ্যা ধারণ ক্ষমতায় (Carrying capacity) রেখে অবৈধ হরিণ শিকার বন্ধ, আবাসস্থলের উন্নয়ন ও নিয়মিত টহল প্রদান করে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১. বাঘ নিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ বিগত জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং উক্ত আইনের ৩৬ ধারায় বাঘ শিকারী বা হত্যাকারী জামিন অযোগ্য হবেন এবং সর্বোচ্চ ৭ বছর সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদন্ড এবং জরিমানা ১ (এক) লক্ষ থেকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

২. বাঘ সংরক্ষণে বাংলাদেশ বন বিভাগ National Tiger Recovery Programme (NTRP) প্রণয়ন হয়েছে।

৩. বন বিভাগ ইতোমধ্যে Bangladesh Tiger Action Plan (2009-2017) প্রণয়ন করেছে।

৪. বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সুন্দরবনসহ সারাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য সমাপ্তকৃত 'Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection'(SRCWP) প্রকল্পের ৫০ জন দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বন বিভাগের ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট (WCCU) RAB, Police, BGB, Coast Guard এর যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী পাচার, বিক্রি ও প্রদর্শন রোধপ্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত অনেক বন্যপ্রাণী পাচারকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং পাচারকারদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় অসুস্থ বাঘকে সেবাদানের জন্য খুলনায় একটি Wildlife Rescue স্থাপন করা হয়েছে।

৫. বন বিভাগ বাঘের Scientific Monitoring ও জরীপের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এপ্রিল/২০১৩ মাসে Wildlife Institute of India এর সহায়তায় Capture Camera ব্যবহারের কাজ শুরু হয় এবং মার্চ /২০১৫ মাসে এ কাজ শেষ হয়। ১০৬টি বাঘ রয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

৬. সুন্দরবনের চার পাশের গ্রামগুলিতে বন বিভাগ, WildTeam ও স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় একটি Tiger Response Team এবং সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রাম এলাকায় ৪৯টি Village Tiger Response Team (VTRT) গঠন করেছে। এর ফলে লোকালয়ে বাঘ আসা মাত্র খবরাখবর আদান-প্রদান ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। সাম্প্রতিককালে লোকালয়ে চলে আসা বাঘ মারার প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে।

৭. স্থানীয় জনসাধারণকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য সুন্দরবনের আশে-পাশের উপজেলায় ৪টি CMC (Co-Management Committee) গঠন করা হয়েছে এবং। জনসাধারণকে জীবনমান উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক কর্মকান্ড এবং সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন করেছে।

৮. বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উহার আলোকে ২০১১ হতে ২০১৫ বাঘের আক্রমনে নিহত ৪৩টি ব্যক্তির পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ও আহত ১১টি ব্যক্তির পরিবা রকে ৫০ হাজার করে মোট ২৫টি পরিবারের মধ্যে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৯. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারী প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদির জন্য একটি Protocol ও একটি MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রটোকল ও সমঝোতা স্বারকের আওতায় বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন পর্যায়ের বন কর্মকর্তাদের ভারতের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা হয়েছে। লোকালয়ে আসা বাঘ চেতনানাশক ঔষধ প্রদান করে অন্যত্র স্থানান্তরকরণ ও সংরক্ষণের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশ সুন্দরবনে ও ভারতীয় সুন্দরবনে চলমান ক্যামেরা ট্রেপিং জরীপে সর্বমোট ১০৬টি বাঘ আছে বলে ধারণা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞের ধারণা বাঘের অস্তিত্ব রক্ষায় বাঘের অন্যতম প্রধান হুমকি চোরা শিকারীদের বাঘ হত্যা ও পাচার, বনের ভিতর দিয়ে লাগামহীনভাবে নৌচলাচল, সুন্দরবনের পাশে বৃহৎ আকার শিল্প অবকাঠামো নির্মান, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, লোকালয় সংলগ্ন খাল-নদী ভরাট এবং শিকার প্রাণী পাচার ইত্যাদি। সুন্দরবনে বাঘের শিকার প্রাণীর মধ্যে চিত্রা হরিণ, শুকর, মায়া হরিণ ও বানর রয়েছে। বাঘের সংখ্যা বাড়াতে হলে শিকার প্রাণির (হরিণ ও শুকর) সংখ্যা বাড়াতে হবে। এখনি সকলকে আমাদের জাতীয় প্রাণী বাঘ সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় এ বিপন্ন প্রাণীটি আমাদের দেশ

থেকে অচিরেই হারিয়ে যাবে।

Reference:

Dey, T.K; Kabir, M. J; Ahmed, M. M; Islam, M. M; Chowdhury, M.M R; Hasan, S; Roy, M.J; Qureshi, Q; Naha, D; Kumar, U. and Jhala, Y.V (2015): First Phase Tiger Status Report of Bangladesh Sundarbans. 37pp.

Dey, T.K; (2014) Second Golobal Tiger Stocking Conference and Sundarbans Tiger ‰onservation Landscape. Banbhaban, Agargaon, Dhaka. 44pp.

Dey, T.K. (2015). Guide Book on Wildlife Law Enforcement in Bangladesh. Banbhaban, Agargaon, Dhaka.80pp.

Khan. M.N.H.K (2004). Ecology and Conservation of the Bengal Tiger in the Sundarbans Mangrove Forest of Bangladesh. PhD Thesis, University of Cambridge, UK.

Jhala, Y.V; Qureshi, Q; Roy, M; Nahar, D; Gopal, R. and Dey, T.K. (2014). Field Guide Monitoring Tigers, Prey and their habitats in Sundarbans. Technical Publication of National Tiger Conservation Authority, India, Bangladesh Forest Department and Wildlife Institute of India. TR 2014/D10.

Barlow, A.C (2009) The Sundarbans Tiger adaptation , population status and conflict management. Ph.D. Thesis. University Minisota, US.

Restoring Forest Ecosystems

Ram Sharma

1. Introduction

Forest ecosystems in Bangladesh provide significant socio-economic and ecological services in terms of life supporting, provisioning and regulating functions. The country's forest landscapes such as critical ecosystems including the hill forests, Chittagong Hill Tracts (CHT) and coastal ecosystems such as the Sundarbans and greenbelts are vulnerable to climate change induced events, and natural hazards and disasters. Main objective of this paper is to provide for implementation of climate change mitigation and adaptation options and opportunities through climate resilient forest ecosystems and communities based on an integrated landscape approach for climate forestry.

Bangladesh's predominantly land-based economy is characterized by land-based sectors including forestry, fishing, shrimp farming, agriculture, plantations, salt farming, and tourism. Forest ecosystems of Bangladesh are vital as they provide goods and services that are essential for functioning of healthy land-based ecosystems and wellbeing of local community by improving their climate resilience.

The role of natural forests and plantations in carbon cycle is particularly vital as they account for approximately 80% of CO2 exchanged between land and atmosphere through the process of photosynthesis. The climate change mitigation role of forests and plantations in terms of sequestration and storage potential of the CO2 depends on their growth, conservation and sustenance. The climate community resilience role stems from the fact that huge number of people depend on forests and plantations for resilience functions by providing a coping mechanism to poor and vulnerable.

Climate change projections in Bangladesh include sea level rise, temperature rise, and increased frequency of cyclones, storms, tidal surges, drought and other water-induced extreme events. The country's coasts have a gentle topography and so are particularly vulnerable to sea-rise and consequent adverse impacts of cyclones and tidal surges. Increased snow melt in the Himalayan glaciers (releasing more water in a drought year and less water in a flood year) could bring large quantity of fresh water, with consequences for the composition of forests and plantations, favoring plant species that have the least tolerance to salinity. High sedimentation brought from the Himalayan rivers influence local level sea variations in the Bay of Bengal.

Enhancing forest ecosystem and community climate resilience would, in addition to reducing exposure and sensitivity, involve increasing adaptive capacity of coastal plantation ecosystems and landscape community. Mainstreaming climatic variability and change, while designing and implementing climate forestry programs, will enhance forest ecosystem resilience, benefiting the landscape community. Possible climate forestry programs are suggested as below for field implementation by Bangladesh Forest Department.

2. Climate Resilient Forests and Protected Areas

Climate resilient enrichment plantations, afforestation/reforestation, and social forestry including private nursery and tree growing will be priorities on unused public lands including forestlands, and on vacant private lands including homesteads. However, before taking up plantations of climate resilient species in mixture, relevant threats and drivers of degradation of forests and watersheds will be identified and mitigating measures implemented in collaboration with key stakeholders including local and indigenous communities. Inter-sectoral convergence (forests, social forestry, agroforests, homesteads, agriculture and fisheries, rural energy, livestock, community development, etc) in the khas lands including newly accreted mud-flats and charlands will be focused by involving local community with priority being given to poor, destitute women, vulnerable and indigenous community by following the Social Forestry Rules, 2004 (and subsequent amendments).

Forest Management and Policy Specialist

Climate resilience of existing forests and plantation ecosystems will be enhanced by controlling conversion of forestland to non-forest land use by coordinating with district administration, and by enhancing biodiversity value through forests consolidation, effective protection, assisted natural regeneration, and integrated micro-watershed management practices. Climate change adversely impacts biodiversity and exacerbates forest land use impacts, besides other threats. Forest areas brought under plantations by BFD will not be leased out for non-forestry purposes. Silvicultural operations such as natural regeneration management through weeding, cleaning, thinning and soil/water conservation will be carried out.

Coastal greenbelts including the Sundarbans and protected area (PA) ecosystems will be conserved to buffer the adverse impact of climate change induced natural disasters such as cyclones, storms and landslides. Degraded and unused public lands will be restored, consolidated and managed through collaborative and participatory afforestation/reforestation, social forestry and eco-restoration practices to sequester carbon and to reduce GHG emissions. Sound coastal zone management practices including stabilization of embankments through participatory plantations will be promoted in association with land owning agencies such as Water Development Board, and Roads and Highways Department.

The scope of climate resilient afforestation, reforestation and social forestry will not be limited to planting tree seedlings of quick biomass growing species only : Measures of eco-restoration of degraded forest ecosystems including plantations and hill forests with habitat biodiversity (multi-story indigenous vegetation of climate resilient shrubs and trees in mixture) will be emphasized by gainfully involving local communities in enrichment plantations and in assisted natural regeneration. Given effective joint protection, the treated forest landscapes will over the period get restored due mainly to the country's potentially regenerative forest lands with rootstocks, particularly in degraded hill forests. Integrated watershed management approach will be followed in hilly forest landscapes by identifying and managing micro-watersheds which will be treated for water and soil conservation from hill top to the bottom by gainfully associating local community including hill and indigenous community, women and youth.

Social forestry programs will be accelerated by renovating permanent nurseries and forestry training and information centers. Climate resilient afforestation/reforestation and social forestry including newly accreted mud-flats and charlands will be given priority by involving local community. Newly accreted charlands will be assigned to BFD for stabilization through plantations of pioneer species such as Keora and Baen by employing appropriate ecological succession and soil conservation practices. The following specific field programs are suggested to implement climate forestry as described in detail.

2.1 Restoration of Degraded Forests and Watersheds

Many forests and plantations have become degraded and so are in need of rehabilitation measures including enrichment plantations in identified gaps and assisted natural regeneration. In addition to illicit felling and land conversion, geographical changes in forest floor, plant succession, seedlings mortality due to insect infestation, and lack of inundation due to sedimentation and rising forest floor have adversely affected forests by creating openings. This is compounded by the fact that natural regeneration in many degraded forest area is either not coming up or initially coming up but not getting established.

2.2 Plantations Maintenance

Plantations have been raised in various forest divisions under different projects such as the CRPARP. The maintenance of plantations, raised under any previous forestry project, will be taken up regularly.

2.3 New Climate Resilient Plantations

In order to ensure climate resilience of land-based natural resources and local communities it is vital that new plantations are raised on unused public and private lands. New plantations will be established on forest land and unused private land, including strip plantations on unused public land. BFD has pioneered nursery and planta-

tion techniques which will be followed for establishing nurseries and raising new plantations in different forest divisions.

Most of new charlands are accreted in central coastal zone which extends from Feni river estuary to the eastern periphery of the Sundarbans Reserved Forests, covering Noakhali, Barisal, Bhola and Patuakhali districts. This fluvial zone receives a large volume of discharge from the Ganges-Bhrahmaputra-Meghna river system with high volume of silt deposition which gives rise to dynamic coastal system with accretion and erosion resulting in net gain of about 30 square km annually. About 60 new islands have been identified in this zone. All the high charlands and some low charlands are suitable for coastal afforestation of mangrove species and so will be covered under plantation of suitable species.

2.4 Climate Resilient Protected Areas Management

BFD will coordinate with respective district administration so that land-based public development initiatives including infrastructure planning and implementation will avoid fragmentation of wildlife and biodiversity habitats and minimize PA and forest ecosystem damage. Co-management of identified PAs and their landscapes will be implemented for sustainability of PA conservation in association with key stakeholders including indigenous people, youth and women.

Threats and drivers of wildlife poaching and biodiversity loss will be identified and mitigated in identified PAs by strengthening enforcement of provisions of the Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012, and by forging meaningful collaboration with relevant agencies and key stakeholders by following relevant provisions of the co-management guidelines. Human-wildlife conflicts in and around the PAs and corridor forests will be minimized by adopting collaborative management and negotiation tools, and participatory biodiversity conservation practices. Level of illegally traded wildlife will be reduced, and national commitment and collaboration will be expanded and strengthened for combating wildlife poaching and trafficking.

Environmentally sound and socio-economically inclusive nature tourism, related to the landscapes of forest ecosystems, PAs, wildlife, wilderness and natural sites, and indigenous community culture will be promoted keeping in view the carrying capacity of nature in the PAs. Eco-tourism facilities and visitor management will be compatible with nature conservation by making positive contributions to the welfare of indigenous community and forest ecosystem health. Select wildlife areas as priority habitats of biodiversity in various forest divisions will be identified for declaration as new PAs and their sustainable management. The occurrence of flagship fauna, their habitats and foraging behaviors, and home ranges will be considered while identifying and declaring a new PA and/or re-gazetting an existing PA. Hill and coastal PAs would particularly be focused as a solution to mitigate natural disasters and other threats.

2.5 Private Nursery Development and Tree Growing

The climate vulnerability of coastal and forest dependent communities will be reduced by promoting climate resilient private nursery development and tree growing including agroforestry practices with focus on silvi-horticulture-fisheries-agriculture systems in homesteads. Pukurs in village households with fisheries will form part of rural agroforestry systems. Village forest inventory will be carried out periodically to provide technical advice to villagers and develop innovative peoples' nurseries and tree growing initiatives. Communication and extension programs as detailed in Part III will focus on private tree growing in addition to public land forestry initiatives.

In view of limited amount of public forestland, social forestry, afforestation/reforestation, medicinal plantation, agroforestry, rural forestry, horticulture (with focus on planting of fruit bearing tree species), and eco-restoration will be taken up in unused public and private lands by promoting climate resilient indigenous species in partnerships with local people. Silvi-horticultural-fisheries practices with focus on fruit bearing species will be promoted for augmenting nutrition for rural poor including women and children, and other vulnerable groups

and marginal sections of the society.

2.6 Conservation of Critical Forest Ecosystems (Coastal Greenbelts, the Sundarbans and the CHT)
Existing critical forest ecosystems including coastal greenbelts, the Sundarbans and the Chittagong Hill Tracts (CHT), necessary to cope up with the challenges of climate change and disaster risks, will be conserved and maintained by enforcing available legal instruments and by empowering field-level staff and also by gainfully associating local community. Stakeholders' participation will be ensured through supportive rules, regulations and guidelines under the existing forest, social forestry and wildlife Acts and Rules. Strict but equitable enforcement of applicable forest and wildlife Acts and Rules will be ensured to curb illegal tree felling, forestland encroachment, forest fire, grazing, illegal wildlife trade, and wildlife poaching and trafficking.

Joint Patrolling Groups will be formed by mobilizing preferably active and young members amongst the beneficiary groups. Existing groups will be expanded and strengthened with preference given to them as participants under the Social Forestry Rules, 2004. However, no clear felling will be done in view of these critical ecosystems' positive climate resilient externalities flowing to local people.

BFD will maintain coordination on priority basis across enforcement, regulatory and intelligence agencies to check illegal felling and wildlife poaching and trafficking which will be integrated with other relevant GOB efforts to combat organized crime. Confidential information gathering from local community will be solicited with suitable incentives and rewards mechanism for key stakeholders.

Due to their strategic geographical locations, the sustainable management of the critical forest ecosystems is vital for the protection, restoration, sustainance and conservation of the biodiversity and also for the wellbeing of the local community and beyond. The protection of these forests will be enhanced by strengthening institutional mechanism and coordination with relevant law enforcement agencies. As part of communication and outreach programs judiciary responsible for dealing forest and wildlife offence cases will be sensitized on wildlife and forest protection issues.

Forestland encroachment, forest fires and forest grazing will be controlled and stabilized by gainfully involving local communities in social forestry and participatory management of forests, plantations and PAs. Public awareness will be raised through better communication and outreach about the harms done by illegal forest felling and encroachment, wildlife trafficking and poaching. Human-wildlife conflicts in and around forests and PAs will be addressed in partnerships with the local community including indigenous community.

3. Conservation-linked Value Chain Development
Livelihood programs including community patrolling group initiatives will be strengthened and upscaled to cover all the participants households. Improved conservation-linked livelihoods, addressing climate change vulnerability of local community are needed to ensure sustainability of climate forestry. It is necessary that livelihood programs follow a value chain approach and are linked with community climate vulnerability and forest conservation to have better impacts on reducing forest dependency and enhance climate change adaptation of the local community. A holistic approach is needed to ensure sustainability by closely connecting livelihood programs with forest conservation and climate change adaptation.

Climate change vulnerability assessment and design of conservation-linked livelihoods for climate change adaptation will be taken up before field implementation. Conservation-linked livelihood development will be encouraged by promoting conservation-linked forest and non-forest based micro-enterprises through a well designed communication campaign by employing mass electronic and print media. A menu of conservation-linked livelihood activities will be prepared in consultation with field staff with focus on forward and backward linkages to local economy. A value chain approach will be followed for select income generation activities. Social inclusion of marginalized communities including indigenous people and destitute women will

be attempted by adopting an affirmative discriminatory approach.

4. Climate Forestry Support Programs

Climate resilient support programs for sustainable forestry are categorized in three main headings : communication, extension and monitoring; capacity building; applied research; and logistic support which are detailed as below:

4.1 Climate Forestry Extension, Communication and Monitoring

Climate forestry extension and communication, and participatory monitoring strategy with appropriate conservation messages and briefs will be developed and implemented by BFD in wide consultation with key stakeholders by employing knowledge, attitude and practice surveys. Women, youth, indigenous community and other marginal sections of the society will be given equitable representation and importance in forestry extension and communication, and participatory decision-making and implementation. Climate forestry extension will be key driving force for the growth and development of private nursery and tree growing, PA conservation, and climate change messages development and dissemination. Forestry extension through FENTCs and SFPCs and technical assistance to private nursery and tree growers will be strengthened by widely publicizing through theatres, Melas, public-days, mass media, audio-visual aids, white papers, and other extension tools and mechanisms.

Forestry extension will be strengthened to develop Sabuj Clubs within the existing agriculture extension centers at Union Parishads as main civil society institutions for the promotion of private nursery and tree growing, and raising awareness on climate change in coastal areas. Agricultural extension facilities including the extension staff up at Union Parishad level will be leveraged wherever possible. Schools and colleges will be approached for making students aware on forestry, environment and climate change issues. Forestry extension will deliver necessary messages on forest functions and services, backed up with proper applied forestry research linkages and field evidences, and to speed up peoples' access to and adaptation of silvicultural and forest management best practices, and nursery and plantation technology.

Communication campaigns will be taken up to build awareness and instill pride in the significance of forests amongst local community particularly for mitigating climate change. There will be massive campaign far and wide through the government and non-government media for raising consciousness among the people regarding afforestation, biodiversity and PA conservation, climate change, horticulture including nutrition rich fruit trees, and sustainable use of forest resources. Vital climate change mitigation and adaptation role of forests and PAs will be recognized by and communicated to all stakeholders including socio-political elites and other decision-makers.

Public and private land owning agencies such as LGED, PWD, Municipalities, and Union Councils will be encouraged for tree growing on vacant lands. Advanced information and communication technology and media will be employed in knowledge and information dissemination on private tree growing, climate change and biodiversity conservation. Government, NGOs and private sector partnerships will be encouraged on forestry extension and communication. As part of decentralized governance, key stakeholders including women, youth and indigenous community will be outreached to enhance their techno-managerial capacity in participatory afforestation, conservation, management and monitoring of forests and PA landscapes.

Technical assistance and extension services will be provided to the citizen and the private sector for climate change mitigation and adaptation initiatives; private tree growing; community and homestead forestry; involvement of youth, women and indigenous community in private nursery development and tree planting; and for climate resilient public-private tree growing partnerships. People will be motivated to grow more trees in and around homesteads and on unused marginal lands (e.g. the premises of institutions such as Union Council;

educational organizations; religious places including idgah, mosque, monastery and temple; orphanage; roadside; railway track side; foreshore; urban spaces; embankment; etc.) with due emphasis on climate resilient shrub and tree species including indigenous NTFP, fodder and fruit bearing tree species.

By strengthening Resources Information Management System (RIMS) and employing the updated protocols as developed under the CRPARP, the project monitoring will be implemented by the BFD for periodical collection, analyses, documentation and dissemination of reliable data on various project activities. It would also take up mapping, and MIS- and GIS-based forest and PA management planning and monitoring. Forest land survey, demarcation, mapping, settlement and documentation will be taken up regularly by RIMS as part of forest and PA monitoring and evaluation.

Regular periodic forest ecosystems health and valuation assessments and monitoring will be undertaken by employing modern and web-based technology including satellite imagery, aerial photographs, GIS and MIS. Monitoring indicators, their assessment and verification methodology and analyses approaches will be specified. A central data base with appropriate GIS and MIS and other digital systems will be operationalized in order to strengthen forest governance by increasing accountability and transparency in public forest management, and data archiving.

4.2 Capacity Building and Facility Development for Climate Forestry

RIMS will be supported to be developed as a full fledged wing within BFD. Institutional and techno-managerial capacity will be built amongst forestry organizations including BFD and BFRI; conservation NGOs; civil society; and forest dependent community through strategic planning, training and applied research; participatory monitoring and evaluation; and decentralized governance, communication and extension. The capacity of BFD staff will be re-oriented to climate change, coastal biodiversity conservation and environmental services management by strengthening forestry training institutions including the Forest Academy, Chittagong and various Forest Science and Technology Institutes. Efforts will be made to develop capacity of BFD and BFRI to monitor forests and PAs especially as it relates to quantity and quality of environmental services, impacts of climate change, and assessment and analyses of carbon stock by tapping-in to contemporary science and technology.

Existing training facilities at the Forest Training Academy, the Forest Development and Training Center, and the Forest Science and Technology Institutes will be strengthened with qualified faculty, and adequate budget and logistic support. Forestry curriculum in forestry education organizations will be updated with focus on emerging subjects such as climate change, sustainable coastal forest and PA management, conservation biology, and coastal landscape ecology. The capacity of BFD and BFRI staff and civil society partners will be built to prepare, implement and monitor carbon financing projects for climate forestry.

4.3 Applied Research on Climate Forestry

In view of changing climate forestry scenario in the present times and also evolving needs, applied research will be futuristic in approach to cater to new and emerging challenges. Applied forestry research will be strengthened with defined institutional roles and responsibilities of the BFRI by establishing close BFD field linkages and collaboration. Main focus of applied forestry research will be on current and emerging themes, including but not limited to forest ecosystem restoration, ecosystem services valuation, sustainable mixed plantations raising and management, site-species matching and genetic improvement, indigenous species seeds and propagation, and biodiversity conservation.

A proactive involvement of the BFRI with BFD is very much required to steer climate forestry in right direction. Attention will be given on improved planting materials, germplasm conservation, gene banks, and biodiverse, climate resilient plantation and PA management. The BFD and BFRI will reach out to public and private universities and other organizations engaged in forestry research. Applied research will reach out to the stake-

holders so that stakeholders can be benefited by work carried out in particular areas. More emphasis will be given on extension of developed technologies for getting the maximum benefits.

Forest-carbon financing and other payment for environmental services opportunities will be investigated and established as part of implementing national REDD+ strategy as low carbon emission development strategy with baselines and targets, and formulating forest-carbon financing proposals on A/R CDM, REDD+ and other evolving mechanisms.

Protection of forest ecosystems services, including but not limited to water yield, carbon sequestration, nature tourism, wildlife and biodiversity conservation, soil fertility and agricultural productivity enhancement will be targeted by following Payment of Ecosystem Services principles and other evolving methods. Indirect benefits from forests and PAs will be assessed and disseminated.

Forest ecosystem-based disaster mitigation and risk reduction programs including coastal embankments stabilization with participatory plantations of shrub and tree species, and integrated watershed management in hill forests and CHT will be taken up as applied research initiatives. Healthy, biodiverse forest ecosystems managed based on applied research findings will help relieve adverse impacts of climate change on the neighboring community and on their land use.

5. Conclusion

BFD has in past successfully implemented a number of forestry development projects successfully. The capacity so developed in the process can be harnessed by BFD to design, develop and implement climate forestry projects with assistance from donors such as the World Bank.

Development of Sustainable Forestry Plantations in Bangladesh- Myths and Realities

Dr. Mohammed Kamal Hossain

1. Introduction

Forest is defined as "Land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10 percent, or trees able to reach these thresholds in situ (FAO 2015). This definition includes industrial tree monocultures that are consequently counted as forests by the FAO. Whereas, forests are the most biologically-diverse ecosystems on land, home to more than 80% of the terrestrial species of animals, plants and insects. In Bangladesh, the forest lands account for almost 17.5% (2.53 million ha) includes classified and unclassified state lands, homestead forests and rubber gardens. Of the 2.53 million ha of forest land, the Forest Department manages 1.53 million ha including hill, Sal and Sundarban forests (Hossain 2015). The remaining 0.73 million hectare of land designated as Unclassed State Forest (USF) and are under the control of Deputy Commissioners of the three hill districts of Chittagong Hill Tracts (CHT).

The natural forests of Bangladesh consist of three major vegetation types occurring on three different land types. But, the natural forests are shrinking rapidly due to illegal felling, encroachments, over-exploitation, poor management, wrong silvicultural practices etc. At the beginning of the management of these forests, the main objective was to replace these heterogeneous natural forests with the plantations of commercially valuable species. Altrell et al. (2007) classified the forests by origin and type and mention the natural forests is 12,05,000 ha and plantations is 2,30,000 ha (Table 1).

Table 1. Bangladesh forests by origin and type

Origin	Type	Area (h)a)
Natural Forests (1205,000 ha)	Hill forests	551,000
	Sal forests	34,000
	Mangrove forests	436,000
	Bamboo or bamboo mixed broad leaves forests	184,000
Plantations (230,000 ha)	Long rotation plantations	131,000
	Medium-short rotation plantations	54,000
	Mangrove/ Coastal plantations	45,000
	Rubber plantations	8,000

2. Plantation forestry

A plantation is "A forest crop or stand raised artificially, either by sowing seeds or planting by seedlings/cuttings". Plantation forestry has a commercial focus and plantation forests are not natural assets in the same sense as native forests; they are assets deliberately grown, often described as tree farms, for one or more specific purposes. Since the protective and environmental roles of plants were acknowledged by the global community, plantation was thought to be a large artificially established forest, farm or estate, where crops are grown for sale, often in distant markets rather than for local on-site consumption. Plantation forestry makes it possible to create a forest in the land which may have been lost altogether or has deteriorated seriously in recent time. A sustainable tree plantation conserves native ecosystems, enhances local welfare and is financially profitable. Well designed tree plantations can also help save existing natural forests. However, considering all sorts of goods and services derived from the natural forests, plantations may not be the substitute of natural forests (Table 2)

Professor, Institute of Forestry and Environmental Sciences , University of Chittagong, Bangladesh , E-mail: mkhossain2009@gmail.com

Table 2. Comparison between the natural forests with plantations

Parameters	Natural Forests	Plantations
Accessibility	Usually difficult	Good
Future availability of land	Diminishing	High, in degraded and abandoned areas
Growth of target trees	Low to medium	Usually high
Yields per ha per year	Low	High
Genetic improvement possibilities	Presently low	High
Initial costs	Low	High
Management and silvicultural costs	Medium to high	Low to medium
Logging and transportation costs	High	Low
Soil effects	Negligible	Potentially high
Pest incidence	Low	Potentially high
Biodiversity	Medium to high	Low
Non-timber /non-wood forest products	Possible	Absent
Certification process	Often difficult	Relatively simple

2.1 Increasing global plantations: In spite of that the global plantations are increasing and the natural forests are decreasing due to a number of reasons. The expansion of planted forests between 1990 and 2010 showed about 48% increase in global plantations (Table 3). In 2010 planted forests accounted for only 7% of the global forest area (about 2% of land use), but had the potential to produce two thirds of the 1.8 billion cubic meters of the global industrial roundwood demand, with an anticipated increase to 80% by 2030 (Carle and Holmgren 2008). Furthermore, the increasing importance of afforestation and reforestation in adaptation to, and mitigation of climate change is being widely acknowledged in the mechanisms of the UN Framework Convention on Climate Change (Clean Development Mechanism, REDD-plus etc.).

Table 3. Planted forest expansion (million ha) between 1990 and 2010 by regions (Kröger 2012)

Region	In 1990	In 2010	Change % (1990-2010)
Africa	11.663	15.409	32.1
Asia and the Pacific	74.163	119.884	61.6
Russian Federation	12.651	16.991	34.3
Europe	46.395	52.327	12.8
Caribbean	0.391	0.547	39.9
Central America	0.445	0.584	31.2
South America	8.276	13.821	67.0
Near East (excluding N. Africa)	4.677	6.991	49.5
Canada	1.357	8.963	560.5
Mexico	0.35	3.203	815.1
USA	17.938	25.363	41.4
World Total	**178.307**	**264.084**	**48.1**

2.2 Plantations in the tropics: Interest in plantations in the tropics is also increasing rapidly (Harwood and Nambiar 2014). The plantations have some advantages over natural forests from management and economic point of views, such as concentrated production, ability to choose species with desirable characteristics. Successful plantation technologies have been developed in many tropical countries of the world (Kanowski and Savill 1992). Light demanding, colonizing exotic species have been the most successful in monocultures under plantation management programs (Hughes 1994). The tropical and sub-tropical plantation forestry has focused on a small number of fast growing, colonizing species, e.g. Acacia, Eucalyptus, Gmelina, Pinus, Populus and Tectona (Harwood and Nambiar 2014). Three genera, Eucalyptus, Pinus and Tectona account for 85% of all plantations in the tropics (Evans 1992). These species have the ability to capture the site rapidly and tolerate harsh soil and climatic conditions and protected from animals, fire etc. These characteristics of exotics are a pre-requisite for success on the often highly degraded sites. Higher growth and yield of exotics over indigenous

species have been attributed because of their greater tolerance of degraded sites and their escape from specialized pests and diseases. Successful exotics are as Spruce in Europe, Radiata pine in Australia and New Zealand, Ipil-ipil in Philippines and Australia, Eucalypts in India, China and Brazil (Evans 1992).

2.3 Plantation forestry in Bangladesh: The first attempt of raising forest plantations was made in 1871 with teak, at Kaptai using seeds brought from Myanmar. Since then plantation forestry has become a part of the overall clear-felling followed by artificial regeneration silvicultural system in the hill forests. Thus the natural multistoried forests were under the process of conversion from natural forests to plantations with more valuable species, e.g. Teak.

Deforestation and degradation of forests is a severe problem in Bangladesh. Over a long period, much of the Forest Department managed state forests have been deforested and encroached by the organized land grabbers and landless poor people. Prevailing socio-political condition does not allow eviction of these encroachers. Therefore, to solve this problem, instead of evicting the encroachers, they are actively involved in tree planting activities with a first right use in the designated forest areas. Plantations in social forestry program are raised with the active participation of local poor people under a benefit –sharing agreement.

The marginal land, such as slopes of roads, embankments and railway lines has also been brought under participatory forestry for raising strip plantations. Participatory forestry started in Bangladesh in 1981 with the commencement of the "Development of Community Forestry Project". During the Sixth Five Year Plan period 2011-2015, there were a number of forestry initiatives to expand forest resources with peoples' participation and financial assistance from development partners and GoB resources. There were nearly 80,000 hectares of participatory plantations established in marginal lands and buffer zones by involving surrounding forest-dependent communities. There were also about 14,000 km of strip plantations established and 53 million seedlings distributed for planting in homesteads. The Social Forestry program experienced considerable momentum through these programs with 500,000 beneficiaries, of which 120,000 participants received more than Tk. 250 crore in benefits. There were also more than 40,468 ha of degraded forests that were restored with the active participation of local communities.

Teak (*Tectona grandis*) is the pioneer and dominant species in Forest Department plantations, but we don't have significant improve programs the species for maximizing productivity!

Akashmini (Acacia auriculiformis) in degraded sites may improve the sites! But should not be more than 2-3 rotations.

2.3.1 Coastal Plantations: The Forest Department started intensive mangrove plantations from 1965 with the objectives of protection of coastal life and property from tidal surges and cyclones, stabilization of the newly accreted coastal land, and meeting demands for fuel wood and industrial raw materials. The plantations established by the Forest Department are in the coastal districts of Patuakhali, Bhola, Noakhali, Chittagong and Cox's Bazar. Till 2015, more than 2 million ha (1,97,739 ha mangrove, 8,860 ha non-mangrove, 3,190 ha Nypa) mangrove, non-mangrove plantations have been raised in the coastal areas. Among the mangrove plantations, about 80% area of the early plantations consisted of Sonneratia apetala (keora), about 15% consisted of A.

officinalis (baen) and the remaining consists of E. agallocha (gewa), Bruguiera sexangula (kankra), Ceriops dacandra (goran), Heritiera fomes (sundri) etc. Most of the coastal plantations have been developed primarily with the objective of stabilizing the newly accreted lands. The land given to the forest department for a period of 20 years to establish plantations and after that has to be returned to the lands department. An area of 44,800 ha has been returned to the civil authorities in this process. These are also acting as ideal filter of coastal environment, disaster protector, habitat and breeding ground for fishes and shrimps, grazing land for cattle, water buffaloes, habitat for wildlife and venues for ecotourism. Some afforested coastal islands, e.g. Nijhum Dwip, Sonar Char and Char Kukrimukri are so dense and green that looks like natural forests. Establishment of successful plantations and creation of good habitat for wildlife, some coastal plantation sites, e.g. "Nijhum Dwip", Char Kukrimukri were declared as protected areas in recent years. So far, 1200 km2 of land accreted from Bay of Bengal has been added to mainland of the country through coastal afforestations (Anon 2015).

Coastal plantations of Baen in Gorakghata, Moheshkhali, Cox's Bazar protects the coastal life and resources. It also stabilizes the soil.

Jhau (*Casuarina equisetifolia*) is the most suitable species for sand beaches.

2.3.2 Homestead Plantation: Planting trees near and around homesteads is a traditional land use system in Bangladesh. The main objectives of the program are to preserve and develop environment and protect homesteads from cyclones and tidal bores by creating windbreaks around homesteads. Under this program, fruit and timber seedlings were distributed at a subsidized rate to the rural households. In addition to providing shelter for birds and environmental conservation, these are supplying families with food, necessary fuelwood, timber and financial benefits. In this way, the homesteads of the country are vital sources of livelihood for many farmers and serve as the safety net during the time of hardship and natural disasters.

2.3.3 Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project (CRPARP): The project is implemented in 51 Upa-zilas in 9 coastal districts. The objectives of the project is to reduce forest degradation and increase forest coverage through participatory planning, monitoring and to contribute in building the long-term resilience in the selected coastal and hilly areas (10 Forest Divisions). It established a total of 17,500 ha of land (both coastal and hill areas) and 2,000 km of roadside plantations (Table 4). Plantations established in the strip and coastal accreted charlands are promising and acts as catalyst of human induced succession. But the plantations (both buffer and core zone) in Chittagong and Cox's Bazar Forest Divisions raise the questions of justifying the plantations in degraded natural forest! A number of advanced regeneration were cut for the plantations that eroding the native forest genetic resources. If the plantation is not successful, the total area shall remain barren and open the avenue for encroachments. Assisted natural regeneration (ANR) must be given priority instead of plantations with other introduced species, particularly the exotics. Native tree species, e.g. Dipterocarpus turbinatus, D. alatus, D. costatus, Hopea odorata, Michelia champaca, Anisoptera scaphula, Pterygota alata, Swintonia floribundha, Syzygium firmum, Protium serratum, Toona ciliata, Artocarpus chama, Lagerstroemia speciosa, Chukrasia tabularis etc. should include in plantations of hill forest areas.

Table 4. Annual average area re/afforested by CRPARP in the project areas from 2013-14 to 2015-16

Plantation Type	Planting Achieved			
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Total
	ha/km	ha/km	ha/km	ha/km
Mangrove Afforestation	1,968.1 ha	3,000 ha	1,381.9 ha	6,350 ha
Mound Plantation	69 ha	47 ha	39 ha	155 ha
Jhau Plantation (*Casuarina*)	82 ha	106 ha	70 ha	258 ha
Golpata Plantation (Nipa)	127 km	508 km	308 km	943 km
Enrichment Plantation	0 ha	125 ha	135 ha	260 ha
Core Zone Plantation	0 ha	1,686 ha	1,088 ha	2,774 ha
Buffer Zone Plantation	2,623 ha	3,255 ha	1,547 ha	7,425 ha
Non mangrove (Buffer) Plantation	80 ha	98 ha	100 ha	278 ha
Strip Plantation	412 Km	458 km	187 km	1,057 km
Total	4,822	8,317 ha	4,361 ha	17,500 ha
	539 km	966 km	495 km	2,000 km

2.3.4 Strip Plantations: Planting of some tree species, e.g. Swietenia macrophylla, Eucalyptus camaldulensis, Melia azedarach, Acacia auriculiformis and A. mangium on the strips along roads, railway lines, and canals under the social forestry program is successful. According to the records of the BFD, approximately 62,329 km of strip plantations were established between 1980-81 to 2014-15, although FRA (2015) indicates their extent to be 73,000 km before 2005, equivalent to about 7,300 ha. Since then 23,512 km additional strip plantations have been established until 2014-15 making the total length close to one hundred thousand km.

2.3.5 Private forests in Chittagong Hill Tracts districts: Apart from the formally recorded or recognized categories of forests, the ethnic people of the Chittagong Hill Tracts (CHT) districts own significant patches of forest areas. There is no accurate survey of the areas of these forests, although the estimated area of private forests in CHT is approximately 273,791 ha, which is mostly composed of teak and gamar plantations. Permits for felling and transporting trees in these hill tracts are required and the annual volume for which transit permits are issued is approximately 100,000 m3. While most of these forests have already been converted into teak forests, the recent interest of the local indigenous people in horticulture suggests that the extent of these forests may be declining.

Large areas of CHT are devoid of productive forests! Careful decision needs whether plantations with demanding species or assisted natural regeneration with native species would be the best option?

A natural forest patch at Jiban Nagar, Bandarban with rich native forest tree species! These forests must NOT be the substitute of short rotation plantation forest!

3. Potential species for plantation programs

The plantations have some advantages over natural forest from management and economic point of views, such as more production and ability to choose species with desirable characteristics. Plantation programs are getting

priority in both public and private sectors of the country. But, the choice of species is still under debate, particularly regarding the plantations of some exotics like Eucalyptus, Acacia and Pinus species. Teak was the first species largely used in plantation forests followed by gamar, garjan in Chittagong and Chittagong Hill Tracts.

3.1 Species introduction and testing: Species elimination, provenance, growth and pilot plantation trials were established with a number of indigenous and fast growing exotic tree species in different silvicultural research stations of Bangladesh Forest Research Institute (BFRI) in an aim to select suitable species for plantation programs. In 1978 and onwards, extensive trials of Eucalyptus and Acacia species were done to find out the very fast growing species for some degraded sites. Eucalyptus camaldulensis, E. tereticornis and E. brassiana emerged as the promising species for planting in Bangladesh from the trials, but controversy remains about the species regarding some environmental issues (Hossain and Haque 2013). Among the Acacia species introduced so far in Bangladesh, Acacia mangium and A. auriculiformis have shown promising growth in poor afforestation sites, but A. mangium was discarded from large scale plantations because of its heart rot disease (Hossain 2015).

3.2 Increase plantation productivity: Productivity is the foundation of sustainable plantation forestry. Even when forest systems are designed to provide environmental services, the productivity and ecological processes including carbon sequestration, mineral cycling, hydrology and biodiversity are inseparably interconnected. However, the growing stock of Bangladesh forests is low (48 m3ha-1) in comparison to that of South and Southeast Asia (99 m3ha-1) and the world (131 m3 ha-1) average values (FRA 2010). In order to increase and sustain the productivity of forest plantations, quality seed sources and implementation of silvicultural treatments must need for large scale plantations (Hossain 2015). Intensive management practices can increase productivity of forest plantations and a specific plantation management technique is needed for the plantation programs of the country. The present productivity of some fast-growing species, e.g. Akashmoni (12 m3ha-1yr-1 at a rotation of 10 years), Eucalyptus (19 m3ha-1yr-1) is not constant for different sites of the country. An erratic and disappointing productivity of the species remain concern for large scale plantations.

3.3 From where should seed be collected for plantations? Tree seed, a key input that determines the success of any tree planting activity, is often in short supply in Bangladesh. As a result, foresters use whatever seed is available regardless of its quality. Seed quality (physical, physiological and genetic quality) has a direct impact on tree growth and the success of tree planting activities. Individual trees or stands from where seed is collected are called seed sources. Comparisons of the characteristics and seed quality of the four major types of recommended seed sources are shown in Table 5.

Table 5. Characteristics of different seed sources for a successful plantation program

Characters	Seed sources				
	Seed orchards	***Seed production areas***	***Seed stands***	***Seed trees***	***Unselected seed sources***
Planting purpose	Seed production	Not for seed production	Not for seed production	Not for seed production	Not for seed production
Seed origin	Identified	Identified or Unidentified	Unidentified	Unidentified	Unidentified
Quality of mother trees	Selected and tested trees	Selected stands, thinned, untested	Selected stands, un(thinned), untested	Selected trees from unselected stands	Unselected trees from unselected stands
Seed quality	**Very good**	Good	Fairly good	Intermediate	**Poor**
Level of management	Very intensive	Intensive	Intermediate	Some	None

In order to maintain genetic diversity, seed should be collected from a large number of trees- **at least 30 trees**. Unfortunately, in Bangladesh most of the seeds are collected from unselected seed sources which are responsi-

ble for the poor growth of the plantations. There is no seed certification and quality control process of the seed origin and consequently some plantations raised from unselected seed sources resulted with poor and disappointing productivity.

4. Sustainable Plantation Forests in Bangladesh

In Bangladesh, plantation program is increasing day by day and the exotic species are getting preferences over the indigenous ones in some degraded forest areas. With deforestation, many degraded sites are available for plantation in Bangladesh, though very little is known about how to manage such sites economically. Productive plantations on previously deforested or non-forested sites may offer important options for conservation of natural forests and arresting the further deforestation activities. Another option of mixed species plantations of both the indigenous and exotics may also be able to contribute as an effective mechanism for sustainable resource management. Pressures on remaining natural forests can be reduced through increasing productivity of plantation forests, but emphasis must focus on existing plantations, and new plantations on degraded or denuded land, agroforestry and community forestry programs rather than on the existing natural forests.

The wastelands and denuded hillocks adjacent to human habitation which are either covered with sungrass or overgrazed by leaving the sites with a thin vegetation cover and of very little water retention capacity may be reforested with pioneer colonizing tree species. Considering the demand of the people, artificial plantation programs may support but the major questions still concern is the correct choice of species for the site -whether mixed or in pure stands and the interactions of species and site, especially where exotic species are used.

4.1 Single species plantations: Mono-plantations (single species) have been a common form of large scale plantation development in Bangladesh. They can produce high levels of output on a sustainable basis provided they continue to receive intensive management inputs. To achieve these, carefully select the species with respect to suitability for the site, preferring native species wherever possible, and aim must be to produce a forest that can produce a versatile range of timber and other products. From planting to harvest, consistently regulate the spacing (stem density and pattern) of the plantation toward set goals. Need to evaluate the use of new information technologies and simulation models to increase management flexibility in high investment enterprises.

4.2 Multi-species mixed plantations: In addition to the single species plantations, multi-species mixed plantations must given priority. Before mixing consideration have to given for phenological (leaf-flush, leaf fall, fruiting), physio-ecological (water and nutrient consumption) and architectural (crown shape and size, root spread and depth) compatibility of tree species. Consider the possibility of creating a combination of a mixed and successional forest by establishing the following generation by under-planting the present crop with another suitable species or species mix, e.g. mixture of species in the main canopy, a mixed or single species understorey; single-species main canopy over single or multiple species understorey. Need to explore the possibility of enhancing growth and health by symbiotic interrelationships such as by introducing nitrogen-fixing or other effective nutrient-scavenging tree species in the stand (Dutta and Hossain 2017).

4.3 Silvi-horticulture-agriculture: Multi-species criteria and guidelines also apply to Silvi-horticulture-agriculture crop types and the agroforestry systems. These include fallow vegetation, horticulture crops, single tree growing on pasture, hedge-rows, border-line tree rows, village/para gardens, road-side trees, and so on. Recent development of fruit orchards in CHT by converting the forest/jhum lands needs rigorous assessment of the suitability and feasibility of the horticultural species.

4.4 Plantations Managed through Coppices: Plantations manage through coppice is the alternative of repeated plantations with some coppicing ability species, e.g. sal, ipil-ipil, gamar, sil koroi etc. Plantations manage through coppice shoots can reduce the costs and increase the productivity with a reduced rotation period.

4.5 Available land for future plantations: Bangladesh has an immense scope of popularizing social forestry programs in different land components. In total about 4.65 million ha of land is available for some sorts of social forestry programs, which may be about 31% of the country's total land surface (Ali and Morshed 2011). Considering the size of Bangladesh and her forest area, the potential land available for social forestry production systems is quite significant. But, the expansion of forest plantations throughout CHT is often in conflict with the local community and tribal peoples, as well as the Bengali settlers. Social, political, tenurial and institutional constraints need to be removed for the development of both the barren forest and USF lands for plantations as soon as possible. If all the available land is brought under social forestry production systems then 465,000 ha of land would be available for planting annually under the social forestry production system of 10 years rotation. The area will produce 46.5 million m3 of timber and firewood annually (at the moderate rate of 10 m3 ha-1 yr-1 production). Moreover, the system will provide food, income and employment opportunities for the farmers and participants of the programs through the alleviation of poverty.

4.6 Plantation forestry whether sustainable or not in Bangladesh? It is widely accepted that forest resources should be managed to meet the economic, ecological and cultural needs of present and future generations. Therefore, plantation forest management must respond to environmental, social and economic issues. These forests can provide important economic and ecological value and can relieve the threat to the remaining natural forests. However, if not managed responsibly, they can incur significant environmental and social costs. Although plantation yields are often much higher than those of natural forests, concerns remain that successive rotations may show a decline in productivity. Plantation forests in hill, sal and strips are dominated by few species, e.g. Acacia auriculiformis, Tectona grandis, Eucalyptus camaldulensis which narrowed down the genetic base of the forests. Multispecies plantations with different rotations may not leave the site barren and improve the site and ecological conditions. A judicious mixture of native tree species (at least 10-20%) must be incorporated even in the social forestry plantations. Mono-plantations of some exotics may provide some short term produces to us, but long run that may become a disastrous to the plantation forestry program of the country.

5. Conclusion

In Bangladesh, tree plantation has now become a social movement and the Government of Bangladesh started the tree planting movement with an aim to accelerate tree plantation activities throughout the country (Hossain 2016). The aim of the program is to create awareness about environment and nature conservation, to highlight the role of trees in environmental preservation and also to disseminate information on the importance of tree resources. However, there is an increasing concern among foresters, ecologists, botanists, conservationists and policy makers about the threat of uncontrolled introduction of exotic tree species in the plantation programs of the country. Invasion of exotics may cause major loss of biodiversity and species extinction either due to direct replacement or indirect effects on the ecosystem. There are also risks of the decline of growth and yield in second and successive rotations, or the infestation of pests and diseases, e.g. Psyllid in Leucaena leucocephalla, shoot borer in Swietenia and leaf defoliator in Tectona grandis.

The natural forests of Bangladesh are under severe pressure for meeting her growing demands for timber, fuel, fodder and non-timber forest products from an ever increasing human population. The annual estimated demand of round logs in the country is 15.3 million m3 and supply is 8.3 million m3 (Ahmed and Akhtaruzzaman 2011). There is a gap of 7.0 million m3 between demand and supply and the gap is increasing with time. Though the homestead and social forestry programs provide some local needs of timber, pole, post and firewood, but long run demand must address the native tree species along with the restoration of the degraded natural forests. Successful sustainable forest plantations require species well matched with sites, improvement of genetic stock, control of weeds and climbers, and silvicultural treatments, e.g. pruning, thinning etc. that enhance tree quality and stand growth. In such way, future demand for wood can increasingly be met from forest plantations and also helping to alleviate pressure on remaining natural forests. If we are not able to address the objectives of plantation forests judiciously, sustainable forestry plantations may remain a myth in Bangladesh rather than the realities!

References

Ahmed, F.U. and Akhtaruzzaman, A.F.M. 2010. Agricultural Research Priority: Vision 2030 and beyond sub-sector: Forestry. Bangladesh Forest Research Institute and Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), Farmgate, Dhaka, Bangladesh.

Ali, M.Y. and Morshed, H.M. 2011. Towards a new forest policy in Bangladesh. In: Proceedings First Bangladesh Forestry Congress 2011, pp. 360-378.

Altrell, D., Saket, M., Lyckeback, L., Piazza, M., Ahmad, I.U., Banik, H,, Hossain, M.A.A. and Chowdhury, R.M.2007. National Forest and Tree Resources Assessment 2007. Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment and Forest; Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization, Ministry of Defence, Food and Agriculture Organization of the United Nations. pp. 192.

Anonymous. 2015. Forest Department Information Booklet. 26 pp.

Carle, J. and Holmgren, P. 2008. Wood from planted forests: a global outlook 2005-2030. Forest Products Journal, 58(12):6-18.

Dutta, S. and Hossain, M.K. 2017. Effects of mixed plantation on growth and biomass yield of two common plantation trees of Bangladesh. Journal of Forest and Environmental Science, 33(1): 22-32.

Evans, J. 1992. Plantation Forestry in Tropics, 2nd ed., Clarendon press, Oxford. 403pp.

FAO. 2015. Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report – Bangladesh. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.

Harwood, C.E. and Nambiar, E.K.S. 2014. Sustainable plantation forestry in South- East Asia. ACIAR Technical Reports No. 84. Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra. 100 pp.

Hossain, M.K. 2015. Silviculture of Plantation Trees of Bangladesh, Arannayk Foundation. Dhaka, Bangladesh. pp. 361. ISBN: 978-984-33-9767-6.

Hossain, M.K. 2016. Plantation Forestry: Paradigm to meet the demand of the forestry resources in Bangladesh. In: T.K. Nath and Patrick O'Reily (eds.), Monoculture Farming- Global Practices, Ecological Impact and Benefits/Drawbacks, Nova publishers, New York, pp. 57-74.

Hossain, M.K. and Hoque, A.T.M.R. 2013. Eucalyptus Dilemma in Bangladesh. Institute of Forestry and Environmental Sciences, University of Chittagong. ISBN: 978-984-33-8056-2, 148 p.

Hughes, C.E. 1994. Risks of species introductions in tropical forestry. Comm. For. Rev., 73(4):243-252.

Kanowski, P.J. and Savill, P.S. 1992. Forest plantations: towards sustainable practice. Chapter 6, In: C. Sargent and S. Bass (eds.), Plantation Politics: Forest Plantations in Development. Earthscan, London. pp.121-151.

Khan, N.A., Choudhury, J.K., Huda, K.S. and Mondal, M.I. 2004. An overview of Social Forestry in Bangladesh. Forestry Sector Project, Bangladesh Forest Department, pp. 198.

Kroger, M. 2012. Global tree plantation expansion: a review. ICAS Review Paper Series No. 3.

বৃক্ষরোপণঃ ভাবনায় বাংলার বুনো ফল

ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এর কারণে এখানকার উদ্ভিদ জগতেও নানা ধরনের বৈচিত্র্য দেখা যায়। এক সময় সত্তর দশকের শেষের দিকে প্রয়াত প্রফেসর ড. মো: সালার খান অনুমান করেছিলেন বাংলাদেশে ৫,০০০ প্রজাতির পুষ্পক উদ্ভিদ থাকতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ফ্লোরা প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,৬১১টি পুষ্পক উদ্ভিদের তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো বুনো ফল থাকতে পারে যেগুলো ভক্ষণযোগ্য হতে পারে। বুনো ফল বলতে বুঝি যে সকল ফল উৎপন্ন হওয়ার জন্য কোন ধরনের যত্ন প্রয়োজন হয় না এবং এরা বন্য অবস্থায় জন্মে থাকে। তথ্য অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১৫০ প্রজাতির বুনো ফল খাওয়ার যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলের নাম এখানে আমরা উল্লেখ করছি যেমন- বুনো আম, বুনো কলা, দেশী গাব, ডেফল, পানিয়ালা, লটকন, লতা আম, চালতা, কাউ ফল, জাম, আমলকি, হরিতকি, বহেরা, আমড়া, জলপাই, কেওড়া, চাপালিশ, উদাল, বাসকেট বাদাম, মাইলাম, সইল্লা, গোলফল, কাজুবাদাম, বেল, বৈচি, জগডুমুর, বন কাকরোল, বন বরই, বেতফল, গিলাফল, শাপলা, মাখনা, পানি কলা, সিংগারা, চুক্কাফল, তেঁতুল, ডেওয়া, ভেলা, পিছলাফল ইত্যাদি। উপরোক্ত বুনো ফলগুলোর স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ এবং আকার-আকৃতিতে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এরা বাংলার বুনো ফল। প্রকৃতিতে এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বুনো ফলগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে জন্মে থাকে। তবে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে যেমন- চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট জেলার বনাঞ্চল সমূহে। উক্ত বনাঞ্চলের প্রধান বুনো ফলগুলো হচ্ছে লটকন, ডেফল, ডেওয়া, লতা আম, চালতা, হরিতকি, বহেরা, আমলকি, জলপাই, আমড়া, তেঁতুল, বিভিন্ন প্রকারের কালজাম, চাপালিশ, কাউফল, পানিয়ালা, আচারগুলা, ছাগলনাদি, উদাল ইত্যাদি। পত্রঝরা বনাঞ্চল যেমন- ভাওয়াল, মধুপুর, গজনী সহ উত্তর বঙ্গের ছড়িয়ে থাকা জঙ্গল সমূহে কিছু কিছু বুনো ফল জন্মে থাকে যেমন- আমলকি, হরিতকি, বহেরা, বন বরই, মনকাঁটা, পানিয়ালা, ভুতিজাম, কালজাম ইত্যাদি। সুন্দরবনও কয়েকটি বুনো ফলের বাসস্থান যেমন- কেওড়া, সইল্লা এবং গোলফল। তবে আমাদের দেশের জলাশয়ে কিছু বুনো ফল জন্মে থাকে যেমন- পানিকলা, মাখনা, সিংরা, পদ্ম ও শাপলা। এছাড়া মানুষের বাড়ি-ঘরের আঙ্গিনা ও পতিত জমিতে কিছু বুনো ফল পাওয়া যায় যেমন বেল, বৈচি, কদবেল, ডেওয়া, ছাগলনাদি, লটকন, দেশী গাব, আমড়া, জলপাই, তেঁতুল, বরই, খেজুর, তাল, বিচি কলা ইত্যাদি।

বুনো ফলের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত গুরুত্ব অনেক বেশী। অনেক ধরনের বন্য প্রাণী ও পাখির প্রধান খাদ্য হচ্ছে বুনো ফল। এই সকল প্রাণীরা ফল খেয়ে বীজ বিস্তারে সহায়তা করে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান দরকার হয়। এই ক্ষেত্রে বুনো ফল গুলো পুষ্টি ও ভিটামিন যোগাতে বিশাল ভূমিকা পালন করে যেমন- ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, ফাইবার ইত্যাদি। এদের অভাবে মানব দেহে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।অনেক বুনো ফল মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় বুনো ফল ভূমিকা পালন করে যেমন- ত্রিফলা-হরিতকি, আমলকি, বহেরা। কিছু মানুষ তাদের জীবিকার অংশ হিসেবে বুনো ফল সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে নগদ অর্থ উপার্জন করে। বিভিন্ন মৌসুমে পাওয়া বুনো ফলগুলো ঐ মৌসুমে সৃষ্ট মানুষের অনেক রোগ-জীবাণুর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তায় ও বুনোফল গুলো ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন খাদ্য বিজ্ঞানীরা।

Photo by Dr. Mohammad Zashim Uddin

অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে বুনো ফলগুলো প্রকৃতিতে ভাল অবস্থায় নেই। মানুষের নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে এদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। পূর্বে বন ব্যবস্থা ছিল টিম্বার নির্ভর। তার অর্থ হচ্ছে যে সকল উদ্ভিদ ভাল কাঠ দিবে সেইগুলো বন বিভাগ ম্যানেজ করত। অন্য বৃক্ষগুলো বাজে বৃক্ষ বলে উ-ক্লাস বৃক্ষ হিসেবে কোন ধরনের পরিচর্যা পায়নি। এছাড়াও বাংলাদেশ বনজশিল্প কর্পোরেশন (BFIDC) নামক একটি প্রতিষ্ঠান বনবিভাগের জায়গা ব্যবহার করে বনজ শিল্প কারখানার জন্য উপযুক্ত টিম্বার চাষ করত। ফলে উক্ত বনাঞ্চলে বুনো ফল প্রজাতিগুলো গুরুত্ব পায়নি। এভাবে পর্যায়ক্রমে অনেক বুনো ফল প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা কমে গেছে। বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল টিম্বার প্রজাতি রোপনের কারণে অনেক দেশী বুনো ফল কমে যাচ্ছে। বুনো ফল সংগ্রহে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকাতে এর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিদেশী ফল দিয়ে বাজার দখল হওয়াতে বুনো ফলের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। বুনো ফল ব্যবহারে লোকাল জ্ঞান হারিয়ে যাওয়াতে এর পরিমাণও কমে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবও বুনো ফলের প্রজাতির সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। অধিক জনসংখ্যা এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব বুনো ফল কমাতে সাহায্য করছে। সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির কারণে জলজ বুনো ফলগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

বুনো ফল প্রজাতি ও তাদের পপুলেশন রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল নেয়া যেতে পারে। নিম্নে কয়েকটি কৌশল উপস্থাপন করা হলো-

(১) প্রথমে আমাদের দেশে কি পরিমাণ বুনো ফলের প্রজাতি আছে তা সনাক্ত করে একটি তালিকা তৈরী করতে হবে।

(২) উক্ত সকল প্রজাতির অধীনে তাদের পপুলেশন সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

(৩) GIS ডাটার উপর ভিত্তি করে এদের ডিস্ট্রিবিউশন মানচিত্র তৈরী করতে হবে।

(৪) এর মধ্যে যে সকল প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা কম তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) প্রয়োজনে অগ্রাধিকার (ঢ়ৎরড়ৎরঃু) প্রজাতি নির্ণয় করে সংখ্যা বাড়াতে হবে।

(৬) মূল বাসস্থানে কোন প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বাসস্থানের বাইরে এনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৭) সরকারের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে বুনো ফলও থাকতে পারে।

(৮) প্রয়োজনে প্রত্যেক জেলায় নার্সারী ও হর্টিকালচারাল গার্ডেন তৈরী করা যেতে পারে।

(৯) বুনো ফল সংরক্ষণে সকল প্রকার মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(১০) ফ্রাইডে বা স্যাটারডে স্কুলিং এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বুনো ফলের গুরুত্ব শেখানো যেতে পারে।

(১১) এ জন্য প্রথমে শহরের পার্ক গুলোতে বুনো ফল এর একটি কর্ণার থাকতে পারে এবং পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ ধরনের কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে|

সাঙ্গু নদীর উজানে

অধ্যাপক মনিরুল এইচ খান

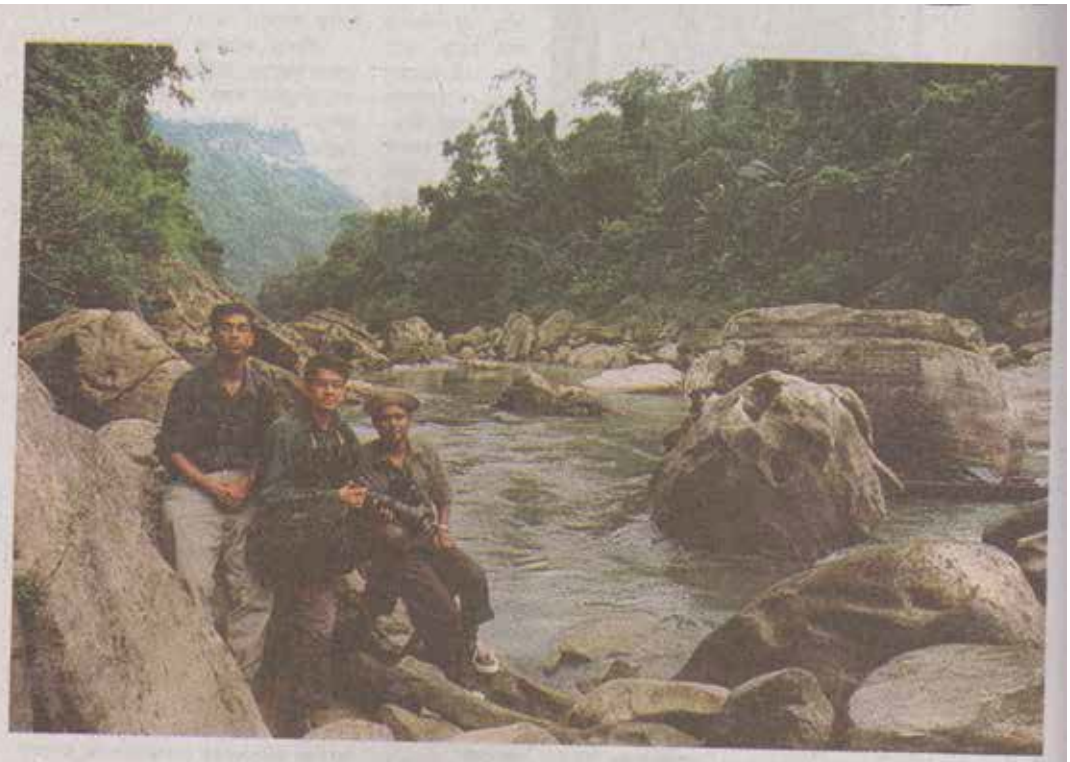

সাঙ্গু নদীর উজানে

মনিরুল খান

১৯৫৭ সালের কথা। চট্টগ্রামের এক কাঠ ব্যবসায়ী এবং শৌখিন শিকারি সাঙ্গু নদী ধরে উজানে গিয়েছিলেন বান্দরবানের খুবই দুর্গম মদক (মধু) এলাকায়। আমার জানা মতে, তার আগে সমতলের অধিবাসী কেউ এ জায়গায় যাননি। উজানের পুরো এলাকা সাঙ্গু মাতামুহুরী রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তর্ভুক্ত। যিনি ওখানে গিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ এলাকায় গাছের মজুদ কেমন আছে এবং কীভাবে সেগুলো আহরণ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে আর সেই সঙ্গে কিছু পশুপাখি শিকার করতে। চট্টগ্রামের এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আজ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। তার নাম এনায়েত মাওলা। তার লেখা 'যখন শিকারি ছিলাম' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে দশ-বারোদিন চলার পর তিনি ও তার দল পৌঁছান মদক এলাকায়। চলার পথে অনেক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি।

এনায়েত মাওলা যে সময় মদক গিয়েছিলেন সে সময় বান্দরবান পর্যন্ত যাওয়ার কোনও সড়কপথ ছিল না। বান্দরবানে অল্প কিছু বাঙালি বসতি থাকলেও বান্দরবান ছাড়ার পরে আর কোনও বাঙালি বসতি ছিল না। ঐ পথে সর্বশেষ ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) ক্যাম্প ছিল থানচিতে (ধানচি)। থানচি পেরুনোর পর আদিবাসী গ্রামগুলোও হাতেগোনা কয়েকটা। রোমাঞ্চকর এই অভিযানে তিনি শিকার করেছেন বুনোহাতি ও সাম্বার হরিণসহ আরও অনেক পশুপাখি। মদক পৌঁছানোর আগে (সম্ভবত বর্তমানে 'আদা কারবারীপাড়া' এলাকায়) এই অভিযাত্রী দল নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর তাকিয়ে হতবাক হয়ে যায়। স্থানীয় ম্রো (মুরং) আদিবাসীর খুব ছোট একটা গ্রাম। তবে সবার ঘর গাছের উপর। ছেলে বুড়ো সবাই রাতে থাকে গাছের ওপর তৈরি করা ঘরগুলোতে। পরে তারা জানতে পারেন একটা পাগলা হাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এরা গাছে বসবাস শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। গ্রামবাসীর অনুরোধে এনায়েত মাওলা ওই পাগলা হাতিটি শিকার করেছিলেন। আর হাতি শিকার করতে গিয়ে বাস আর গয়ালের (বুনো গরু) পায়ের ছাপ দেখেছেন। উল্লেখ্য, বাঘ আর গয়াল আজকাল আর ওই এলাকায় দেখা যায় না।

প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার ।

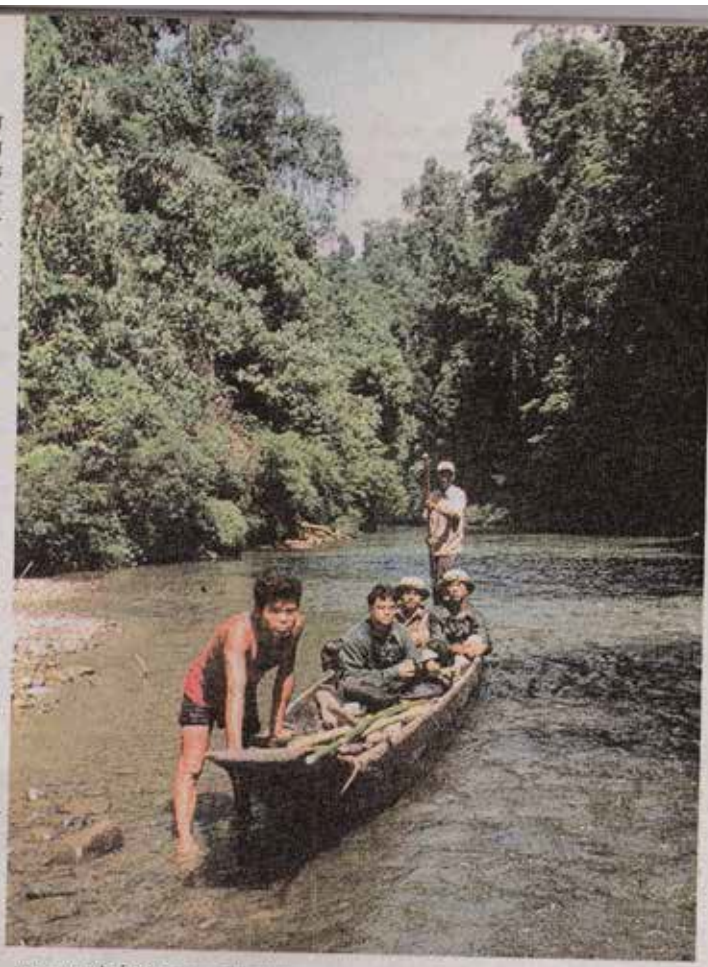

এনায়েত মাওলার রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী শুনে মনস্থির করলাম সাঙ্গু নদীর উজানে যাব। আজকাল আর দোহাজারী থেকে নৌকায় রওনা হতে হয় না। সুদূর থানচি পর্যন্ত যাওয়া যায় পাহাড়ি সড়ক পথে। এরপর নদীতে পানি থাকলে পাহাড়ি নদীতে চলার উপযুক্ত সরু ও লম্বা বিশেষ এক প্রকার ডিঙ্গি নৌকায় (অনেক ক্ষেত্রেই এসব নৌকা একটি গাছ খুঁড়ে তৈরি হয় তাই কোনও জোড়া থাকে না) মদক ছাড়িয়ে আরও উজানে সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থলে চলে যাওয়া যায়। তবে প্রধান সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। এলাকাটি মিয়ানমার (বার্মা) সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় এখানে ঘাঁটি গেড়েছে মিয়ানমারের কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল। তাই যৌক্তিক কারণেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওই এলাকা ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে।

২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে আমি আর আমার দুই ছাত্র জাহাঙ্গীর আলম ও স্যামিউল মোহসেনিন রওনা হলাম এনায়েত মাওলার পথ ধরে, তবে আটচল্লিশ বছর পরে। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমরা যাচ্ছি ওই এলাকার বন্যপ্রাণী আর তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের অবস্থা জানতে। তাই অস্ত্রের বদলে আমাদের সঙ্গে আছে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা। সেই সঙ্গে রাতে ঘুমোনোর ব্যবস্থা, শুকনো খাবার, ওষুধ ও অন্য টুকিটাকি জিনিসপত্র তো আছেই। পথে বান্দরবান শহর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো গাইড মংখিয়া মারমা।

বান্দরবান থেকে চান্দের গাড়িতে (পুরনো জিপ) চেপে দীর্ঘ পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাম থানচি। এনায়েত মাওলা যেখানে মাত্র তিন-চারটি দোকান আর বাঁশের বেড়ার তৈরি ইপিআর ক্যাম্প দেখেছিলেন সেখানে এখন বিশাল এক বাজার। নদীর ওপারে বিশাল বিডিআর ক্যাম্প। উপজেলা সদর হওয়ার সুবাদে ছোটখাটো কিছু সরকারি অফিস-আদালতও আছে।

থানচিতে কোনওমতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন কাকডাকা ভোরে আমরা রওনা হয়ে গেলাম একটা সরু নৌকা নিয়ে। থানচির পরে আর কোনও বাঙালি গ্রাম নেই তবে তিন্দু, রেম্যাক্রি ও বড় মদকে বিডিআর ক্যাম্প আছে। কিছুদূর যেতেই টের পেলাম আমাদের নৌকা ভ্রমণ মোটেও সমতল এলাকার নৌকা ভ্রমণের মতো নয়। উজানে গিয়ে নদী সরু ও খরস্রোতা হয়ে গেছে। কয়েকটা জায়গায় বিশাল বিশাল পাথর পড়ে আছে নদীর ওপর। তাই বারবার আমাদের নৌকা থেকে নেমে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। যে সব জায়গায় স্রোত খুব বেশি সেখানে সবাই নৌকা থেকে নামার পর মাঝি দুজন মোটা দড়ি দিয়ে নৌকা টেনে আনছিল।

তিন্দু পাড়ি দিতে দিতে বিকেল হয়ে এল। তিন্দু ছাড়ার আধঘণ্টা পর চোখে ধরা দিলো এক অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য। এমন দৃশ্য বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমাদের বাঁ পাশে নদীর পূর্ব পাড় বরাবর ঠিক দেয়ালের মতো খাড়া উঠে গেছে অনেক উঁচু পাথুরে এক পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর সবুজ বনানী। খাড়া পাহাড়ের মাঝেও সুবিধামতো জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ঝোপ-জঙ্গল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এই খাড়া পাহাড়ে বনছাগল পাওয়া যায়। তা পাওয়া যাওয়ারই কথা। এমন খাড়া পাহাড় বনছাগলের আদর্শ জায়গা। এছাড়া নিচের দিককার বনে আছে উল্লুক। এরা মানুষের নিকটজাতি। তাই মানুষের মতোই এদের কোনও লেজ নেই। তবে বৃক্ষচারী বলে এদের হাত অনেক লম্বা। হাত দিয়ে ঝুলে ঝুলে এরা এ ডাল থেকে সে ডালে ঘুরে ঘুরে ফল ও কাচি পাতা খেয়ে বেড়ায়। বানর, মায়া হরিণ আর শূকর তো আছেই। দূর থেকে বেশ কয়েকটা মায়া হরিণের কর্কশ ডাক ভেসে আসছিল।

পাথুরে পাহাড় পাড়ি হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম রেম্যাক্রি নামের আদিবাসী গ্রামে। রাতের বেলা গ্রামপ্রধান আমাদের আপ্যায়নের জন্য বন থেকে ফাঁদ দিয়ে ধরা একটা মথুরা (মোরগ জাতীয় পাখি) নিয়ে এলেন। তবে আমরা গ্রামপ্রধানকে বিনয়ের সঙ্গে জানালাম আমরা বনের পাখি বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তাই সকালবেলা পাখিটা ছেড়ে দিলেই খুশি হব।

পরদিন খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম বড় মদকের উদ্দেশে। পথে পড়ল আদা কারবারীপাড়া ও ছোট মদকসহ আরও কয়েকটা ছোট গ্রাম। এনায়েত মাওলার কাহিনী থেকে আমার ধারণা তিনি যেখানে ম্রোদের গাছের ওপর ঘর দেখেছিলেন সেটি বর্তমানের আদা কারবারীপাড়া। এটি একটি ছোট ও সুন্দর ম্রো পাড়া। পাহাড়ের ঢালের মধ্যে বাঁশের তৈরি সুন্দর সুন্দর ঘর। কিছু কমলার গাছ আছে এদিক- সেদিক। এই গ্রামের আশপাশের পাহাড়ি জমিতে প্রচুর আদা চাষ হয়, তাই গ্রামপ্রধান বা কারবারীর খেতাব হয়েছে 'আদা কারবারী' আর গ্রামের নাম 'আদা কারবারীপাড়া।' গ্রামপ্রধান লম্বা ও ছিপছিপে গড়নের মাঝবয়সী মানুষ। তার দুই স্ত্রী, একজন ম্রো আরেকজন মারমা সম্প্রদায়ের। আমাদের গাইডকে দোভাষী হিসাবে ব্যবহার করে গ্রামপ্রধানের কাছ থেকে জানতে পারলাম গ্রামটি বেশ পুরনো হলেও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে রীতি অনুযায়ী বেশ কয়েকবার গ্রামের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। গাছের ওপর ঘর তৈরির কোনও স্মৃতি তার মনে পড়ে না।

বড় মদক পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এনায়েত মাওলার সময়ে সীমান্তরক্ষীদের

সর্বশেষ ক্যাম্প ছিল থানচিতে, আর এখন সর্বশেষ ক্যাম্প বড় মদকে। আর গ্রামটি এখন আর মোটেও ছোট নেই। বড় মদক পর্যন্ত এসে অনেকটা হতাশ হলাম, কারণ এনায়েত মাওলার কাহিনী শুনে মনের পর্দায় এই এলাকার যে ছবি এঁকেছিলাম সেটি ছিল গহিন অরণ্যঘেরা পাহাড়শ্রেণী। কিন্তু বাস্তবে তেমন গহিন অরণ্য পথে কোথাও পড়েনি। অবশ্য ছিটেফোঁটা যা আছে তার মধ্যেও টিকে আছে অনেক বন্য পশুপাখি। তবে হতাশার সঙ্গে কিছুটা আশার সঞ্চার হলো এই জেনে যে, বড় মদক থেকে সাঙ্গু নদীর উজানে আরও দুই-আড়াই দিন গেলে পড়বে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী লিক্রি পাহাড়। পুরো লিক্রি পাহাড় গভীর অরণ্যে আবৃত। অনেক বন্যপ্রাণীও আছে সেখানে। ওখানেই পাহাড়ি সাঙ্গু নদীর উৎপত্তি। পাহাড়ের অপর (পশ্চিম) ঢালে অপর পাহাড়ি নদী মাতামুহুরীর উৎপত্তি। যেহেতু বড় মদকেই শেষ বিডিআর ক্যাম্প, লিক্রি যেতে হলে বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়ে যেতে হবে। গভীর অরণ্য থাকার নিশ্চিত খবর জেনে তা না দেখে ফিরে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম, এগিয়ে যাব। শুধু তাই নয়, লিক্রি গিয়ে পাহাড় পাড়ি দিয়ে পশ্চিম ঢালে মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তিস্থলে গিয়ে পৌঁছাব। এরপর মাতামুহুরী নদী ধরে ভাটির দিকে আলীকদম গিয়ে পৌঁছাব, আর আলীকদম থেকে সড়ক পথে ফিরে যাব ঢাকায়। তবে পরিকল্পনা যত সহজে করলাম কাজটা যে মোটেও তত সহজ হবে না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ লিক্রি বাংলাদেশের দুর্গমতম এলাকাই শুধু নয়, এটি দেশের সবচেয়ে অজানা এলাকাও। বান্দরবান শহর থেকে যেখানে যেতে ছয় দিন সময় লাগে সে জায়গা সম্বন্ধে কেউ তেমন কিছু জানবে না এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া লিক্রি পাহাড় পাড়ি দিতে হবে গহিন বনের ভেতর দিয়ে। ওখানে জনমানব নেই বললেই চলে, তাই রাস্তাঘাটের বালাই নেই।

বড় মদকে অনেক খোঁজখবর করে উপযুক্ত একজন গাইড পেলাম। জন্মগতভাবে তিনি মিয়ানমারের নাগরিক, তবে বিয়ে করেছেন বড় মদকে। মিয়ানমারে হরহামেশা যাতায়াত আছে তার। আর বাংলাদেশের সীমানায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা মিয়ানমারের সশস্ত্র দলগুলোর সঙ্গেও তার কিছুটা জানাশোনা আছে। ভৌগোলিক, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় সামঞ্জস্যতার কারণে এই এলাকার মানুষের যোগাযোগ বাংলাদেশের চেয়ে বরং মিয়ানমারের সঙ্গেই বেশি। এরা কেউ এক বর্ণ বাংলা বোঝে না। রেডিওতে এরা মিয়ানমারের অনুষ্ঠান শোনে।

বড় মদক থেকে কিছু রসদ নিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা রওনা হলাম। দুপুর নাগাদ মুরাওয়া (বাঙালিদের দেওয়া নাম আন্ধারমানিক) নামক একটা জায়গায় পৌঁছে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মনে হলো ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। নদীর দুই ধারের পাহাড় জুড়ে চমৎকার চিরসবুজ বন। উঁচু উঁচু ট্রি-ফার্ন ও লাগানো বাঁশসহ আরও অনেক জানা-অজানা উদ্ভিদের সমাহার আদিম যুগের হারানো অরণ্যের কথা মনে করিয়ে দিল। এক জায়গায় নদীর ধারে দেখি ঝোপের মধ্যে পেঁচিয়ে আছে সবুজ রঙের এক বিষধর সাপ (হোয়াইট লিপড পিট ভাইপার)। এর থেকে কিছু এগিয়ে যেতেই নৌকার ওপর তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম। গাছের ডালে পেঁচিয়ে আছে দুর্লভ গোলবাহার অজগর (রেটিকুলেটেড পাইথন)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দুই প্রজাতির অজগর পাওয়া যায়। এর মধ্যে বেশি দুর্লভ হচ্ছে এই গোলবাহার অজগর। অজগরের পেটটা ফুলে আছে। হয়তো কিছুক্ষণ আগেই সে শিকার ধরে খেয়েছে।

অজগর ছাড়িয়ে কিছু সামনেই নেরেশা ঝিরি। এখানে দুই পাহাড়ের মাঝ বরাবর বিশাল এক ফাটলের মতো জায়গা। দিনের বেলা বাদুড়ের চমৎকার আশ্রয়স্থল এটি। ফাটলের নিচের দিকে গভীর পানি। কৌতূহলবশত অনেক কষ্টে নৌকা নিয়ে ফাটলের ভেতর কিছুদূর ঢুকলাম। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গা। এক কথায় ভূতুড়ে পরিবেশ। আমাদের শব্দ পেয়ে কয়েকটা বাদুড় উড়ে গেল। ভেতর থেকে পানি পড়ার শব্দ আসছে। শব্দ অনুসরণ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ঝরনা। ঝরনা দেখে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে একটা দৃশ্য দেখে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দুজন আদিবাসী লোক নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে ধরা গোলবাহার অজগরটি মস্তকবিহীন অবস্থায় তখনও নড়াচড়া করছে। গাইডের মাধ্যমে জানতে পারলাম ওরা বাড়ি নিয়ে সাপটা মজা করে খাবে। এভাবেই দুর্লভ এক সাপের জীবনাবসান হলো।

নেরেশা ঝিরির মুখে নদীর ধারে একটা পাথুরে জায়গা দেখে আমরা দুপুরের খাবার খেতে বসলাম। স্থানীয় গাইডকে বলা ছিল ভোরবেলা রওনা হওয়ার আগে কিছু খাবার রান্না করে সঙ্গে আনতে যাতে দুপুরে সবাই খেতে পারি। গাইড তার ঝোলা থেকে কলার পাতায় মোড়ানো কয়েকটা পুঁটলি বের করল। পুঁটলি খোলার পরে খাবারের মেন্যু দেখে তো আমরা হতবাক! দীর্ঘদিন বন পাহাড়ে ঘোরাঘুরির সুবাদে ব্যাঙ, শামুক, কাঁকড়া, বাঁশ ও বনের লতাগুল্মসহ অনেক অদ্ভুত খাবার খেয়েছি, তবে আজকের খাবার তার চেয়েও অদ্ভুত। এক পুঁটলি থেকে বের হলো ভাত আর সেদ্ধ কিছু কুমড়ার পাতা, আর অপর পুঁটলি থেকে বড় বড় উড়চুঙ্গা পোকার (মোল ক্রিকেট) ভাজি। পাহাড়ে আমিষের চাহিদা মেটাতে হলে পাহাড়িদের মতোই চলতে হবে। তাই আমরা সাহস করে পোকা আর সেদ্ধ পাতা দিয়ে ভাত খেতে শুরু করলাম। খেয়ে দেখলাম পোকা ভাজি মন্দ নয়– মচমচে, অনেকটা ছোট চিংড়ির মতো।

বন এলাকা ছাড়ার পর আবার আগের মতোই ঝোপঝাড়ে আচ্ছাদিত পাহাড়। এখানে আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই দুর্লভ এক পাখি (সিলভার ব্যাক্ড নিডলটেইল) উড়তে দেখলাম। পথে যেসব জায়গায় মিয়ানমারের সশস্ত্র গ্রুপের আস্তানা আছে তার আগেই আমাদের স্থানীয় গাইড (যাকে বড় মদক থেকে নেওয়া হয়েছে; নাম গোপন রাখা হচ্ছে) আমাদের রেখে এগিয়ে যায় আগাম যোগাযোগ করতে। আমরা ক্লিয়ারেন্স পেয়ে তাকে অনুসরণ করি। এভাবে চলতে চলতে শেষ বিকেলে মুরংগং নামের ছোট্ট একটা গ্রামে পৌঁছাই। নামেই শুধু গ্রাম– মাত্র পাঁচ-ছয়টা ঘর। প্রতি ঘরেই এক-দুজন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে। আমাদের সঙ্গে আনা ম্যালেরিয়ার ওষুধ প্রায় পুরোটাই এ গ্রামে বিতরণ করা হলো।

পরদিন খুব ভোরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। এবার গন্তব্য লিক্রি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চন্দইপাড়া। সাঙ্গু নদীর উজানে এটিই বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্রাম। পরবর্তী গ্রাম

মিয়ানমারের সীমানায়। আমরা যতই উজানে এগুচ্ছি নদী ততই সরু হয়ে শেষ পর্যন্ত নালার মতো হয়ে গেছে। শাখা-প্রশাখাও বিস্তার করেছে। এ নদীর একক কোনও উৎস নেই। মূলত লিক্রি পাহাড়ের পানি স্থানে স্থানে ঝরনাধারায় নেমে এসে নদী সৃষ্টি করেছে। এমনই অনেক ঝরনাধারার রিমঝিম শব্দ শুনতে শুনতে বিকেল নাগাদ চন্দ্রইপাড়া পৌঁছে গেলাম। ঠিক যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো চমৎকার একটা গ্রাম। গ্রামে অল্প কিছু মানুষের বসতি। এরা ম্রো নৃগোষ্ঠীর মানুষ। পুরুষ-মহিলা উভয়ই সাজতে খুব পছন্দ করে। মহিলারা অলঙ্কার এবং সেই সঙ্গে ফুল দিয়ে সেজে থাকে। পুরুষরাও কম যায় না। তারা কানে, মাথায় ফুল গুঁজে রাখে। উভয়ই কায়দা করে একটা চিরুনি গুঁজে রাখে চুলের মধ্যে। এছাড়া পুরুষরা সাদা পাগড়ি খুব পছন্দ করে।

গ্রামপ্রধানের ঘরে রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরদিন দীর্ঘ এগারো ঘণ্টা পাহাড়ি পথে হেঁটে লিক্রি পাহাড় পাড়ি দিতে হবে। আগেভাগে শুয়ে পড়লেও ঘুম আসছে না। পাহাড়িদের ঘর তৈরি হয় বাঁশের মাচার ওপর, তাই নিচ থেকে ঝিরঝির করে বাতাস এসে লাগছে গায়ে। বাইরে একটা পাহাড়ি পেঁচা (মাউন্টেইন স্কপস আওল), সেই সন্ধ্যা থেকে ডেকে চলেছে। নিজের ঘরের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন পরিবার-পরিজনের কোনও খবর জানি না।

চন্দ্রইপাড়ার মানুষ এখনও প্রকৃত ম্রো জীবন যাপনে অভ্যস্ত। জুম চাষের পাশাপাশি এরা বনের পশুপাখি শিকার করে থাকে। তবে জনসংখ্যা কম হওয়ায় এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না থাকায় এদের শিকার আশপাশের বন্যপ্রাণীর সংখ্যায় তেমন বড় ধরনের প্রভাব ফেলে না। শিকার করা পাখির ঠোঁট এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর শিং, দাঁত এরা ঘরের বেড়ায় গুঁজে রাখে। এমন গুঁজে রাখা অংশগুলোর মধ্যে পেয়েছি রাজ ধনেশ ও পাকড়া ধনেশের ঠোঁট, বনছাগলের শিং, মায়া হরিণ ও সাম্বার হরিণের শিং এবং বানর, শূকর ও গুইসাপের মাথার খুলি। এরা ফাঁদ দিয়ে ধনেশ পাখি ধরে। ফাঁদে টোপ হিসাবে বিশেষ যে ফল ব্যবহার করা হয় তা দেখলে নাকি ধনেশ রীতিমতো পাগল হয়ে যায়। এছাড়া বনে শিকার খুঁজে বের করতে পোষা কুকুর ব্যবহার করে। গ্রামপ্রধান আর তার ছেলের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি পার্শ্ববর্তী লিক্রি এলাকার গহিন বনে বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুকসহ অনেক বন্যপ্রাণী এখনও টিকে আছে। মাঝেমধ্যে দুই-একটা গয়ালেরও দেখা মেলে। আগের বছর একটা বাঘ আর একটা কালো চিতাবাঘের (সাধারণ চিতাবাঘেরই বিশেষ রূপ যা প্যান্থার নামে পরিচিত) মুখোমুখি হয়েছিলেন গ্রামপ্রধান নিজেই। বনের এমনই নানা দুর্লভ পশুপাখির কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই আমরা রওনা হয়ে গেলাম। পুরো যাত্রাপথের আজকের দিনের অংশটুকু সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ও কষ্টকর। কারণ যে পথে আমরা যাচ্ছি সে পথে স্থানীয় আদিবাসী ছাড়া মাত্র একটি অভিযাত্রী দল। ইতিপূর্বে গিয়েছে। বৈমানিক ও প্রকৃতিবিদ এনাম তালুকদারের নেতৃত্বে তিন

সদস্যের একটি দল আগের বছর সর্বপ্রথম এ পথে যায়। তাদের কাছ থেকে যা শুনেছি সে অনুযায়ী লিক্রি পাহাড়ের পূর্বদিকের পাদদেশ থেকে পাহাড় পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিকের পাদদেশে পৌঁছতে এগারো ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা ধীরে ধীরে যতই পাহাড়ের ওপরে উঠছি বন-জঙ্গল ততই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। আমাদের পথের দু-পাশে জানা-অজানা অনেক গাছপালা। কয়েকটা চাম্পক গাছ দেখলাম অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল এবং উঁচু। এক জায়গায় দেখি পথের ওপর অদ্ভুত কয়েকটা ফুল পড়ে আছে। এমন ফুল আমি আগে কখনও দেখিনি। এটি কোনও অনাবিষ্কৃত উদ্ভিদের ফুল হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই অঞ্চল জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এযাবৎ কোনও জরিপ পরিচালিত হয়নি। উল্লেখ্য, এই জায়গা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর একটির মধ্যে পড়েছে, যার নাম 'ইন্দো-বার্মা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট'। যাই হোক, যে ফুলের কথা বলছি সেটি সাদা রঙের বেশ বড় একটা ফুল। এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি হলো ফুলের গোড়ার দিকে যে অংশটি সরু নলের মতো থাকে এই ফুলের সে অংশ অনেক লম্বা (আট ইঞ্চি)।

লিক্রি পাহাড়টি সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উঁচু। আমরা পাহাড়ের ওপর পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল হয়ে গেল। পাহাড়ের ওপর থেকে পূর্বে মিয়ানমার সীমান্তের দিকে তাকিয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। মানুষের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে বুনো প্রকৃতির রূপ যে কতটা অপরূপ হতে পারে তাই দেখছি চোখের সামনে। আমার সামনে ছোট-বড় পাহাড়ের সারি চলে গেছে সীমান্তের দিকে। পাহাড়গুলো ঢেকে আছে পান্নার মতো চকচকে সবুজ গাছপালায়। পাশের উপত্যকায় যে প্রকাণ্ড গাছগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখছি ওপর থেকে। তাই গাছের মাথাগুলো দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড ফুলকপির মতো। এমন সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিলো দুর্লভ এক রাজ ধনেশ। প্রকাণ্ড গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে সে। শেষে গিয়ে বসল এমনই এক গাছের মাথায়। জীবনে প্রথম রাজ ধনেশ দেখার আনন্দে আমরা তখন আত্মহারা! লিক্রি পাহাড়ের অপর ঢালে হঠাৎ শুনতে পেলাম রাজ ধনেশের 'উয়াং-উয়াং' ডাক। সে ডাক শুনে জোঁকের কামড় উপেক্ষা করে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে যখন কাছে গিয়েছি তখন পাখায় শমশম শব্দ তুলে উড়ে গেল সে।

লিক্রি পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে ম্রো আদিবাসীদের ছোট একটা গ্রাম পড়ল। সেখানে আমাদের মধ্যাহ্নবিরতি। এমন প্রত্যন্ত এলাকার অন্যান্য ম্রো অথবা খুমিদের মতোই এদের জীবনযাত্রা ও বেশভূষায় এখনও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি।

গ্রাম থেকে রওনা হওয়ার পর শুরু হলো বৃষ্টি। পাহাড়ি পথ (শুধু নামেই পথ, প্রকৃতপক্ষে কোনওমতে হেঁটে যাওয়ার মতো) এমনিতেই ঝুঁকিপূর্ণ আর তার ওপর বৃষ্টি শুরু হয়ে আমাদের যাত্রা খুবই বিপজ্জনক করে তুলল। সন্ধ্যার আগেই আমাদের মাতামুহুরী নদীর উৎসমুখে অবস্থিত হেডম্যানপাড়ায় পৌঁছতে হবে। তাই দেরি করার কোনও উপায় ছিল না। ক্যামেরার ব্যাগটি পলিথিন দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে হাতে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে নামতে থাকলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। নিচে খাদের দিকে চোখ গেলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। পা পিছলে পড়ে গেলে প্রাণ নিয়ে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। পাহাড় থেকে নামতে

নামতে শেষ বিকেলের দিকে একটা ঝিরি বা ঝরনার দেখা পেলাম যার নাম চিন্দু ঝিরি। এই ঝিরির মতো আরও অনেক ঝিরি মিলেই মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি। বুঝতে পারলাম নদী আর বেশি দূরে নেই। কিছুদূর যেতেই নদীর দেখা পেলাম। নদীর ওপারে ছোট একটা টিলার ওপর হেডম্যানপাড়া দেখা যাচ্ছে। সাগর পাড়ি দেওয়া জাহাজের যাত্রীরা দিগন্ত বিস্তৃত সাগরে একটা দ্বীপ দেখে যেমন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে হেডম্যানপাড়া দেখে আমাদের অবস্থা তখন তেমনই।

হেডম্যানপাড়ায় যাওয়ার আগেই মাতামুহুরী নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ পানিতে গোসল করে নিলাম। এখানে পানির গভীরতা খুব কম, বড়জোর দুই ফুট হবে। তাই গোসল করতে হলো নদীর পাথুরে তলদেশে দুই হাত রেখে অনেকটা বুকডন দেওয়ার মতো করে। হেডম্যানপাড়ার সবাই খুব অতিথিপরায়ণ। আমাদের আগমন উপলক্ষে বেশ বড় একটা মোরগ আর জুমের চালের সুস্বাদু আঠালো ভাত রান্না হলো রাতে।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের পদযাত্রা শুরু হলো মাতামুহুরী নদী ধরে ভাটির দিকে। এদিকটায় পানির গভীরতা কম বলে নৌকা চলে না। প্রায় ঘন্টা তিনেক নদীর ধার দিয়ে এবং অগভীরে পানির মধ্যদিয়ে হেঁটে মাতামুহুরীর সবচেয়ে উজানে অবস্থিত আর্মি ক্যাম্প পোয়ামুহুরী পৌঁছাই। এখানে আমাদের স্থানীয় গাইডকে বিদায় জানালাম। ক্যাম্পের পাশেই ছোট একটা বাজার; এখানে বাঙালিদের বেশ আনাগোনা। এখান থেকে আলীকদম পর্যন্ত নৌকা চলে তবে দুই দিনের পথ। এদিকের নৌকার মাঝি সবাই বাঙালি, আর নৌকার গঠনেও সাঙ্গুর ওদিকের চেয়ে বিস্তর পার্থক্য। নদীর দুই তীরে বন-জঙ্গল তেমন একটা নেই, তাই পশু-পাখি বিশেষ কিছু দেখছি না। তবে নদীর ধার দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর বেশ আনাগোনা। এরা ঝুড়ি ভরে কমলা, লেবু ও আরও অনেক ফল-ফসল নিয়ে নদীর ধারে আসে বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে।

নদীর দুই তীরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে এলাম পরবর্তী আর্মি ক্যাম্প কুরুকপাতা। এখানে এসে পড়লাম এক ফ্যাসাদে। সাঙ্গু নদী ধরে উজানে যাওয়ার আগে আমরা বিডিআরের আঞ্চলিক সদর দফতরে দেখা করে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে বড় মদক পর্যন্ত সব ক্যাম্পে আমাদের আগমনের খবর জানা ছিল। বড় মদক ক্যাম্প ছেড়ে আসার আগে ওখানে অনুরোধ করে এসেছিলাম যাতে মাতামুহুরীর দিকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আমাদের যাওয়ার খবর জানায়। কিন্তু কোনও ভুলের কারণে পোয়ামুহুরী ক্যাম্পে খবর পৌঁছালেও কুরুকপাতায় সে খবর পৌঁছেনি। সমস্যা আরও জটিল হলো, কারণ যে পথে আমাদের যেতে হবে সে পথে আর্মিদের একটি দল অপারেশনে গিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রচুর গোলাগুলি হচ্ছে। অগত্যা ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সাহেবের অনুরোধে যাত্রাবিরতি করতে হলো। তবে অনেকটা সময় নষ্ট হলেও লাভ যে কিছু হলো না তা নয়।

পরদিন ভোরবেলা কুরুকপাতা ক্যাম্পের পাশের একটা পাহাড়ে উল্লুকের ডাক শুনতে পেলাম। এখানে যে উল্লুক আছে তা কল্পনা করিনি, কারণ উল্লুক থাকার মতো উঁচু গাছপালা তেমন একটা নেই। পাহাড়ের পশ্চিমে নদীর ধারে বড় একটা শুকনো গাছে দেখলাম বাইশটি বিরল ধূমকল কবুতর (বিশটি মাউন্টেইন ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন ও দুইটি গ্রিন ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন)। একসঙ্গে এতগুলো ধূমকল কবুতর দেখা ভাগ্যের ব্যাপার।

সকালবেলা নাশতা সারতে সারতে আমাদের যাত্রাপথের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এল এবং সাঙ্গু নদী ধরে আমাদের প্রবেশের খবর আঞ্চলিক বিডিআর ক্যাম্প নিশ্চিত করল। আমরা নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। পথে অনেক দীর্ঘ বাঁশের চালি ভেসে যেতে দেখলাম। পাহাড় থেকে কেটে আনা এসব বাঁশ চলে যাবে দেশের সর্বত্র। পথে বেশকিছু পাখিও (রিভার ল্যাপউইং পাইড বুশচ্যাট, শামুকখোল, ইত্যাদি) দেখলাম, তবে খুব বিরল কিছু নয়। নদীর দুই ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে বিকাল নাগাদ আলীকদম পৌঁছে গেলাম। সামনে ঈদ, তাই দেরি না করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। সঙ্গে নিয়ে গেলাম প্রতিটি দিনের সব ঘটনার স্মৃতি এবং বেশকিছু দুর্লভ বন্যপ্রাণী দেখার অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের অনেক দুর্গম এলাকায় অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু কোনও এলাকা এত স্মৃতিময় হয়নি।

সাঙ্গু নদীর উজানে একবার গিয়ে সাধ মেটার নয়। গত ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে বন্ধুদের সঙ্গে আবার রওনা হলাম একই পথ ধরে। বড় মদক ক্যাম্প ছাড়িয়ে উজানে মুরাওয়া নামক স্থানে যেখানে ২০০৫ সালে নদীর দুই তীরে চমৎকার সুন্দরবন দেখেছিলাম– সেখানে এখনও চমৎকার বন আছে। তবে এমন দুর্গম এলাকা থেকেও বড় বড় গাছ কেটে বাঁশের চালির সঙ্গে বেঁধে সাঙ্গু নদীতে ভাসিয়ে বান্দরবান পাঠানো হয়। অনেক হাত বদল হয়ে সেই কাঠ আসে ঢাকায়। ঢাকার মানুষ হয়তো কোনওদিন জানতে পারবে না তাদের কাঠের চাহিদা মেটাতে গিয়ে চমৎকার কোনও প্রাকৃতিক বন হারিয়ে যাচ্ছে।

মুরাওয়ার উজানে আর যেতে সাহস করলাম না। ওই এলাকায় মিয়ানমারের সন্ত্রাসী দলগুলোর দৌরাত্ম্য এত বেড়ে গেছে যে, স্থানীয় আদিবাসীদেরও বিডিআরের পক্ষ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের নিষিদ্ধ পপি চাষ করতে বাধ্য করে। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর সেই চন্দ্রইপাড়াসহ চারটি সীমান্তবর্তী গ্রাম তুলে এনে মুরাওয়ার ঠিক আগে বসানো হয়েছে। ফেরত রওনা হওয়ার আগে এই নতুন গুচ্ছগ্রামে আমরা রাতে রইলাম। পাশের ঘরে কয়েকজন আদিবাসী বাঁশের তৈরি অদ্ভুত বাঁশি বাজাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাতে কেমন যেন করুণ এক সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যে সুর হারিয়ে যাচ্ছে আঁধারে। আর তেমন করেই অন্য এক আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে বন-পাহাড়ের বন্যপ্রাণী আর সহজ-সরল আদিবাসীদের শত বছরের লালিত সংস্কৃতি। গুচ্ছগ্রাম থেকে ঢাকা ফেরার তিন সপ্তাহ পর খবর পেলাম বিডিআর সদস্যদের সহযোগিতা করার অভিযোগে মিয়ানমারের সন্ত্রাসীরা রাতের আঁধারে গ্রাম ঘেরাও করে চন্দ্রইপাড়ার গ্রামপ্রধানসহ আরও একজনকে খুন করেছে। ■

লেখক : বন্যপ্রাণী গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Protected Areas and Ecotourism in Bangladesh

Prof. Dr. Mohammed Jashimuddin

Introduction

Protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values (Dudley, 2008). According to the Bangladesh Wildlife (Conservation and Security) Act 2012, "protected area" means all sanctuaries, national parks, community conservation areas, safari parks, eco-parks, botanical gardens notified under the provisions of sections 13, 17, 18 and 19 under Chapter IV and special biodiversity conservation area established under the provisions of section 22 under Chapter V and traditional heritage and kunjaban declared under section 23 under Chapter V.

Protected areas play an important role in tourism by offering visitors places for outdoor recreation, education and learning, and solace, spiritualism, healing and renewal. Important benefits derived from protected areas are conservation of biodiversity and ecology, source of fresh water & food security, medicines & genetics, help in poverty reduction, regulate climate change, traditional life styles, strengthen social capital & solidarity, act as natural barriers, and provision of recreational and spiritual opportunities. Adopting responsible tourism approach protected areas can satisfy visitors, encourage contribution for conservation, increase biodiversity & ecosystem health, support greater owner ship & accountability, and empower local community.

In general protected areas have been set up for different reasons; do exist in wilderness areas and in long-settled landscapes; are present in forests, savannahs, grasslands, mountains, deserts, wetlands, ice caps, lakes and at sea; vary greatly in size; have been given many different names at the national level; are based on national legislation or international agreements of many kinds; came about through various types of governmental and other initiatives; are owned by different interests; are run by different kinds of organizations; are the cornerstones of virtually all national and international conservation strategies, set aside to maintain functioning natural ecosystems, to act as refuges for species and to maintain ecological processes that cannot survive in most intensely managed landscapes and seascapes; act as benchmarks against which we understand human interactions with the natural world; often the only hope we have of stopping many threatened or endemic species from becoming extinct; exist in natural or near-natural ecosystems, or are being restored to such a state, although there are exceptions; many contain major features of earth history and earth processes while others document the subtle interplay between human activity and nature in cultural landscapes.

Protected area based ecotourism is now the most interesting topic to the nature lover and policy maker throughout the world because of its linkage with economic benefits, protected area management and biodiversity conservation (Rahman et al., 2013). Bangladesh is a country filled with natural wonders and untouched reserves and home to a variety of unique and magnificent creatures. With hills, valleys, forests, beaches, lakes and rivers, ecotourism in Bangladesh is ideal. Although this is still a relatively new form of tourism in Bangladesh, ecotourism is on the rise and extensive efforts are being made to promote it in the country (Tuhin & Majumder, 2011).

History of Protected Areas

Protected areas are cultural artifacts and their story is entwined with that of human civilization. Over 2,000 years ago, some areas were set aside by royal decree in India for the protection of natural resources. In Europe, hunting grounds were protected for the rich and powerful for a thousand years. The idea of protection of special places is universal. It occurs among the traditions of communities in the Pacific ("tapu" areas) and in parts of Africa (sacred groves), for example. In 1810, English Poet, William Wordsworth wrote of his vision of The Lake District as "a sort of national property". In 1832, the American poet, explorer and artist, George Catlin, pointed to the need for "…a nation's park, containing man and beast, in all the wild and freshness of their nature's beauty". In 1864, the US Congress gave a small part of the present Yosemite National Park to the State

Institute of Forestry and Environmental Sciences, University of Chittagong, Chittagong 4331, Bangladesh, E-mail: mjashimuddin2001@yahoo.co.uk

of California for - "public use, resort and recreation". In 1866, the British Colony of New South Wales in Australia took the first steps in creation of the modern Blue Mountains National Park. Several forest reserves were set up in South Africa in the last years of the nineteenth century. In 1872, the first true national park came with the dedication of Yellowstone by United States law "as a public park or pleasuring ground for the benefit and enjoyment of the people". In 1879, Royal National Park was created in Sydney. In 1885, Canada gave protection to hot springs in the Bow Valley of the Rocky Mountains, part of which became the Banff National Park. In 1887, a Maori Chief offered the Crown 2,400 ha of the sacred summits of Tongariro, Ngauruhoe and Ruapehu which became in time part of Tongariro National Park in New Zealand.

Legal Context of Protected Areas in Bangladesh

The provision for the conservation and security of biodiversity, forest and wildlife has been included in Article 18A of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh. The Bangladesh government very recently enacted Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012 as an Act to provide for the conservation and security of biodiversity, forest and wildlife of Bangladesh by repealing the Act in force for the protection and management of wildlife of the country. Basically, this Act has repealed the Bangladesh Wildlife (Preservation) (Amendment) Act, 1974. The Wildlife (Conservation and Security) Act, 2012 is used to declare PAs of different categories by official gazette under different section namely, wildlife sanctuary (WS) under section 13, national parks (NP) under section 17, community conservation area (CCA) under section 18, eco-park, safari park and botanical garden under section 19, special biodiversity conservation area under section 22, and traditional heritage and Kunjaban under section 23. Environmental Conservation Act 1995 (With subsequent amendments) is used to declare ECAs under section 5. The government also promulgated Environmental Conservation Rules 1997 and Environment Court Act 2000 (Amended in 2002) to safeguard environmental conservation in the country. Bangladesh is a signatory to some international conventions which have bearing on protected areas, such as, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, International Plant Protection Convention, Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) and Convention on Biological Diversity (CBD).

Protected areas in Bangladesh

Bangladesh has declared its first national park as Himchari National Park in Cox's Bazar back in 1980. So far there are 38 protected areas declared by the government that includes 17 national parks , 20 wildlife sanctuaries, and covers 10.72% of the total forest areas in Bangladesh, and 1 swatch of no ground marine protected area (Figure 1). There are some other protected areas declared and managed by BFD including 8 Eco-parks, 2 safari parks and 2 botanical gardens in Bangladesh that conserve important biodiversity of the country. All of the above protected areas are declared under The Wildlife (Conservation and Security) Act 2012. In spite of these protected areas there are also 8 ecologically critical areas (ECA) declared under section 5 of Environmental Conservation Act 1995. There are also 3 UNESCO world heritage sites (Sixty Doom Mosque in Bagerhat, Ruins of Buddist Vihara at Paharpur in Naogaon and the Sundarbans in Bagerhat, Khulna and Satkhira), 2 Ramsar sites (Tanguar haor in Sunamganj and the Sundarbans in Bagerhat, Khulna and Satkhira) and numerous community conservation areas like, village common forests, village groves and sacred forests. A number of community conservation areas are also spread over different parts of the country that includes village common forests, sacred groves and village groves like, Pochamaria village bamboo grove in Rajshahi.

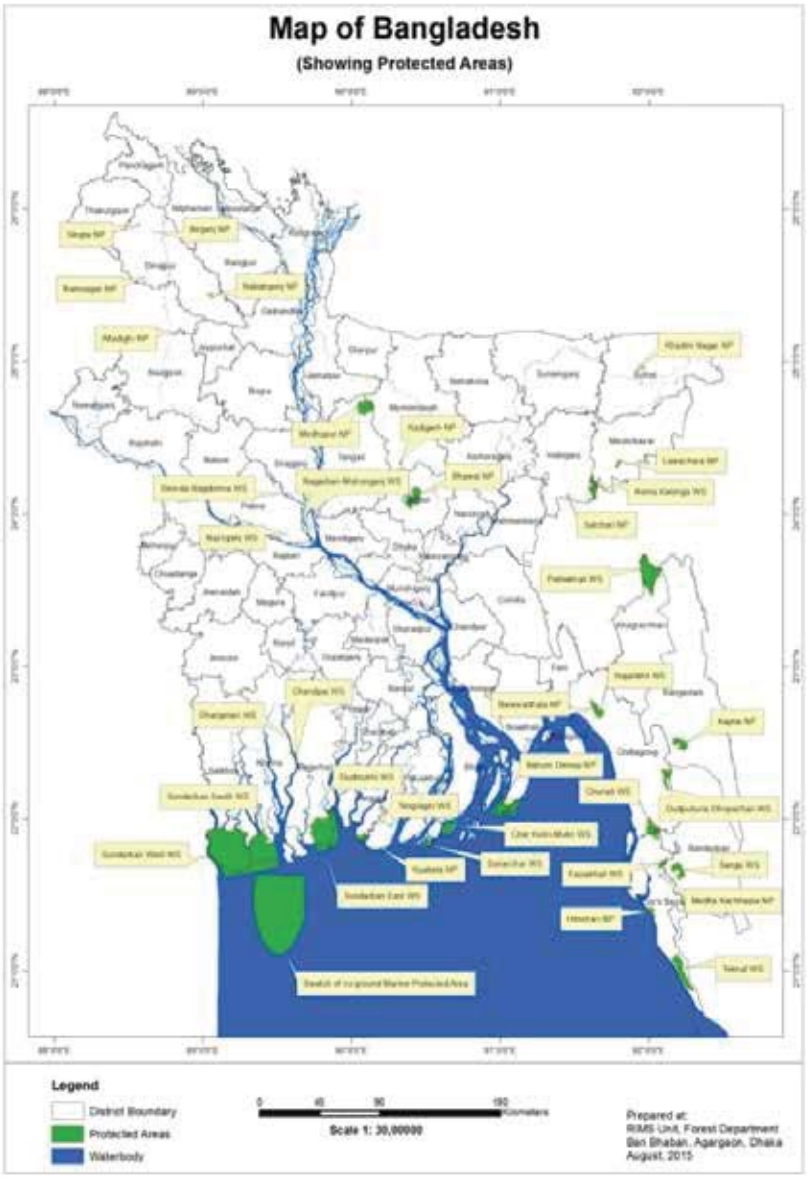

Figure 1: Map showing distribution of Protected Areas in Bangladesh

Tourism Attractions in Bangladesh

Bangladesh is a country of natural beauty with lots of tourist attractions and infrastructures. Most important attractions include national parks, wildlife sanctuaries, sea beaches, islands, trekking, adventures, culture & festivals, archaeological heritages, historical places, hills, lakes, indigenous people & their lives, and tea gardens. Some of the important archaeological sites include Paharpur, Mahasthangarh, Mainamati, Lalbagh Fort, Shat Gambuj Mosque, Sonargaon, Kantanagar Temple, etc. Important historical places include National Memorial of Bangladesh, Undefeated Bengal at Dhaka University, National Museum of Bangladesh, Language Marty's Memorial, Parliament of Bangladesh, Qilla Mosque at Lalbag Fort, Tomb of Pari Bibi at Lalbag Fort, Chotto Sona Mosque, Lord Curzon Hall at Dhaka University, Mainamati in Comilla, Hossaini Dalan, The Ahsan Manjil, Mosque Baba Adam, Mahasthangarh in Bogura, Intellectual Martyr's Memorial, Kuthibari of

Nobel Laureate Tagore, Sonargaon- the oldest capital of Bengal, Armenian Church at Old Dhaka, Star Mosque in Dhaka, World War II Cemetery in Comilla, World War II Cemetery in Chittagong, Rajban Bihara Pagoda, National Mosque of Bangladesh (Figure 2).

Figure 2: Some important tourism attractions in Bangladesh

The Concept of Ecotourism

Ecotourism is regarded as an effective tool for sustainable conservation of forest resources and its biodiversity. It plays both conservation and revenue earning roles. Conservation roles are played in two ways: by keeping intact, and somewhere by improving, the existing forest resources to attract the tourists and secondly by involving the poor forest dwellers, who were removing trees and other non-timber products for their livelihood, in different income generating activities within the ecotourism area (Alam, Furukawa, & Akter, 2010).

Ecotourism in and around protected areas should be a tool for conservation: building support and raising awareness of the many important ecological, cultural, sacred, spiritual, aesthetic, recreational and economic values of protected areas. In addition, tourism generates much-needed income for conservation work in the places that it operates. It should also contribute to the quality of life of local communities; support indigenous people's traditions, respect sacred sites; and recognize the legitimacy of indigenous knowledge and law. Moreover, tourism provides opportunities for local employment and education of visitors (Bushell & Eagles, 2007).

Most tourism in natural areas today is not ecotourism and is therefore, not sustainable. Ecotourism is distinguished by its emphasis on conservation, education, traveler (and tour operator) responsibility and active community participation. Increased tourism to sensitive natural areas without appropriate planning and management can threaten the integrity of ecosystems and local cultures. The increase of visitors to ecologically sensitive areas can also lead to significant environmental degradation. The brief and globally accepted definition of ecotourism is “Responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people” The International Ecotourism Society (TIES), 1990 . However, as the development of ecotourism has matured, a more in-depth and all-encompassing definition has become widely accepted

among ecotourism practitioners as “Environmentally responsible travel and visitation to natural areas in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features, both past and present) that promote conservation, have a low visitor impact and provide for beneficially active socio-economic involvement of local peoples” (Drumm & Moore, 2005).

Ecotourism has become an important economic activity in natural areas around the world. Not only does it allow visitors the chance to experience nature and learn about the importance of biodiversity conservation and local cultures, its primary goal must be to generate income for conservation and provide revenues where possible for communities living in and around protected areas. It is important to remember that some areas have greater potential for developing ecotourism than others and all have inherent challenges. Environmental organizations have generally insisted that only tourism that is nature-based, sustainably-managed, conservation-supporting, and environmentally-educated should be described as ecotourism (Buckley, 1994).

Ecotourism in Bangladesh is increasing in popularity as more people come to appreciate the stunning landscapes, fascinating wildlife and biodiversity of plants found in this beautiful country. A variety of ecotourism activities are on offer in Bangladesh. Hike through the lush green countryside as you search for ancient temples, mosques, monuments, remains of ancient civilizations, etc. Hope aboard a boat and drift along on a glistening lake or river. Trek through thick forest where you may come across indigenous villages. Stand a chance of viewing Bangladesh's amazing tigers. Many tourism companies offer a variety of itineraries and personalized eco-tours along with knowledgeable guides who will add to your amazing experience.

Bangladesh Forest Department (BFD) has taken some good initiatives with USAID supported Nishorgo Support Project (NSP) in 5 protected areas to conserve forests through co-management approach involving local communities, different government and non-government organizations, and other stakeholders and develop ecotourism products to generate revenues to support forest conservation and community livelihoods since 2004. The protected areas include Lawachara National Park, Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary, Satchari Reserve Forest, Chunati Wildlife Sanctuary, and Teknaf Wildlife Sanctuary. Later the co-management approach was also introduced in another 18 protected areas through Integrated Protected Area Co-management (IPAC) project. Different development partners like, USAID, GIZ, EU, etc. are supporting the initiative taken by BFD through co-management of protected areas. It seems that Bangladesh is heading towards forest conservation and increasing income of the local people by integrating ecotourism with forest conservation. However, it is important that when ecotourism is being promoted in the country, the environment does not become over-exploited or damaged. Educating, motivating and effectively involving all the stakeholders in ecotourism activities will definitely bring a positive change in forest conservation and community livelihoods and reduce the harmful effects of tourism.

References

Alam, M., Furukawa, Y., & Akter, S. (2010). Forest-based Tourism in Bangladesh: Status, Problems and Prospects. TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, 5 (1), 163-172.

Buckley, R. (1994). A Framework for Ecotourism. Annals of Tourism Research, 21 (3), 661-669.

Bushell, R., & Eagles, P. (2007). Tourism and Protected Areas: Benefits Beyond Boundaries. The Vth IUCN World Parks Congress (p. xxiii + 349). Durban: IUCN.

Drumm, A. & Moore, A. (2005). Ecotourism Development – A Manual for Conservation Planners and Managers Volume 1: An Introduction to Ecotourism Planning (Second Edition). The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA, 96 p.

Rahman, M. H., Roy, B., Anik, S. I., & Fardusi, M. J. (2013). Ecotourism and Protected Area Conservation in Bangladesh: a Case Study on Understanding the Visitors Views on Prospects and Development. Journal of Forest Science, 29 (1), 15-28.

Tuhin, M., & Majumder, M. (2011). An Appraisal of Tourism Industry Development in Bangladesh. European Journal of Business and Management, 3 (3), 287-298.

ওয়ান হেলথ : পরিবেশ, প্রাণি ও মানব স্বাস্থ্যের যৌথ যাত্রা

অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা১, ডাঃ এইচ বি এম গোলাম মাহমুদ২ মোঃ জাহিদুল কবির৩

দ্বিতীয় বিশ্ব পরবর্তী সময়ে এন্টিবায়োটিক সহ নতুন নতুন ঔষধের আবিষ্কার, স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাধারণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া প্রভৃতির কারণে সংক্রামক রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমে আসছিল। রোগ ব্যাধির এ পরিবর্তিত প্রবণতায় প্রভাবিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল এক বক্তৃতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত বই বন্ধ রেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্য সব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল যে একাই -এমন ভাবতেন তেমন ভাবাটা ভুল হবে। তার সংগে সহমত প্রকাশের লোকের অভাব ছিল না, বস্তুত মানব জাতি বিশেষ করে শিল্পোন্নত বিশ্ব সংক্রামক ব্যাধির বিরূদ্ধে লড়াইয়ে জিতে গেছে এমন আত্ম প্রসাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও পেশাজীবিরা ভুগছিলেন বললেও খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না।

দূর্ভাগ্যবশতঃ এ ধারন ভুল প্রতীয়মান হতে বেশি সময় লাগে নাই। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অভাবনীয় সব আবিষ্কার সত্ত্বেও মানবজাতিকে নতুন নতুন রোগ ব্যাধির মুখোমুখি হতে হচ্ছিল এবং পুরোনো অনেক রোগ ব্যাধি নতুন করে ফিরে আসছিল এবং এ প্রবণতা এখনো অব্যাহত আছে। বনভুমি কমে আসার ফলে বন্য প্রাণির আবাসস্থলের সংকোচন, জলবায়ু পরিবর্তন, চাহিদা বৃদ্ধির কারণে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বাণিজ্যের ব্যাপক বিকাশ ও আন্তর্জাতিকীকরণ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও পর্যটনের ব্যাপকতা বহুগুণে বৃদ্ধি, ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদনে সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারকে বিশেষজ্ঞরা নতুন এসব রোগ ব্যাধির ও নতুন স্বাস্থ্য সমস্যার উদ্ভবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

---

১ পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও চেয়ার ওয়ান হেলথ সেক্রেটারিয়েট কোঅর্ডিনেশন কমিটি ; ২ চীফ ভেটেরিনারি অফিসার ও পরিচালক(সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং কো-চেয়ার ওয়ান হেলথ সেক্রেটারিয়েট কোঅর্ডিনেশন কমিটি; ৩ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (বন্য প্রাণি ও নেচার কনজারভেশন সার্কেল) ও কো-চেয়ার ওয়ান হেলথ সেক্রেটারিয়েট কোঅর্ডিনেশন কমিটি

নতুন উদ্ভূত এ সব রোগকে আমরা উদীয়মান রোগ (emerging disease) ও সাম্প্রতিক সময়ে ছিল না কিন্তু নতুন করে আবার দেখা দিচ্ছে এমন সব রোগব্যাধিকে আমরা পুনরাবির্ভূত (reemerging disease) বলি। উদীয়মান ও পুনরাবির্ভূত রোগব্যাধি দমনে প্রচলিত জ্ঞান ও কৌশল খুব একটা কাজে আসে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে সংক্রামক রোগ সমুহের ৬০ ভাগের বেশি প্রাণি থেকে মানুষে এসেছে এবং উদীয়মান রোগ সমূহের প্রায় ৭৫ শতাংশই প্রাণি থেকে এসেছে। বন্য প্রাণি এ সব রোগের অধিকাংশের রিজার্ভার হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপাহ, সার্স, মার্স, ইবোলা ভাইরাসের কথা বলা যেতে পারে। আবার, গৃহপালিত প্রাণি থেকে বন্য প্রাণিতে রোগ সংক্রমণের কারণে বন্য প্রাণি রোগাক্রান্ত হতে পারে এতে করে বিশেষ করে বিপদাপন্ন প্রাণি সংরক্ষণ মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই মানুষে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপাহ, এনথাক্স প্রভৃতি রোগের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে । জলাতংকের মত মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগ দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যমান। মানুষ ও পোষা প্রাণির ঘনত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন, বনভুমির সংকোচন প্রভৃতির কারণে বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশকে উদীয়মান রোগ আবির্ভাবের একটি হটস্পট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে জ্ঞানের নতুন নতুন বিশেষায়িত শাখার উদ্ভবের যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল তা বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের তাদের নিজস্ব কাজের জগতের নির্দিষ্ট এলাকায় গভীর মনোনিবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে তাদের সেবা গ্রহণকারীরাও এসব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অধিক কার্যকর সেবা পাচ্ছেন। কিন্তু এর ফলে, বিশেজ্ঞদের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, এই সম্পর্কহীনতার কারণে পারস্পারিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলতঃ স্বাস্থ্য সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে না দেখে, আলাদা আলাদাভাবে দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হয় । ফলে স্বাস্থ্য সমস্যার মুলে যাওয়ার সম্ভব হচ্ছিল না এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থ্যা নেওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না।

রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যা একক কারণে খুব বেশি ঘটে না। বড় দাগে বলতে গেলে, স্বাস্থ্য সমস্যা মুলত পরিবেশ, রোগ বা বিপত্তি সৃষ্টিকারী অনুজীব বা উপাদান এবং পোষকের মিথস্ক্রিয়ার ফল। কাজেই স্বাস্থ্য সমস্যার টেকসই সমাধান করতে হলে, রোগ সৃষ্টির এ তিনটি উপাদানের দিকেই নজর দিতে হবে। আর তা করতে হলে দরকার বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন খাতের সংশ্লিষ্ট সবার

সমন্বিত উদ্যোগ।

উনিশ শতকের প্রখ্যাত চিকিৎসক রুডলফ ভারচো প্রথম প্রাণিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের গুরুত্বের কথা সবার গোচরে আনেন। ১৯৪৮ সনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলনে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ভেটেরিনারি জ্ঞান ও দক্ষতা জুনোটিক (প্রাণি থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়) রোগ সহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৬৪ সনে ডঃ কেলভিন সোয়াবে জুনোটিক রোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমে ভেটেরিনারিয়ান ও ফিজিশিয়ানদের একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান এবং তিনিই প্রথম "ওয়ান মেডিসিন" কথাটি ব্যবহার করেন। ২০০৪ সনে ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটি আয়োজিত " বিল্ডিং ইন্টারডিসিপ্লিনারি ব্রিজেস টু হেলথ ইন আ গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড " শীর্ষক সেমিনার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ, পোষা প্রাণি ও বন্য প্রাণির মধ্যে রোগের পারস্পরিক বিস্তার সম্পর্কে বন্য প্রাণি বিশেষজ্ঞ, ভেটেরিনারিয়ান ও ফিজিশিয়ানরা আলাপ আলোচনা করে রোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য ১২টি অগ্রাধিকার এলাকা চিহ্নিত করেন। এই ১২টি অগ্রাধিকার ম্যানহাট্টান প্রিন্সিপ্যাল নামে পরিচিত। এ ঘোষণায় রোগ প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক ও আন্তঃপেশা উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় যা বস্তুত ওয়ান হেলথ ধারনার সূচনা করে বলে ধরে নেওয়া হয়। ২০০৪ সনের শেষ দিকে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দুর প্রাচ্যে মুরগিতে একটি বিশেষ ধরণের এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ ফাইভ এন ওয়ান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চীনে এই ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে অনেক মানুষের প্রাণহানী ঘটে। রোগটি সারা বিশ্বে ব্যাপক ভাবে (প্যান্ডেমিক আকারে) ছড়িয়ে পড়ার আশংকা বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা , বিশ্ব প্রাণি স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জেনেভায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এক যোগে কাজ করার ঘোষণা দেয় এবং রোগটিকে উৎসে নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানায়। বাংলাদেশও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করে । এ পরিকল্পনায় বহু সেক্টর ভিত্তিক সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ন্ত্রণে সরকারের স্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য ও বন বিভাগ এক যোগে কাজ করে আসছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক এ কার্যক্রম এনথ্রাক্স নিয়ন্ত্রণেও কাজ দিয়েছে। ২০০৭ সনে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় সারা বিশ্বের সরকার সমুহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলি প্যান্ডেমিক প্রতিরোধে ওয়ান হেলথ ধারণা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন।

২০০৮ সনে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ান হেলথ উদ্যোগকে প্রধান প্রতিপাদ্য হিসেবে নেওয়া এক সম্মেলনে চিকিৎসক, ভেটেরিনারিয়ান, বন্যপ্রাণি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী সহ বিভিন্ন সেক্টর ও পেশার বিশেষজ্ঞরা ওয়ান হেলথ ঘোষনা গ্রহন করেন। একই বছরে ওয়ান হেলথ বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়। গঠনের পর থেকেই সংগঠনটি ওযান হেলথ ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং বহুপেশা -বহু সেক্টর ভিত্তিক ওযান হেলথ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মানুষ, পোষা প্রাণি, বন্য প্রাণি ও প্রতিবেশের স্বাস্থ্য সুরক্ষার যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বহুমুখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ তৎপরতার ফলে, ২০১২ সনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের শিশু তহবিলের সহায়তায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ওয়ান হেলথ কৌশল কাঠামো গ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২০০৪ -এ এইচ ফাইভ এন ওয়ান সংক্রমণের পর ২০১০ সনে সারা বিশ্বে এইচ ওয়ান এন -১ সংক্রমণ সারা বিশ্বে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্যান্ডেমিক ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশে এইচ ফাইভ এন ওয়ান সংক্রান্ত প্রস্তুতি এইচ ফাইভ এন ওয়ান সংক্রমন ও প্রতিরোধে কাজ দেয় এবং ফলতঃ এইচ ওয়ান এন -১ কারণে সংক্রমণ ও মৃত্যু সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে। এইচ ওয়ান এন -১ প্যান্ডেমিকের পর মার্স করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়, প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে সীমিত থাকলেও মার্স করোনা ভাইরাস ইদানীং কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। চীনে এইচ সেভেন এন নাইন ভাইরাস ২০১২ সনে ব্যাপক মৃত্যুর কারণ হয়েছে এবং এর বিস্তারের ঝুঁকি এখনো রয়ে গেছে। এ সব বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যার সংগে যোগ হয়েছে ২০১৪ সনে শুরু হওয়া ইবোলার মত প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব। আফ্রিকায় প্রাণিস্বাস্থ্য ও মানব স্বাস্থ্যের দূর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং আন্তঃ সেক্টর সমণ্বয় ও সহযোগীতার দূর্বলতার কারণে রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে ও প্রচুর প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে। ইবোলা ওয়ান হেলথের প্রাসংগিকতা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

প্যান্ডেমিকের সম্ভাবনা থেকে বাঁচা, বায়োটেরোরিজমের বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা, এন্টিমাইক্রোবায়াল রেজিসটেন্সের বিপদ সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে আমাদের পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য ২০১৪ সনের ফেব্রুয়ারীতে গ্লোবাল হেলথ এজেন্ডা উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ৫০ টি দেশ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এর সংগে যুক্ত হয়েছে। এগরোটি একশন প্যাকেজের মাধ্যমে এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা হবে এবং বাংলাদেশ এর অন্যতম বাস্তবায়নকারী দেশ। বহুসেক্টর ও বহু পাক্ষিক সমন্বিত উদ্যোগ গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি এজেন্ডার আবশ্যিক ও কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। আর এভাবেই ওয়ান হেলথ এপ্রোচ এই

এজেন্ডায় গভীরভাবে অঙ্গীভুত হয়ে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা এমার্জিং প্যান্ডেমিক থ্রেট প্রোগামের ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত করছে। এ প্রোগ্রামেও ওয়ান হেলথ এপ্রোচের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে শুধু মাত্র বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহুপেশার সমন্বিত ও একত্রিত উদ্যোগের উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাই নয়, একটি টেকসই ওয়ান হেলথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ওয়ান হেলথকে চেতনায় লালন করে এমন একটি পেশাদার প্রজন্ম তৈরি করে যৌথ কাজের একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি মাথায় রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ (আই ই ডি সি আর) তাদের ইপিডেমিওলোজি কোর্সে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভেটেরিনারিয়ানদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আবার চট্টগ্রামের ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি একটি ওযান হেলথ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছে। ওয়ান হেলথের একটি টেকসই সমণ্বয় কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি টেকসই ওয়ান হেলথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরিতে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। ওয়ান হেলথ সংক্রান্ত ইন্টারমিনিস্টারিয়াল স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। আই ই ডি সি আর-এ ওয়ান হেলথ সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটের কর্মকাঠামোও অনুমোদন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

উদ্ভব পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধ করতে পারলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক কমে আসে। যে সমস্ত বন্য প্রাণি থেকে মানুষ বা পোষা প্রাণিতে রোগ সংক্রমণ হয় সে সব প্রাণিতে যে সমস্ত প্রাণির ভাইরাস নিয়ে গবেষণা চলছে, এতে করে সম্ভাব্য উদীয়মান রোগ সর্ম্পকে পুর্বানুমান সম্ভব হবে। এ জন্যও দরকার বিভিন্ন পেশা ও সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের একত্রে কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। উদীয়মান রোগ সৃষ্টি ও নতুন নতুন স্বাস্থ্য সমস্যার পেছনে কাজ করে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। বাংলাদেশে নিপাহ সংক্রমণ কিংবা খাদ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় ধাতব বস্তুর উপস্থিতি মূলতঃ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার ফল।

সংক্রামক রোগ ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা ও পুষ্টি সমস্যার সমাধানের জন্যও দরকার ওয়ান হেলথ এপ্রোচ। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে ফার্ম টু ফর্ক (খামার থেকে কাঁটা চামচ) সব ধাপে খাদ্য যাতে নিরাপদ থাকে সে পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তা নিশ্চিত করতে হলে ওয়ান হেলথ পদ্ধতির কোন বিকল্প নাই।

যদিও ওয়ান হেলথ এডভোকেসি ও ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে, তবে ওয়ান হেলথ উদ্যোগকে টেকসই করতে হলে, তিনটি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া জরুরী। ওয়ান হেলথ ধারণাকে কাজে পরিণত করার জন্য একটি টেকসই ওয়ান হেলথ সমণ্বয় কাঠামো, ওয়ান হেলথ ওযার্কফোর্স ও একত্রে কাজ করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার। আর তা করতে পারলেই আমরা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের জন্য শ্রেয়তর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারব।

Forest Genetic Resources in the CHT Headwater Reserve Forests

Dr. Md. Zahidur Rahman Miah

Plant genetic resource includes all our agricultural crops and even some of their wild relatives because they too often have valuable traits. According to the revised International Undertaking 1983 of the FAO, plant genetic resources were defined as the entire generative and vegetative reproductive material of species with economic and social value, especially for the agriculture of the present and the future, with special emphasis on nutritional plants.

Forest genetic resources (FGR) or tree genetic resources are genetic material of shrub and tree species of actual or future value. Forest genetic resources are essential for forest depending communities who rely for a substantial part of their livelihoods on timber and non-timber forest products (for example fruits, gums and resins) for food security, domestic use and income generation.

FGR comprise one subset of plant genetic resources for food and agriculture (PGRFA). PGRFA are defined as any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture. FGR are also included as a subset of agro-biodiversity, which is defined as the variety and variability of animals, plants and micro-organisms that are used directly or indirectly for food and agriculture, including crops, livestock, forestry and fisheries.

Important CHT forests as source of important rivers were notified by British as headwater Reserve Forests (for example Kassalong, Reinkhyong, Rampahar, Sitapahar, Maini, Sangu, Matamuhuri) starting from 1870s. Headwater Reserve Forests (RFs) provide a biophysical and socio-economic context for gainful partnerships of local community by restoring forests and water bodies with socio-ecological co-benefits.

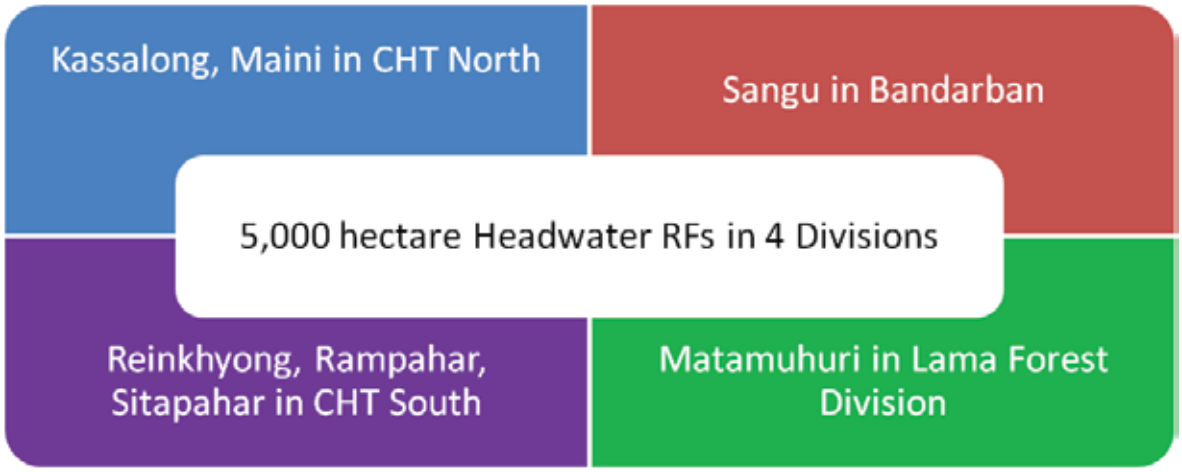

Sustainable forest management of both natural and planted forests and for timber and non-timber products is essential to achieving sustainable development and is a critical means to eradicate poverty, significantly reduce deforestation, halt the loss of forest biodiversity and land and resource degradation, and improve food security and access to safe drinking water and affordable energy. The achievement of sustainable forest management, nationally and globally, including through partnerships among interested governments and stakeholders, including the private sector, indigenous and local communities and non-governmental organizations, is an essential goal of sustainable development (UN, 2002). The contribution of forestry to the national Gross Domestic Product (GDP) at current prices has been estimated to be 3.28% (BBS, 1994). The supply of various forest products such as timber, poles, fuel wood, bamboo, etc. cannot meet the present demand. The gap between demand and supply has been increasing with the increase in population. This gap may be narrowed

Deputy Conservator of Forests (DCF), Legal Unit, Forest Directorate

through the establishment of plantations of fast growing trees in the denuded forest areas, wastelands as well as homestead areas.

The extent of genetic resources in Chittagong Hill Tracts (CHTs) is very much significant. Headwater forests of CHTs are rich harbor of many diversified plant genetic resources and it represents mixed evergreen rain forest. Generally, the distribution of the plant species differs according to the gradient altitude and aspects of the hills. These forests are composed of three storied plant species. Upper storey is composed of Dipterocarpaceae, Verbenace, Anacardiaceous and Moraceae etc. family. The prominent plants are Dipterocarpus turbinatus, Tectona grandis, Swintonia floribunda, Artocarpus chaplasha etc. The middle storey is composed of Lythraceae, Lauraceae and Sapindaceae etc. family. Notable plants are Lagerstroemia speciosa, Litsea monopetala, Phobe lanceolata, Dehaasia kurzii and Sapium baccatum etc. The third stratum is composed by Rubiaceae, Urticaceae, Acantheceae, Araceae, Amarantheceae, Taccaceae family. This stratum is mainly composed by herbs, shrubs and many woody climbers. Some plant species like Tectona grandis, Dipterocarpus etc. species found in the hill top, some plant species like Lagerstromia speciosa, Litsea monopetala, Biscofia javanica, Cordia dichotoma etc. are found in the margins of the forest near river side. Some aquatic species like Ipomoea fistulosa, Ipomoea aquatica, Ludwigia adcendens etc. are found in the streams. Every year a huge number of plants seedlings are found in the forest floor during rainy seasons like Dipterocarpus turbinatus and Syzigium firmum but these are destroyed by fire during summer.

Forest Genetic Resources and Livelihoods:

The total contribution of forest Genetic Resources (FGR) to livelihoods is difficult to quantify. The amount of forest products collected by forest dependent households varies according to season, access, and alternative options (Warner 2000). FGR provides fuel wood and housing materials for all household in both villages irrespective of season. Most households in this area mitigate their lean period (June to August) by collecting wild vegetables and fruits from the forests. Fishing is banned in Kaptai Lake during this period (June to August) and approximately 43% of Kaptai Lake depended fisher households consume adjoining FGR as food for overcoming lean period. According to villager's opinion, food insecurity has increased overtime with the depletion of FGR.

Table 1: FGR collected as food during the wet season

Resource	Local name	Scientific name	Extent
Leafy vegetables	Chingi shak	*Laasia spinosa*	More available
	Tara shak	*Alpinia nigra*	More available
	Chikon shak	*Homalomena aromatica*	More available
	Dheki shak	*Dicranopteris linearis*	More available
	Thankuni shak	*Clitoria ternatea*	More available
	Ban kochu (Leaf, stem and corm)	*Colocasia esculenta* (taro)	More available
	Kalar mocha and Thor	*Musa ornate* (wild banana)	Less available
	Moricha Lata(Chui jhal)	*Piper chaba*	Less available
Bamboo Shoots	Bash korol	*Melocanna baccifera*	Moderately available
Jungle Fruits	Jog dumur	*Ficus racemosa*	More available
	Chalta	*Dillenia indica*	Less available
	Gutgutia Fruit	*Fortium serrattum*	Less avilable
	Khana Fruits	*Oroxylum indicum*	Less available

Threats to the Forest Genetic Resources:

Now in Bangladesh especially hilly forests of mixed evergreen forests are facing serious threats due to anthropogenic activities. Although by the fifteen amendment Bangladesh government has amended its constitution for emphasizing conservation of biodiversity (plants and animals). According to latest report of IUCN less than five percent plants have been enlisted for preparing red list for plants. Already many plants are seen in these areas in few numbers that were occurring more than present.

A good number of possible threats have been identified in CHTs area. Those might lead to depletion of plant diversity in this headwater forest reserves. Such threats are as illegal logging, firing, agricultural encroachment, over-exploitation of forest minor products, overgrazing inside the forest, lack of awareness, inadequate number of forest warden.

- ❒ Jhuming (Slash and burning agriculture) is the main problem of plantations and natural regeneration. It causes severe depletion of plant genetic resources.
- ❒ Illegal extraction of valuable timber by organized illegal logger causes wildlife shelter plants (Teak, Garjan etc.) depletion. Often illegal logger transports timber by underwater bamboo raft.
- ❒ Illegal fuel wood is being collected by settler. In this way some destitute women are fully dependent on fuel wood for maintaining their livelihood. Generally they cut down naturally regenerated small plants in the deep forests and after few days they collect these for selling local market. So certainly this fuel wood collection hampers natural regeneration.
- ❒ Grazing in the national park causes disappearing of natural regeneration of forest plants.
- ❒ Increasing road network inside national park causes accelerating depletion of forest plant genetic resources.

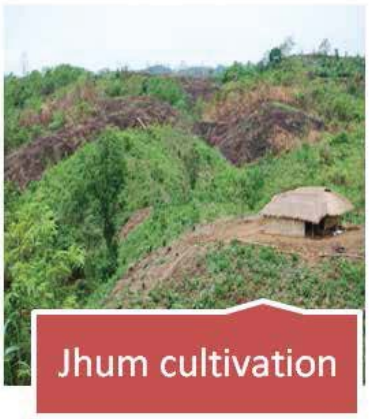

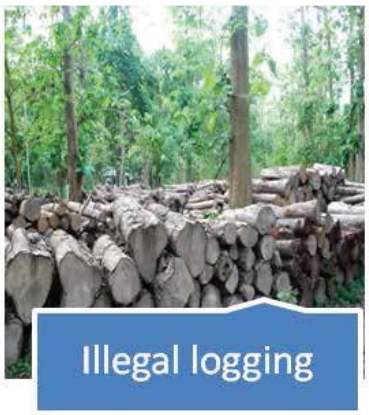

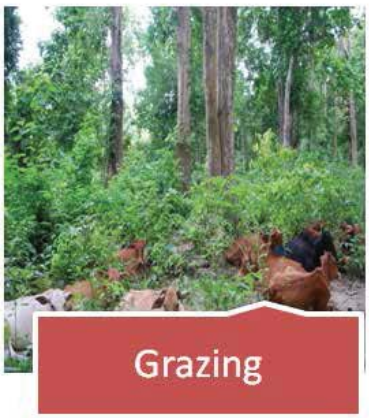

The conservation of forest genetic resources is a multidimensional process. In situ and ex situ, dynamic and static conservation are complementary part of this puzzle. Finally, conservation is a considerable undertaking, which needs a scientific background, commitment and partnership of all actors in the forestry sector, public and private funding and space and time of periodic evolution.

Way Forward:

- ❖ To establish and strengthen national forest genetic resources assessment, characterization and monitoring systems.

- To develop national and subnational systems for the assessment and management of traditional knowledge on forest genetic resources.
- To develop international technical standards and protocols for forest genetic resources inventory, characterization and monitoring and trends and risks.
- To promote the establishment and reinforcement of forest genetic resources information systems (databases) to cover available scientific and traditional knowledge on uses, distribution, habitats biology and genetic variation of species and species populations.
- To strengthen the contribution of primary forest and protected areas to in situ conservation of forest genetic resources.
- To promote the establishment and development of efficient and sustainable ex situ conservation systems.
- To support and strengthen the role of indigenous and local communities in the sustainable management and conservation of forest genetic resources.

Development aid in the forestry sector of Bangladesh: politics and implications

Dr. Md.Saifur Rahman, & Dr. Lukas Giessen

Summary

The study aims to analyse the influence of foreign donors on domestic policy making process. Employing the case of forestry sector of Bangladesh, the study shows that funding as a significant policy instrument playsthe key role in a country's political process to set an agenda on the table. The analytical framework and datawere sourced from the authors' cooperation in arecent PhD research.We conclude that impact of such policy changes should be made visible and an impact assessment of such internationally driven policy changes is needed for informing both, donors and domestic agencies.

Foreign donors, employing their financial, technical and expertise related means, are expected to exert a considerable degree of informal influence over domestic policy changes (Rahman et al. 2016a). Bernstein and Cashore (2012) described that international actors and institutions may access to and influence domestic/national policy process through four pathways: international rules, norms and discourses, market mechanism and direct access to domestic policy making. Rahman et al. (2016a) showed that foreign donors employing the latest pathway accessed the domestic country system and influenced on policy making in the forestry sector of Bangladesh. According to the pathway, foreign donors by means of funding, technical assistance and capacity building programs, may influence the policy making. In development aspect, such influence, for the sake of development, might seems simpler; however, in political science, it has a great significance in a sovereign country's developmentas well as political process. Consequently, one interesting question might be - how they manage to set the agenda as an important policy item. The second question, but a bit challenging one is - what are the impacts of such donor's driven policies. Arguably, according to Rahman et al. (2016a) during the last three decades (1980-2014), for 15 of the 17 major policy changes that happened in the community-based forestry subsector, the links between funding by donors and domestic policy changes has been demonstrated.

In discussing first question, we are well aware that foreign donors patronize funding commonly in the form of development project aid (DPA) in a recipient country like Bangladesh (see Rahman et al. 2016a; Rahman and Giessen 2017). This funding – a common form of financial policy instrument may act as astimulusto attract and to some extentgenerate various forms of instruments as policy drivers (e.g., informational, regulatory and collective action (see Böcher 2012).This was reflected partially in the research (Rahman et al. 2016b; Rahman and Giessen 2016; Giessen et al. 2016; Sarker et al. 2017) through which we can see that, the foreign donors using the DPA tends to advance their informational power element (e.g., through providing technical assistance) and to a limited extent regulatory element (e.g., through approving allocation of fund, working plan etc.)in the field of prominent policy issues (e.g. forest biodiversity, forest-related climate change, community-based forest management). Funding as a causal variable can also regulate collective action.

If we examine the funding flow in the forestry sector of Bangladesh from 1980 to 2014, one can see that a continuous flow of funding happened until around the year 2000 (Fig. 1). The World Bank and ADB supplied all loan money in this period. Both entities stopped committing funding observed in between 2001 to 2008. At first ADB stopped its' funding in 2003 and it never returned to funding. World Bank followed ADB, not committing further funding, but it resumed its funding in 2011. The period 2001 to 2008 may be termed as a hollow period, in which ADB suspended its loan money for a project entitled, "Sundarbans Biodiversity Conservation Project"due to non-compliance or only partial compliance with agreements related to a lack of proper implementation of a decentralised management system, as well as a lack of proper financial management (ADB, 2008, p. 5; Rahman et al. 2016a). It seems to be thought-provoking that in this no commitment period, USAID as a new bilateral donor entered into the stage by providing DPA through the Nishorgo Support Project in 2004.At this point, a brand new concept, "forest protected area co-management" was introduced replacing old "social forestry model". Thus, several possibilities might be considered interesting in political aspect: First, ADB's withdrawn of funding may act as a change agent,since as policy entrepreneurs, the donors might form a coalition, diffuse their ideas among the policy networksactors, result in no investment in theabove mentioned

period. Second, this may convey a concerted pressure from the donors end due to non-compliance of their policy prescriptions. Third, this may be a part of mutual belief system among the policy actors that the old system might be replaced by the new one and as such they (ADB and World Bank) opened up spaces for USAID to enter into the stage to host a new conservation and development policy era in the country. This shows a radical change may come about through the advocacy coalitions of donors that in turn result from a common set of basic values, causal assumptions, problem perceptions and a degree of coordinated activity over time (see Sabatier and Jenkins-Smith 1993, p. 25). The authors also argued that such changes are usually accompanied by an exogenous shock that may alter the resources and opportunities of various coalitions (Roberts 1998).

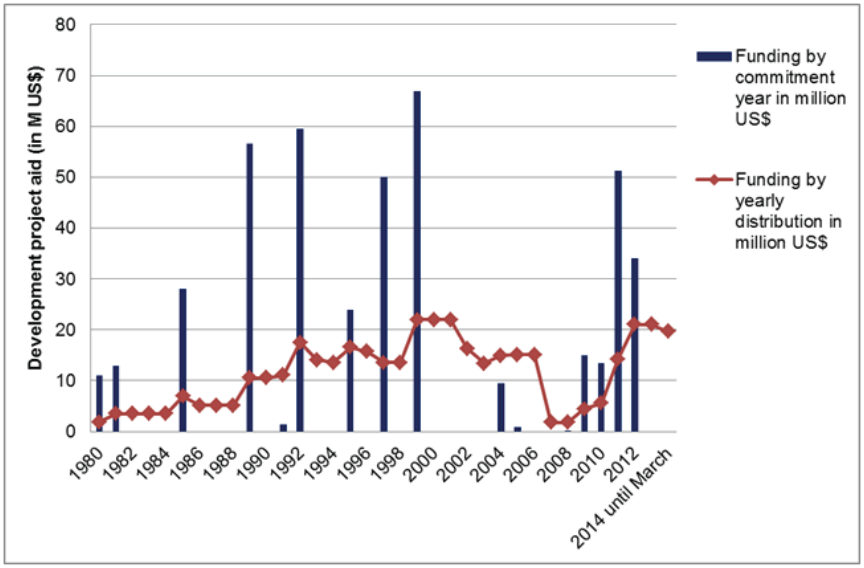

Fig. 1. Forestry sector development project aid in Bangladesh from 1980 to 2014 (Adapted from Rahman et al. 2016; the line graph represents funding by yearly distribution and the bar graph shows funding by commitment year)

Accordingly, it is assumed that funding is an important policy tool used by the policy actors (e.g. foreign donors) to put the policy agenda in the table creating a conditional political environment; otherwise, the recipient side may miss the opportunity to catch the funding –a policy solution for all problems. Since, according to Kingdon (1995)a number of streams on problems, politics and policy run side by side simultaneously. At certain points in time, windows of opportunity open up when these different streams meet. As a developing country it has problem always floating in the air. Moreover, environmental sector has persistent and long-lasting problem (Böcher 2016). Funding, here, as anindependent variable create a favourable political environment along with a significant policy instrument as discussed above, result in solution in the form of policy changes.This is also perhaps a part of the politics that domestic government may not reject the policy prescriptions of foreign donors because of concern and financial dependence, as doing so may cause a negative reaction in the donor community (Rahman and Giessen 2014; Rahman et al. 2016a).

The second question would concentrate on implications of such policy changes. Problem-solving lies at the center of policy analysis (Krott 2005) and the perspective which sees it as one of the main rationalities of state and political actors and is widespread in environmental literature (Böcher unpublished). Hence, it would be praiseworthy if the policy changes made by the donor can solve the real problem. Consequently, the problem should be based on facts, compatible with core development context (e.g. forest health, livelihoods) and match with domestic governance system. It should not be identical to "garbage can" concept (Kingdon 1984), in which

"a collection of choice looking for problems", solutions looking for issues to which they might be the answer and decision makers looking for work" (Cohen et al. 1972, p. 1).We should also keepin mind that the political process and changes should not only serve the formal and informal political, economic and strategic interests of political actors; however, it should also address actual development needs of a country and its economic sectors. Solution should be made based on actual issue-based problem structures that need to be visible, unequivocaland scientific; since issue may be sometimes fuzzy,cross-sectoral and inconsistent (e.g. climate change).If it is the case, then it might be challenging to focus on real problems and seek solution therein. As a recipient perspective and a significant policy instrument, paying attention for funding is one needed aspect, however regarding other instruments, such as technical knowledge and information, it is also important to know who are gaining the most and how the gain could be maximized from the recipient end. Research organizations should come forward to perform impact analysis of such internationally driven policy changes. Bangladesh Forest Research Institute (BFRI) is a government institute that can potentially perform such impact analysis as well as can respond tointegrate relevant research results into political action.In case BFRI is assigned such a task, they will need research resources for assessing the impacts of those policy changes primarily based on political analyses, supplemented with economics and legal studies.

References

1. ADB, (2008). Validation Report of Bangladesh: Sundarbans Biodiversity Conservation Project. Reference Number: PCV: BAN 2008-37. (URL: http://www.adb.org/documents/bangladesh-sundarbans-biodiversity-conservation-project (retrieved 23.06.2014).
2. Bernstein, S., & Cashore, B. (2012). Complex global governance and domestic policies: Four pathways of influence. International Affairs, 88(3), 585–604.
3. Böcher, M. (2016). The role of policy entrepreneurs in regional governance processes. In I.N. Aflaki, E. Petridou, E., L. Miles, (Eds.), Entrepreneurship in the Polis: Understanding Political Entrepreneurship. London and New York: Routledge.
4. Böcher, M., (2012). A theoretical framework for explaining the choice of instruments in environmental policy. Forest Policy and Economics 16, 14-22.
5. Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (1972). A garbage can model of organizational choice. ASQ, 17, 1–25.
6. Giessen, L., Sarker, P. K., & Rahman, M. S. (2016). International and domestic sustainable forest management policies: Distributive effects on power among state agencies in Bangladesh. Sustainability, 8, 335.
7. Kingdon, J. (1984). Agendas, alternatives, and public policies. Boston: Little, Brown.
8. Kingdon, J.W., (1995). Agendas, alternatives and public policies (2nded.). Longman, New York.
9. Krott, M. (2005). Forest Policy Analysis. Dordrecht: Springer Publications.
10. Rahman, M. S., & Giessen, L. (2014). Mapping international forest related issues and main actors' positions in Bangladesh. International Forestry Review, 16(6), 586–601.
11. Rahman, M. S., & Giessen, L. (2016). The power of public bureaucracies: forest-related climate change policies in Bangladesh (1992–2014). Climate Policy. http://dx.doi.org/10.1080/14693062.2016.1197093.
12. Rahman, M. S., & Giessen, L. (2017). Formal and Informal Interests of Donors to Allocate Aid: Spending Patterns of USAID, GIZ, and EU Forest Development Policy in Bangladesh. World Development, 94, 250-267.
13. Rahman, M. S., Sadath, M. N., & Giessen, L. (2016a). Foreign donors driving policy change in recipient countries: Three decades of development aid towards community-based forest policy in Bangladesh. Forest Policy and Economics, 68, 39–53.
14. Rahman, M. S., Sarker, P. K., & Giessen, L. (2016b). Power players in biodiversity policy: Insights from international and domestic forest biodiversity initiatives in Bangladesh from 1992 to 2013. Land Use Policy, 59, 386–401.

15. Roberts, N.C. (1998). Radical change by entrepreneurial design. Acquisition Review Quarterly, 107-128.
16. Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. (Eds.). (1993). Policy change and learning. Boulder: Westview Press.
17. Sarker, P. K., Rahman, M. S., & Giessen, L. (2017). Empowering state agencies through national and international community forestry policies in Bangladesh. International Forestry Review 19(1):79-101.

1Senior Assistant Chief (Planning & Development), Ministry of Environment and Forests, Bangladesh Secretariat, Dhaka, E-mail: saifur69@yahoo.com
2Chair Group of Forest and Nature Conservation Policy, Georg-August University, Göttingen, Germany

The opinions expressed in this paper reflect authors' own scientific work and not necessarily reveal position of the government agencies of Bangladesh (e.g. Ministry of Environment and Forests). This contribution is partially based on a scientific study adapted from the first author's PhD project. We gratefully acknowledge financial support from DAAD and DFG, Germany.

মহামায়া ইকো-পার্ক ঃ ইকো-ট্যুরিজম সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ

ড. মোঃ জগলুল হোসেন

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও ফটিকছড়ি উপজেলাধীন রামগড়-সীতাকুন্ড এলাকার পাহাড়ী জমি সমন্বয়ে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সংরক্ষিত বন বা রিজার্ভড ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের মীরসরাই উপজেলার মীরসরাই রেঞ্জের রামগড়-সীতাকুন্ড রিজার্ভ ফরেস্ট মৌজার জোরারগঞ্জ ও রঘুরনাথপুর ব্লকের ১৫৬০.০ হেক্টর সংরক্ষিত বনভূমির সমন্বয়ে জাতীয় বন নীতির ৮ নং ঘোষণা এবং বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরপিত্তা) আইন ২০১২ এর ২২ ধারা অনুসারে "মহামায়া বিশেষ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এলাকা" ঘোষণার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

গুগল ম্যাপে মহামায়া ইকো-পার্ক

উক্ত এলাকাটিকে মহামায়া বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা" ঘোষণার প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও উক্ত পার্কের গেট ও লেক ইজারা প্রদানের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র এবং ইতিপূর্বে প্রেরিত বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় ইহাকে মহামায়া ইকো-পার্ক হিসেবে উল্লেখ করায় লেখাটিতে মহামায়া ইকো-পার্ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হতে মহামায়া ইকোপার্ক এলাকার দূরত্ব বিভিন্ন স্থানে ২.০/২.৫ কিলোমিটারের মধ্যে মীরসরাই উপজেলার গোবানিয়া ও মস্তাননগর রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হতে প্রস্তাবিত এলাকায় যাতায়াত সহজ। চট্টগ্রাম শহর হতে যাতায়াতের উন্নত ব্যবস্থা সমৃদ্ধ মহামায়া ইকোপার্ক এলাকার উত্তরে- মীরসরাই রেঞ্জের জোরারগঞ্জ বিটের জোরারগঞ্জ ব্লকের অবশিষ্ট এলাকা। দক্ষিণে-মীরসরাই রেঞ্জের গোবানিয়া বিটের গোবানিয়া ব্লক ও রঘুনাথপুর ব্লকের অবশিষ্ট এলাকা।

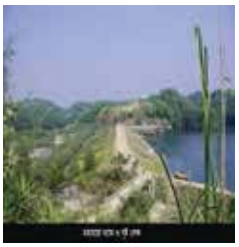

বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

পূর্বে-করেরহাট রেঞ্জের দক্ষিণ কয়লা ব্লকের দক্ষিণাংশ এবং ফটিকছড়ি উপজেলার হাসনাবাদ রেঞ্জের, হাসনাবাদ বিটের, হাসনাবাদ ব্লক এবং নারায়নহাট রেঞ্জের বালুখালী বিটের চাঁদপুর ব্লক বা ফটিকছড়ি উপজেলার রামগড়-সীতাকুন্ড রিজার্ভড ফরেস্ট এবং পশ্চিমে নিকটে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইন এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সহ মীরসরাই উপজেলার সোনাপাহাড়, রূপাই, পূর্ব মিঠানালা গ্রাম অবস্থিত। ভৌগলিকভাবে প্রস্তাবিত মহামায়া বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাটি ২২°- ৫০.২৫´ হতে ২২°-৪৮´ অক্ষাংশ ও ৯১°-৩৩.৫০´´ হতে ৯১°-৩৭.৩০ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

রামগড়-সীতাকুন্ড সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত মহামায়া ছড়ায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মহামায়া ছড়া সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মাটির ড্যাম ও এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-পবম(বঃশাঃ-১)০৫/২০০৯/৬৮১ তারিখ-০৫ শ্রাবণ ১৪১৭/২০ জুলাই ২০১০ মূলে ১৯.৭৯ একর বা ৮.০ হেক্টর জমি শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বর্ণিত এলাকায় মাটির ড্যাম ও এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করেছে। মহামায়া ছড়ায় মাটির ড্যাম নির্মাণের ফলে প্রায় ২০০.০ হেক্টরেরও অধিক জায়গায় জলাধার বা লেকের সৃষ্টি হয়েছে। এ জলাধারে জলচর পশু-পাখীর আগমন ঘটায় এলাকাটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করায় এলাকাটিতে পর্যটকদের প্রচুর সমাগম হচ্ছে।

পাহাড় পরিবেষ্টিত মহামায়া লেক

একদা এলাকাটি সেগুন বাগান এবং প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিভিন্ন ধরণের লতা, গুল্ম ও গাছে পরিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন ধরণের বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের জন্য এলাকাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কিছু মনুষ্য সৃষ্ট কারণে উক্ত এলাকার প্রাকৃতিক বনের কিছু ক্ষতি সাধিত হলেও এখনও সেখানে প্রাকৃতিক বনে বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর ও বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ বিদ্যমান যা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা অপরিহার্য। এছাড়াটি এলাকাটি বিভিন্ন ধরণের বিরল প্রাণি এবং দেশীয় ও পরিযায়ী জলজ পাখির আবাসস্থল। এই পাহাড়ী এলাকাটি সবুজ বনে আচ্ছাদনের কারণে এবং মহামায়া ছড়ায় সারা বছর পরিচ্ছন্ন স্বাদু পানি সরবরাহ হওয়ার কারণে এ এলাকাটিতে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের দারুন সম্ভাবনা রয়েছে। বিশাল জলাশয়ের কারণে উক্ত পার্ক এলাকার জীববৈচিত্র দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এর নান্দনিক সৌন্দর্য পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ার কারণে দর্শনার্থীদের এই সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকায় যাতায়াতের সব ধরণের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান।

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার রামগড়-সীতাকুন্ড রিজার্ভড ফরেস্ট মৌজার মীরসরাই রেঞ্জের জোরারগঞ্জ বিটের জোরারগঞ্জ ব্লক এবং গোবানিয়া বিটের রঘুনাথপুর ব্লকের সংরক্ষিত বন এলাকায় রীজের/চুড়ার পশ্চিম পার্শ্বে উচু-নীচু পাহাড় ও টিলা শ্রেণীর বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বন বিভাগের সৃজিত বাগান, লতা-গুল্ম, জীব বৈচিত্র্যসহ বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির গাছ-পালা, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ঝর্ণা, লেক্ পরিবেষ্টিত এ এলাকায় পশু-পক্ষির বিচরণ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। এ এলাকায় সেগুন, গামার, আকাশমনি, কড়ই, জাম, চাপালিশ, কদম, চিকরাশি, হরিতকি, বহেরা, আমলকি, ম্যানজিয়াম, গোদা, গুটগুটিয়া, ভাদি, কাঞ্জল, জারুল, মেহগিনি, শিমূল, কাউফল, আম, কাঁঠাল, বাটনা, বর্তা, নীম, ছাতিয়ান, তেতুল, অর্জুণ, উড়িআম, হারগজা, মাদার, মিনজিরি, সোনালু, বট, কুল, উলটকম্বল, আপাং, পেয়ারা, মিতিঙ্গা বাঁশ, কালিবাঁশ, বাড়িয়ালাবাঁশ, মুলিবাঁশ, ডলুবাঁশ, ছন, শতমুলি, আসামলতা, স্বর্ণলতা, মনগুলা, লজ্বাবতী, স্বর্পগন্ধা, মেন্দা, তোমকা, তুলসী, সাইকাস ও বিভিন্ন শ্রেণীর অর্কিট ও ক্যাকটাস বিদ্যমান।

এ এলাকায় প্রায়ঃশই মায়া হরিণ, খরগোশ, হনুমান, বানর, সজারু, বন্য ছাগল, বন রুই, বন্যশুকর, বন বিড়াল, শিয়াল, উদ বিড়াল, বাগডাসা, ভল্লুক, বেজি, ইঁদুর, রামকুত্তা, কাঠবিড়ালী, গুইসাপ, গোখরো সাপ, অজগরসহ বিভিন্ন ধরণের সাপ, তক্ষক, গোর খোদক, বন মোরগ, বাদুর, চামচিকা, বাবুই, পেঁচা, হলদে পাখি, পানকৌড়ী, ভিমরাজ, বউ কথা কউ, চিল, ঈগল, জালালী কবুতর, শালিক, শ্যামা, টুনটুনি, ময়না, টিয়া, ঘুঘু, মাছরাঙা, বক, চড়ুই, ডাহুক, কাক, দোয়েল, বুলবুলি ও বিভিন্ন ধরণের পরিযায়ী পাখি ইত্যাদি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। পাহাড়ের চুড়ায় দাঁড়ালে বঙ্গোপসাগর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ চ্যানেল, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ, মহাসড়ক ইত্যাদি দেখা যায়। এ এলাকার পাথর সমৃদ্ধ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ছড়া ও লেক্ প্রাকৃতিক পরিবেশে মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে মহামায়া ইকো-পার্কে ইকো-ট্যুরিজম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ কর্তৃক মহামায়া ইকো-পার্ক এলাকায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, পর্যটকদের জন্য বিশ্রাম, প্রসাধনী ও রান্না ঘরসহ পিকনিক স্পট নির্মাণ, ইকো- কটেজ / বিশ্রামাগার নির্মাণ, সেন্ট্রি পোষ্ট নির্মাণ, আরসিসি খুঁটি সহ জেটি নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, কেন্টিন ও ওয়াশ রুম নির্মাণ, পাহাড়ে চড়ার সিড়ি নির্মাণ, প্রকৃতিক ডিজাইনের আরসিসি বেঞ্চ, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, ছাতাসহ শেড নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, পার্কিং এলাকায় হেরিং বোন বন্ড, পার্কের প্রবেশ পথে মডেল ও মূর‍্যালসহ টিকিট কাউন্টার নির্মাণ, মিশ্র পশু খাদ্য বাগান সৃজন, পাহাড় ধ্বস ক্ষয়রোধ কল্পে বাগান সৃজন, শোভা বর্ধনকারী প্রজাতির চারা রোপণ, বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির চারা রোপণ, গোলাপ বাগান, জীবন্ত বেড়া, বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির চারা রোপণ, শোভাবর্ধনকারী চারা রোপণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

মহামাহা ইকো-পার্কে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সৌন্দর্যমন্ডিত মহামায়া গুহা, মনোমুগ্ধকর পাহাড়ী ঝর্ণ, বিশাল আকৃতির জলাশয়, নৌকা ভ্রমন, লেকে বড়শী দ্বারা মাছ ধরা, বিরল প্রজাতির বিভিন্ন ধরণের দেশীয় ও পরিযায়ী জলজ ও গাছ আশ্রিত পাখিসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণি, বিভিন্ন প্রজাতির বিরল ও শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদসহ মনোরম প্রাকৃতিক বন্য সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। মনোমুগ্ধকর এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে প্রতিদিন এখানে ৫০০০-১০০০০ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।

এলাকাটি যাতে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হয় তার লক্ষ্যে, জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি সংরক্ষণ ও সৃষ্টি, চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি, যে সমস্থ গাছ ও উদ্ভিদ বর্তমানে বিলুপ্তির পথে সে সমস্থ গাছ ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সংরক্ষিত উদ্ভিদ হতে পরবর্তীতে বংশ বিস্তারের জন্য বীজ সংগ্রহ, প্রকৃতিবিদ, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ, ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, এলাকার বাসিন্দা, আগত জনসাধারণ, পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, সারা বছর স্বচ্ছ পানির ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত যথাযথভাবে ওয়াটারসেড ম্যানেজমেন্ট এর কথা চিন্তা করে ক্রমে এ পাহাড়ী এলাকায় দেশীয় দূর্লভ ও বিরল প্রজাতির বৃক্ষরাজি ও গাছপালার বনায়ন, পাহাড়ী উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা পথ সংরক্ষণ, পরিযায়ী ও দেশীয় পাখির আশ্রয় স্থল সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, আকর্ষণীয় পর্যটন ও চিত্তবিনোদন এলাকা গড়ে তোলার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লরগিয়ে মহামায়া ইকো-পার্কে ইকো-ট্যুরিজম সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন কল্পে (১) বিবিধ দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদের জিন পুল সৃস্টি, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; (২) দেশীয় এবং বিদেশী পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি; (৩) বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণি বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; (৪) বিলুপ্ত প্রায় মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদের চারা রোপণ; (৫) ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন করা; পরিবেশের উন্নয়ন সাধন; (৬) শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা; (৭) সার্বিক জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা ও (৮) অবিরাম স্বচ্ছ পানি উৎপাদনের উৎস পুনরুদ্ধার ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে সম্প্রতি "মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার" শীষক প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে।

মহামায়া লেকে বরশি দিয়ে মাছ শিকার

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হল (১) বিস্তারিত মাস্টারপ্লানসহ পার্কের প্রাকৃতিক বিবরণ সংক্রান্ত ডিজিটাল জরীপ। (২) দুস্প্রাপ্য এবং বিপদাপন্ন দেশীয় প্রজাতির দীর্ঘমেয়াদী বনায়ন, (৩) দেশীয় প্রজাতির ফলদ বৃক্ষের দীর্ঘমেয়াদী বনায়ন, (৪) ঔষধি বৃক্ষের বনায়ন, (৫) শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদের বনায়ন, (৬) প্রচার ও প্রকাশনা, (৭) যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, (৮) গাড়ী পার্কিং এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, (৯) পার্কিং এলাকা উন্নয়ন, (১০) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, (১১) আবাসিক ও ফাংশানাল ভবন নির্মাণ (যেমন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ব্যারাক, তথ্য কেন্দ্র নির্মান, ইকো-কটেজ, ক্যান্টিন নির্মান, পর্যটকদের জন্য মসজিদ নির্মান), (১২) প্রধান ফটক ও তার সাথে টিকেট কাউন্টার নির্মাণ, (১৩) পার্কের প্রবেশ মুখে আরসিসি গাইড ম্যাপ

পাহাড় বেষ্টিত মহামায়া লেক

স্থাপন, (১৪) ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ, (১৫) আরসিসি সিড়ি এবং বেঞ্চসহ অবতরণ প্লাটফর্ম নির্মাণ, (১৬) তিন তলা বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ চৌকি তৈরী, (১৭) ইকো-কটেজ নির্মাণ, (১৮) ট্যুরিস্ট সপ নির্মাণ, (১৯) ডিপার্টমেনটাল স্টোর নির্মাণ (২০) রান্নাঘর এবং শেডসহ পিকনিক স্পট, (২১) কচ্ছপের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরী, (২২) জলজ পক্ষিশালা নির্মান, (২৩) কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ(ওভারহেড ট্যাঙ্কি, নিমজ্জিত পাম্পসহ গভীর নলকূপ, ভূগভর্স্থ পানি রিজার্ভার, কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ হতে পানি বণ্টন ইত্যাদিসহ), (২৪) ময়লা-আবর্জনা ফেলার পাত্র, (২৫) শৌচাগার এবং ওয়াশরুম নির্মাণ, (২৬) আরসিসি বেঞ্চ নির্মাণ, (২৭) আরসিসি পিলারের উপর আরসিসি ছাতার নিচে গোলাকার বেঞ্চ নির্মাণ, (২৮) ইকো-পার্কের ভিতরে আভ্যন্তরীন রাস্তা, (২৯) সিসি ওয়াক ওয়ে, (৩০) আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ, (৩১) স্টিলের মাল্টিকালার সাইন বোর্ড তৈরী, (৩২) ৩ ফেজ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সমিটার, সাব-স্টেশন, পোস্ট, ক্যাবলস ইত্যাদি), (৩৩) কালভার্ট নির্মাণ, (৩৪) গভীর নলকুপ স্থাপন, (৩৪) পার্শ্ব নালা(সাইড ড্রেন), (৩৬) গাইড ওয়াল নির্মাণ, (৩৭) ওয়াটার ফিল্টার এবং শেডসহ পর্যটকদের জন্য খোবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি।

বন্যপ্রাণির আবাসস্থল উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এ এলাকা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে। এ এলাকার অন্য একটি অগ্রাধিকারপূর্ণ ক্ষেত্র হল চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন। পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এ প্রকল্প কার্যক্রম প্রস্তাব করা হয়েছে।

দর্শনার্থীরা ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে উক্ত প্রকল্প এলাকা দর্শন করা শুরু করেছে। প্রকল্প কার্যক্রম সাফল্যমন্ডিতভাবে সমাপ্তির পর নিঃসন্দেহে দর্শনার্থীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়বে এবং এটি সরকারের রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হবে এবং বনায়ন কার্যক্রম, ভৌত অবকাঠামো নির্মান ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশে ব্যাপক সম্পদ সৃষ্টি হবে।

মহামায়া লেক

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঃ

- বনায়ন এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণি বৈচিত্র পুনরুদ্ধার হবে
- ইকো-ট্যুরিজম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে
- শিক্ষা, গবেষণা ও চিত্তবিনোদন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।
- পার্কে প্রবেশ মূল্য বাবদ প্রচুর রাজস্ব আয় হবে।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।
- জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভূমিকা রাখাসহ সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি উন্নত হবে।
- অবকাঠামগত উন্নয়ন ঘটবে।
- অবিরাম স্বাদু পানি উৎপাদনের উৎস সংরক্ষিত হবে।

Forest Academy, Chittagong.

Neela Dutta

Introduction : Forest Academy is an in-service training Institute for all Forest officers to keep them. well acquainted with modern development of Forestry science and update knowledge on Forestry. It is situated in beautiful hilly surroundings adjoining BFRI at Sholoshar with in Metro polyton city, East Nasirabad, Chittagong. The Academy initially named as Bangladesh Forest College (BFC) was established in 1964 at Chittagong to cope up with increased need of the personnel of this cadre and also to build the education and capacity internally. Initially two year, Diploma-in Forestry was offered to Forest Rangers of Forest Department. Later on professional and sub-professional programs were introduced.

It was affiliated to Chittagong University in 1977 and offered 2 years B.Sc. (pass) Forestry Degree. Newly recruited Forest Rangers (having B.Sc. Degree) were given this degree. The intake was 25 per year in 1982 and the course continued till 1985. After affiliation to the Chittagong University, the college trained 119 Forest Rangers. They are now posted as Forest Rangers in deferent field of Forest Department. Some are promoted as Assistant Conservator of Forests (ACF). The professional (ACF) and sub-professional (Forest Ranger) trainees of the forest department used to be trained at Dehra Dun in British India and there after at Pakistan Forest Institute, Peshawar up to 1986. After 1986 newly recruited BCS cadre officers were given in service M. Sc in Forestry and Master of Forestry training course with the assistance of Institute of Forestry and environmental science, Chittagong University at Forest Academy. Forest College renamed as Forest Academy on 27 June 1989. Forest Academy is now performing various in-service training courses to the Foresters, deputy Rangers, Rangers Assistant conservators and deputy conservator of Forest.

Objectives of :

1. To professionally cope up with the enhanced forestry and environmental responsibility thrust by the nation upon FD, wider knowledge and technical skills and regular up-dating of new and innovative developments are required for the FD personnel through in-service training courses.
2. To conduct in-service training courses of ACFs, Forest Rangers, Deputy Rangers and Other refreshers courses as and when necessary. through suitable curriculum which include changing of national and international issues.
3. To grow up skilled manpower for forest production, conservation and management in different sectors of Forest department.

Administration: The Academy is headed by a Director in the rank of Conservator of Forests of Forest Department. This Academy is under the direct control of Deputy Chief Conservator of Forests, Education and Training Wings of Forest Directorate, Dhaka.

Director, Forest Academy, Chittagong

Faculty/Teaching Staff:

(1) Deputy conservator of Forests- 1 no.
(2) Assistant Conservator of Forests- 2 nos.
(3) Chief Instructor- 1 no.
(4) Senior Instructor- 1 no.
(5) Instructor- 2 nos.
(6) Forest Ranger- 2 nos.
(7) Forester 1 no.
(8) Except these, there are more 31 Staffs.

Class Room : 2 Class rooms with AC facilities each having 30 seat capacity. Equipped with Audio-visual instruments

Computer Facilities : There is a computer room in the 1st floor of the academic building. There are many computers with internet facilities for the trainees and teachers in the computer room.

Library facilities:

1. Well stock of books/scientific journals.
2. Separate room for reading
3. Facilities for using library from 9.0 am to 5.0 pm except on holiday.

Conference Room: Well decorated conference room for 40 participants A.C facilities

Auditorium: Forest Academy has an auditorium with seat capacity of 300 persons. It is used for conference, symposium, seminars, opening and closing ceremony of the training courses and cultural activities. The Auditorium will be renovated under facilities Development of all Training Institute of Forest Department project in the next year 2017-2018

Accommodation: Officers Dormitory is just behind the Academy Building. It has-

1. Well furnished 4 storied building
2. 30 single seated room with attached bathroom
3. 24 hours water and power supply
4. Dinning facilities at ground floor
5. Regular cooking arrangement
6. Experienced cook and staff for shopping/ cooking
7. Well stocked Utensil/Cookeries for Breakfast/Launch/Dinner
8. Common room and prayer room.

The various in service degree/courses conducted by the Forest academy are as follows:

Name of the degree/course	session year	Number of participants
Diploma-in-Forestry	1965- 1966 to 1976-1977	76
B.Sc. (Pass) in Forestry	1978-1979 to 1988-1989	119
M.Sc. in Forestry	1986 to 1988	28
Master of Forestry	2004-2005	30
Short Courses (orientation course, Refresher course, issue based training course etc.	1990- 2017	2737 (till April 2017)

Following Training Program have been completed successfully at Forest Academy under the following project/Revenue Budget:

1. Social Forestry Course for DCF/ACF/FR/DR under Forestry Sector project
2. Watershed Management Course for ACFs under Forestry Sector Project.
3. Orientation Course for ACFs under Coastal Greenbelt project.
4. Biodiversity Management and Skill Development for FR/dR/FR under Sundarbans Environmental and Livelihood Security (SEALS) Projects.
5. Ecosystem Management and Skill Development for FR/dR/FR under Sundarbans Environmental and Livelihood Security (SEALS) Projects.
6. Assisted Natural Regeneration (ANR) for Instructor/FR/DR/FR under revenue budget.
7. GPS for DFO/ACF/Instructor/Forest Ranger/DR/FR under US Forest Service.
8. Basic Forestry Course for Biodiversity Officers /Wildlife Officers/Wild live Rangers under Biodiversity conservation and Eco-tourism development Project.
9. Training on Protected Area Management and Ecotourism Development under Strengthening Regional Co-operation for wildlife Protection Project (SRCWP)
10. Wildlife Crime and GITES for FR/WBCO/FR under Strengthening Regional Co operation for Wildlife Protection Project (SRCWP)
11. Refresher course on Forestry under Strengthening the Environment, Forestry and Climate Change Capacities of the Ministry of Environment and Forests and its agencies (MOEF support project).
12. Refresher Course Related to Forestry for DCF/ACF/Senior Research Officers/and other senior officers will be held on 17/04/2016 to 21/04/2016 under Strengthening the Environment Forestry and Climate Change capacities of the Ministry of Environment and Forests and its Agencies (MOEF support project)
    Capacity Building for Forest Department Personnel under CRPARP Project.
13. Short Refresher Course of Promoted Officers for Deputy Ranger to above and Foresters Three Batches (90 Nos) Duration: 10 days, Number of participants in each batch: 30 under Facilities Development of all Training Institutes of Forest Department project in the financial year 2016-2017.

Conclusion

The prime objectives of Forest Academy is to develop well groomed and dynamic Foresters by equipping them with requisite updating forestry related knowledge technology and skill. Indeed the development of forestry initiations of learning is an expensive proposition but the expected return in terms of general manpower capabilities and the prospect of maximizing and utilization of the countries forest potential is worth many times over the initial investment that will be made at present the physical facilities of Forest Academy in the process of development. The desired quality of education and training commit be ensued unless other actions are taken. There fore it is recommenced what proper manpower planning should be done for the Academy for which more manpower needed and vacant posts should be fill up posting of willing and experienced teachers and staffs should be ensured through making the posts more attractive. Last of all Education and Training should be given highest priority adequate funding and facilities.

The National Land Representation System of Bangladesh

Rashed Jalal1, Mariam Akhter2, Khan Zarin Tasnim1

In response to reduce the prevailing problems of inconsistency between land cover maps, developed by different organizations in different time at different scales, Bangladesh Forest Department (BFD) has led the process of developing an object-based National Land Representation System (NLRS) for Bangladesh. With technical support from Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and financial support from United States Agency for International Development (USAID), the initiatives have been taken under the project "Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in support of REDD+ in Bangladesh". The process has brought together several national organisations involving an extensive process of consultation, data collection, translation and analysis of existing classification systems beginning in 2013 and completed in 2016. The legends of the existing national land cover/use maps and gaps identified within these processes have been considered in order to develop a complete, dynamic and representative overview of land cover and land use in Bangladesh.

1 Introduction

The increased use of earth observation data combined with GIS techniques has resulted in an expansion in the production of geographic databases. These databases can be used in the context of natural and land resourcemanagement to monitor forest land area, forest carbon stock and stock changes. However, compatibility and comparability are often lacking between products, with most of the contradictions existing in the classifications and legends used. In this context, harmonization can reduce these inconsistencies by highlighting and explaining similarities and dissimilarities between existing definitions of land characterization.

Management of natural resources is closely dependent on the classification system used to monitor the evolution of the state of environmental resources. Therefore, definitions and classifications are crucial for the assessment of natural resources to evaluate whether policies and measures have positive or negative effects and meet their target(s). A standardized and harmonised classification system for a country is, hence, very important, for mapping the land cover. The system can, therefore, serve as a dynamic source of information for several different applications and objectives. Such a key-legend applicable to maps, prepared under different modalities, will facilitate the process of comparison, the production of statistics and consistent time-series data. This paper provides the formation of the National Land Representation System (NLRS) and also explains the potential it has for various national initiatives that require national land cover/use information.

2 Land Cover Meta Language

Land Cover Meta Language (LCML), developed by FAO, is an ISO (International Organization for Standardization) standard (ISO 19144-2) innovative object oriented meta-language that allows great flexibility in the description of land features (Di Gregorio, 2016). LCML emphasizes on the spatial distribution pattern and the overall appearance of a real life vegetation/non-vegetation element which is perfectly applicable to the concept of land cover mapping in Bangladesh because -

- It standardizes the process of creating classes
- It provides a general framework of rules that can be used to create specific legends
- If implemented it will bring the land cover community together to create a mutual understanding of land cover nomenclatures with the aim to produce global, regional and national data sets able to be reconciled at different scales, level of detail and geographic location
- It may further then be used to specify any land cover feature anywhere in Bangladesh, using a set of independent diagnostic criteria that allow correlation with existing classifications and legends as expected.

LCCS v3 (Land Cover Classification System) is a software that is developed to function in a way where there is an overall implication of the concepts of LCML. It will not only perform the harmonization of data but also improve the data quality and improve the efficiency in using the information. LCCS v3 has the access to make

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment and Forests, Bangladesh

it function in an easy, fast and intuitive way. In addition, it has the capability to export through a specific application using a tool called "LCCS tool" that results in XSD format and can be converted into a proper UML schema or ingested into a system for advanced queries of the derived database.
The implication of the adaption of this methodology into a national system is much smoother and easier. It gives freedom to the potential users to innovate their data production and management. Users have the flexibility to create legends from the National Land Representation System based on their own requirement. The experience shows that the transition between two traditional legends is more complicated and difficult than the introduction to the LCML/LCCS method into a national system. But the methodology needs different levels of expertise to function in a proper way.

3 National Land Representation System of Bangladesh

3.1 Context

In Bangladesh, the information about land cover and forest inventory serves multiple purposes, such as commercial uses, natural resources management and conservation, climate change mitigation, tracking of greenhouse gas emissions, etc. Various agencies develop land cover maps for a range of purposes, by making use of remote sensing and ancillary data (Shaheduzzaman & Akhter, 2013). Apart from the inherent differences in organizational objectives, dissimilarities in methodologies, boundaries, definitions, classification systems, varying means and capacities altogether limit the utility and comparability of land cover maps across time, space and organizations. In brief, organizational differences are highly manifested not only in the end products but also in the processes involved. In consequence, the use of different land cover maps and their integration into one system is very limited.
Therefore, there is a long-standing data integration problem in Bangladesh in the domain of land cover mapping: how to reconcile semantic differences between classification systems. This hinders for example comparative analysis of multi-temporal mappings (i.e., change detection). The need to improve the interoperability between datasets can be achieved by overcoming differences in data semantics. It is thus expected that the harmonization of the existing classification systems and development of normative one based on a standard land representation system will help to reduce the reporting burden, thus reducing costs and in some cases also improving the quality, robustness, completeness and transparency of the information.

3.2 Development Process

The NLRS is the result of several processes of data collection, translation, analysis and the identification of the gaps of existing land cover/use mapping processes. This process started in 2013 and was finalised in 2016. The legends of existing national land cover/use maps were collected, documented and translated using LCML. This first step allowed the identification of the gaps of existing legends and identification of the meaning of the land feature classes considering the objective of the institution involved in the land cover map development.
The first training and national workshop on land classification system was held in Dhaka in 2013. Several documents were developed to support the documentation of the existing land cover mapping activities in Bangladesh (Shaheduzzaman & Akhter, 2013). In 2015, the second training on LCCS was organized to present and train representatives from various national institutions the new LCCS v3 (FAO, 2015).
In collaboration with the Bangladesh Forest Department, from over 1000 locations, field data have been collected by Bangladesh Society of Geoinformatics (BSGI) and Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) all over the country. The objective of this field data collection was to collect field ground data using a specific manual (BSGI, 2016) in order to develop the NLRS. During the process of the NLRS development, the field ground data are used to characterize the national classes. In March 2016, the national workshop for the development of the NLRS was organized. With the contribution of experts from Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Bangladesh Forest Department (BFD), Bangladesh Institute of Planners (BIP), Bangladesh Society of Geoinformatics (BSGI), Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO), Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), National Land Zoning Project, Ministry of Land (MoL), Survey of Bangladesh (SoB)

and Soil Resource Development Institute (SRDI) a draft national land representation system for land cover/use mapping was developed. The flexibility and comprehensiveness of the system to accommodate and integrate all possible national classes were recognized during a national consultation (held right after the workshop) with the stakeholders in March 2016 (Hadi et al., 2016). Figure 1 shows some pictures from different development phases of NLRS development.

(a) Training workshop on land cover classification (March2013)

(b) Training on LCCS and field data collection for development of NLRS (December 2015)

(c) Working session on land cover classification system development (March 2016)

(d) National consultation workshop on land cover classification system (March 2016)

Figure 1 Different development phases of National Land Representation System

3.3 Overview

The NLRS is not just a simple legend rather it is a more comprehensive structured list of categories that provides a solid reference to many mapping activities. In the past a "Representation System", when presented, had a static list of classes in the best case ordered according to simple hierarchical levels. A standard system should represent and affirm the minimum amount of information (classes list) that any national mapping activity is expected to provide at national level. Different mapping agencies dealing with different mapping activities can refer to the "Representation System" to apply the minimum set of classes necessary at national or local level or to further expand the system to create specific application derived extra information.

The whole logic of the system is based on an "object oriented" approach. Each of the categories populating it is constructed according to the ISO standard FAO LCML (Land Cover Meta Language). The LCML/LCCS v.3 syntax works by making available a set of basic standard LCML "object" (called LCML "elements", for instance trees, shrubs, buildings etc.) that can be organized in strata and can be enriched with different types of

"attributes". These LCML elements act as standardized building blocks and can be combined to describe the more complex semantics of each LC class in any separate application ontology (classification system). Each LCML derived category is represented in a modelling language (UML) that in one side make easier and more accurate the description of the "real world" features and on the other side easier the understanding of their ontology and more efficient their utilization in an advanced GIS modelling environment.
For each one of the classes instantiated in the system an LCML/LCCS v.3 instantiation model exist (in graphical and XSD format) (Figure 2Figure 2) and it is stored in the National Land Representation System Digital Registry. Therefore when any national (or international) institution wants to use those classes they just need to refer through the map code to the registry both for the class description and for any other advanced modelling and GIS operations that require the use of XSD Mark-up language.

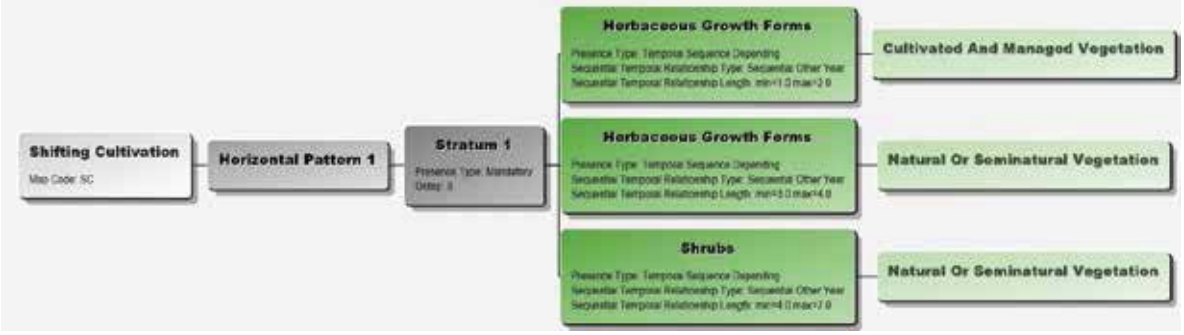

Figure 2: Model representation of the graphical format of the class "shifting cultivation"

The classes instantiated in the system are the "essential" one when considering a basic Land Cover data base at national level. However, they must be considered as a kind of "Meta Classes" that can be further expanded according to the needs of specific applications that would require an increased amount of information. The present model fully supports and guides this expansion. The grey boxes show the extra attributes that can be added to the model basic "Meta Classes" (Figure 3Figure 3). Figure 3Figure 3 presents examples of the attributes (grey boxes) that can be used to further expand the thematic content of the system "Meta Classes" (in this specific example general class "Natural Vegetation" or a more detailed class "Forest"). Such list of attributes is a guide to harmonize the further class enrichment and is open ended.

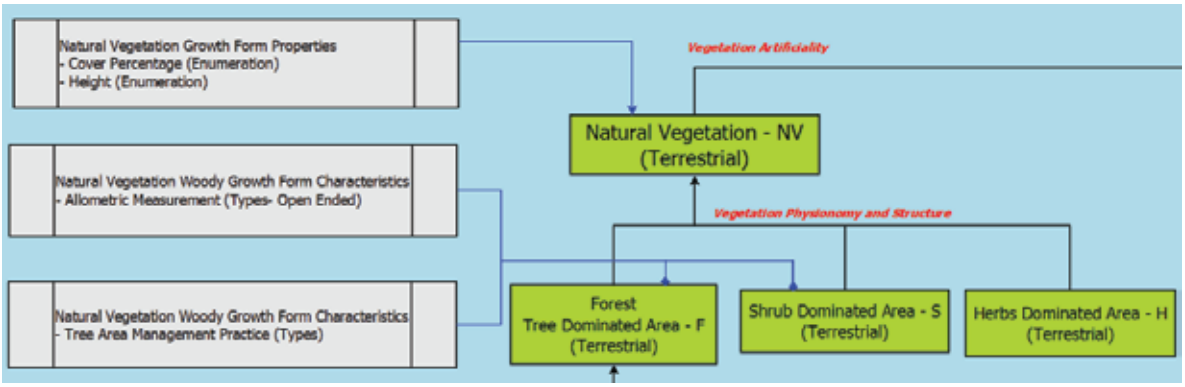

Figure 3: Example of attributes

NLRS of Bangladesh is divided into 7 distinct levels for the complete understanding of all the land features in Bangladesh. These levels are generated with the help of LCCS v3. Each of these levels come from one master category and are further granulated for identifying more distinct land cover which is how a hierarchy of legend

has been developed (Figure 4). Level 1 consists of two classes 'Vegetated' and 'Non-vegetated'. Level 2 consists of four classes dividing the former classes based on presence of water. Level 3 consists of total 8 classes based on artificiality of the previous classes. Level 4 and level 5 includes 21 and 24 classes, respectively, where most of the classes are in vegetated category. Level 6 includes 10 classes and level 7 has 5 classes which are basically the extended class from upper ones.

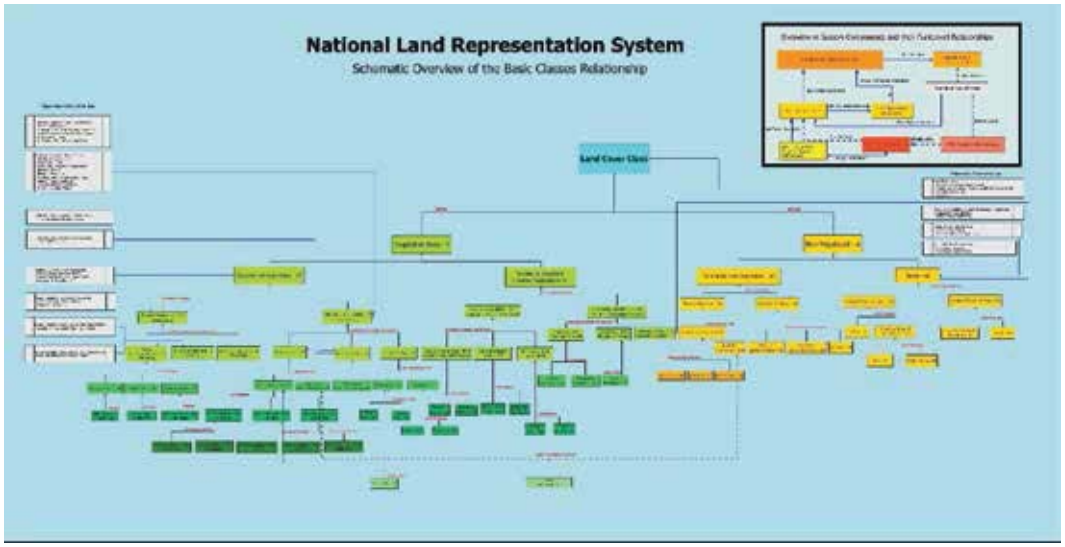

Figure 5: The major structure of the national land representation system of Bangladesh

4. Land Cover Map 2015

SPOT 6 satellite imagery of 2015 was used for the development of land cover map under Forest Department. Considering the resolution of the imagery and NLRS a classification system has been developed (Figure 6Figure 6) to use the satellite imagery for the development of land cover map for 2015 (Figure 7Figure 7). Followings are the legend and land cover map 2015 that was validated with over more than 14000 samples plots using google earth by engaging the organizations mentioned above through an extensive workshop.

Figure 6: National land cover map legend

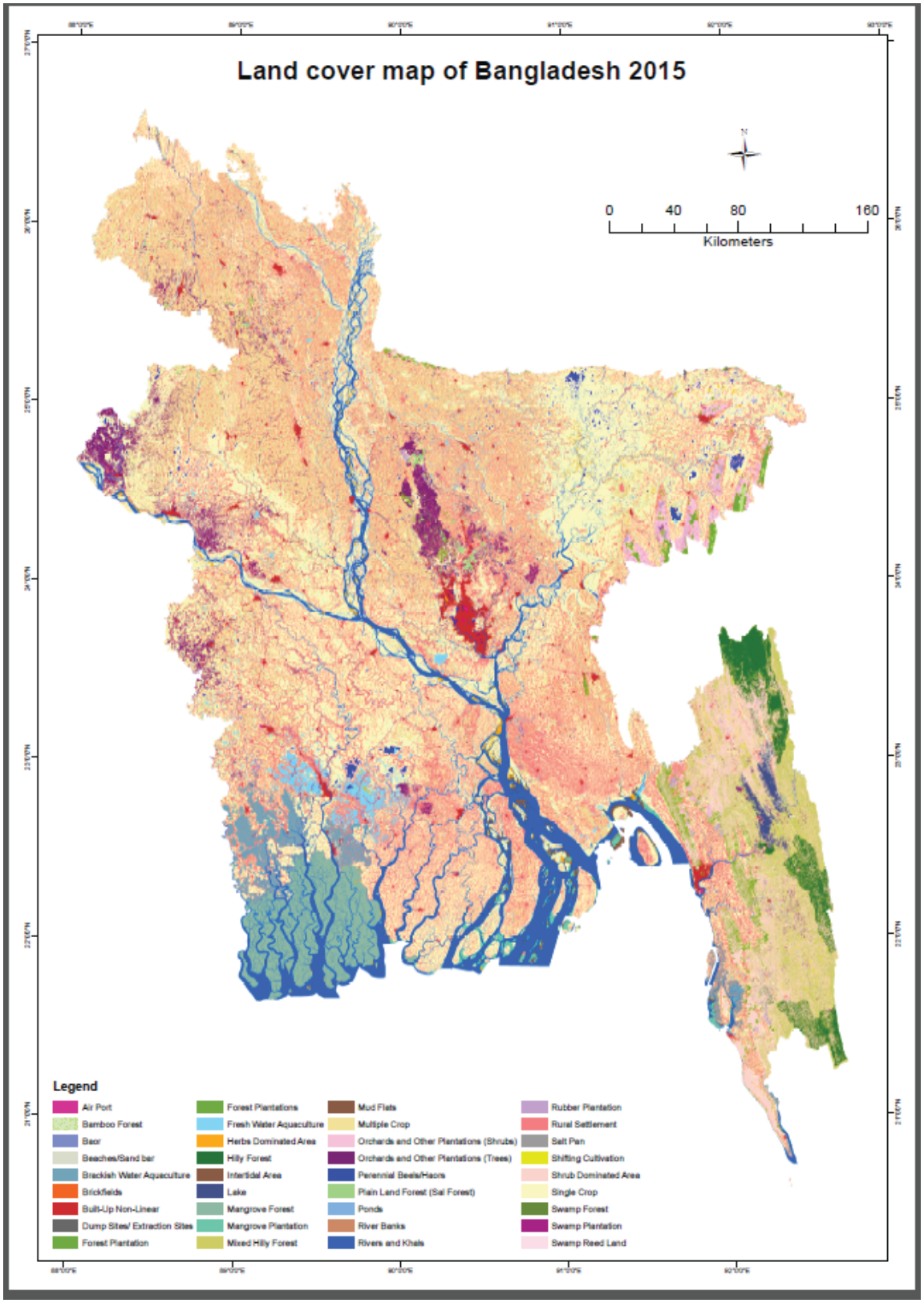
Land cover map of Bangladesh 2015
N
0
40
80
160
Kilometers
Legend
Air Port
Bamboo Forest
Baor
Beaches/Sand bar
Brackish Water Aquaculture
Brickfields
Built-Up Non-Linear
Dump Sites/ Extraction Sites
Forest Plantation
Forest Plantations
Fresh Water Aquaculture
Herbs Dominated Area
Hilly Forest
Inter'tidal Area
Lake
Mangrove Forest
Mangrove Plantation
Mixed Hilly Forest
Mud Flats
Multiple Crop
Orchards and Other Plantations (Shrubs)
Orchards and Other Plantations (Trees)
Perennial Beels/Haors
Plain Land Forest (Sal Forest)
Ponds
River Banks
Rivers and Khals
Rubber Plantation
Rural Settlement
Salt Pan
Shifting Cultivation
Shrub Dominated Area
Single Crop
Swamp Forest
Swamp Plantation
Swamp Reed Land

5. Conclusion

The NLRS of Bangladesh represents the structural form that has been developed as a complete classification system in order to describe the features that are most likely to be found in Bangladesh. The present system tries to instantiate all these basic requirements in a logical innovative framework that is tailored and fine-tuned for Bangladesh. To better understand the overall concept of the system it is important to analyze its overall structure and the functional relationship of the different elements that represent it.

The NLRS can represent all past, present and future legends in a harmonized way. It is expected to be the foundation for building sustainability in land cover assessment and monitoring in Bangladesh allowing comparability between maps developed by different agencies and for different purposes. The dynamic nature of the land cover system of Bangladesh makes it hard to keep tracks, but the NLRS has the potential to ease the process not only at present but also in the near future. The system has been designed to be flexible enough to be adapted to all specific in-country needs. In addition to the creation of specific legends for specific applications, the system has also been used as a reference bridging system to compare classes belonging to other existing classifications. The system was served in determining the legends for developing the Land Cover Map for 2015.

6. References

Akhter, M., & Shaheduzzaman, M. (2013). Forest Classification Systems in Bangladesh. Retrieved from

BSGI. (2016). PROTOCOL FOR LAND FEATURES DESCRIPTION IN BANGLADESH: Data Collection Field Manual. Retrieved from

Di Gregorio, A. (2016). Land Cover Classification System, User Manual, Software Version 3. Retrieved from Rome, Italy:

FAO. (2015). Proceedings for the training on national land cover classification systems using LCCS 3, Bangladesh Bureau of Statistics, Agargaon, Dhaka, 29 November – 3 December.

Hadi, A., Udita, T., & Jalal, R. (2016). Proceedings of the National Consultation Conference on Land Cover Classification System in Bangladesh. Retrieved from

Shaheduzzaman, M., & Akhter, M. (2013). Proceedings of the Training Workshop on Land Cover Classification in the context of REDD+ in Bangladesh, Forest Department, Dhaka, Bangladesh 24-25 March 2013. Retrieved from.

বৃক্ষ ও চট্টগ্রাম শহর

জয়দীপ দে

বাংলোর বড়ো পাল্লার জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখার সেই দিনগুলো ছিল অন্যরকম। তপ্ত মাটির বুকে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটটা যখন পড়ত সোঁদা গন্ধে চারদিক উন্মাতাল হয়ে উঠত। একটা হালকা প্রশান্তি এসে সারা শরীরে বিলি কেটে যেত। তারপর ঝিরঝির থেকে ঝুমঝুম। দেখতে দেখতে নলি শাখের মাঠটা ডুবে যেত বাদামী জলে। কলকে ফুলের গাছগুলো বখাটে ছেলের মতো বেকেচুঁরে কোন প্রকার দাঁড়িয়ে থাকত বাতাসে। টিনের চালে কী অদ্ভূত তালে-বাধা একটা আওয়াজ হতো। একধরণের অবসন্নতা পেয়ে বসত। ঘোলা জলে চারদিক থৈ থৈ করত। তখন দূর্গাপুজোর সময় মেলা বসত মণ্ডপে মণ্ডপে। সস্তা দামের পৌরাণিক বইগুলো আমাদের কিনে দেয়া হতো। এতো জল দেখে নিজেদের বাসাটাকে বেহুলার ভেলা বলে মনে হতো। কত অদ্ভূত অদ্ভূত জিনিস না ভাবতাম!

জলের ওপর তখন প্রদীপের মতো ভেসে বেড়াত নাল-নীল ফুলের ঝাঁক। আমাদের পাশের বাসায় একটা বিরাট কৃষ্ণচূড়ার গাছ ছিল। প্রতিবার বৃষ্টি এলে এর ডালপালা ছাটিয়ে দেয়া হতো। বস্তির বাচ্চারা এসে এর ডাল নিয়ে হুটোপুটি লাগত। একবার এমনি এক বর্ষায় বড়ো বড়ো করাত নিয়ে কতগুলো লোক এলো ওই বাসাতে। তিন-চারদিন ধরে একটানা শুধু কাটতেই লাগল। আমি তো দুঃখে আধমরা। চৈত্র্যের দাবদাহের সময় কে পাঠাবে হু হু বাতাস। কে আমাদের বাসার পেছনটা আগুনের রঙে লাল করে রাখবে। কে ভাসাবে বৈশাখের বৃষ্টিতে বাসন্তী দীপাবলী। মা তখন আমাকে শান্তনা দিতেন। 'গাছেরও তো প্রাণ আছে; দেখিস একদিন কৃষ্ণচূড়ার অভিশাপ লাগবে...'

বাবা সবসময় বলতেন তুলরাশির মানুষের কথা নাকি অক্ষরে অক্ষরে ফলে। মা তুলারাশির জাতিকা। তাই মা'র সব শান্তনা-অভয়বাক্যকে চিরকালই ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবেই মেনে এসেছি। কিন্তু এই কথাটা যে এভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলবে কখনো ভাবিনি।

আসলেই তো এ শহরে কৃষ্ণচূড়ার অভিশাপ লেগেছে। এখন পুরোবাসীদের কাছে বৃষ্টি আর বিলাস নয়। বৃষ্টি এক মূর্তমান আতংকের নাম। এই বুঝি পাহাড় ধসে পড়ে। এই বুঝি আটকে যায় নর্দমাগুলো। এই বুঝি জল উঠে আসে রাস্তায়। এই অভিশপ্ত নগরে এখনো দুয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখি। সেদিন টাইগারপাস মোড়ে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখলাম। বিজ্ঞাপনের বাক্সে ভেতর আটকা পড়ে আছে বেচারী। আর কিছুদিন পর বিজ্ঞাপনটা বসে গেলে লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাবে সেও।

রেল স্কুলের পেছনে তখন দেয়াল ছিল না। আসলে দেয়াল দিয়ে আব্রু করার মতো অবস্থা তখনও হয়নি। আদিগন্ত পাহাড়ের সারি। তার ওপর ঝাকঁড়া চুলের রেইনটিগুলো। কার লাজে কাঁচুলি টানবে গিরিনন্দিনী? তাই উতাল হাওয়ায় নিঃশঙ্কোচে দু'হাত ছড়িয়ে দিত লাল দালানটা। দূর থেকে দেখে স্বপ্নের মতো মনে হত। কতবার এ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল এনথাম গাইতে গিয়ে আনমনা হয়ে গেছি। কিংবা ক্লাসে বসে উদাস হয়েছি ফালগুনের হাওয়ায়। বই পড়িনি, পড়েছি প্রকৃতি। ত্রিকোণমিতি মাথায় ঢুকেনি, কারণ তার আগেই যে ত্রিভূবন ঢুকে বসে আছে। এই বুড়ো বয়েসে এসেও লোকের কাছে কথা শুনি পড়ার জন্য। পরিবারের সবাই কত কি হয়ে গেছে; তুমি কি হলে। আসলেও- আমি কি হলাম। আমি তো সেই গুটিপাম গাছটা হতে চেয়েছি-লাম। যে আমৃতু অপলক তাকিয়ে থাকবে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে। হলাম কই আর। এর সব দায় আমার ওই লক্ষীছাড়া স্কুলটার।

স্কুলের পেছনে ছোট্ট ছড়া। জলে-কাদায় থিকথিকে। একটু বর্ষা পেলে তার গর্জন দেখে কে। মাদী হাতীর মতো শূড় তুলে ছোটে। টিফিন ব্রেকে প্রায় আমাদের একটা মজা হতো। সেই ছড়ার ওপর মোটা একটা লোহার পাইপ ছিল। বড়ো হয়ে জেনেছি এই পাইপ দিয়ে শোধনাগার থেকে জল এনে কলোনিতে ছাড়া হতো। যারা খুব দক্ষ ছিল দুহাত ছড়িয়ে সেই পাইপের ওপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে পার হয়ে যেত। যারা ভয় পেত, তাদের জন্যও একটা উপায় ছিল। পাইপের ওপর বসে পাছা-পিছলা দিয়ে দিয়ে অনায়াসে পার হওয়া যেত পাইপটা। ছড়াটা পেরুলে আর চিন্তা নেই। একটু চরাই বাইলে জমজ দুটো গুটিপাম। বুক পর্যন্ত সাদা মোজা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে সান্ত্রীর মতো করে। কাছে এলেই কুর্নিশ করে স্বাগত জানাবে গিরি-কান্তার দেশে।

সে এক স্বপ্নের দেশ। একটা পর একটা ছোট বড়ো টিলা। বাঁয়ে স্বচ্ছ স্ফটিক জলের ধারা। সাদা বকেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। ঝিল পেরুলেই কেরেস্তানদের এতিমখানা। পাশে বড়ো একটা পেয়ারা বাগান। ধরা পড়লে মালী ব্যাটার প্যাঁদানি। স্কুলে রিপোর্ট। কি দরকার বাপু ওদিকে যাওয়ার। আমরা সোজা এগুই। আমাদের পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূর্যও যেন পা বাড়ায়। চড়ে উঠে রোদ। কমলা আলোয় ভেসে যায় চরাচর। রোদ যতই চড়ুক মেয়েলি লাবণ্য তার গা ছাড়া না। একটা স্নিগ্ধ নরোম ভাব। সারাদেশ ঘুরে এই রোদ আমি কোথাও দেখিনি।

সহকারী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা। সেল: ০১৭২৭৭৭৭৯৪৪

হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটা সরু পথের ধারে এসে থামে। সেই পথটা পেরুলেই কাশবন। তারপর আবার পাহাড়। পাহাড় ঢেকে আছে ছনের ঘন-রহস্যে। দেড় মানুষ সমান ছন ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে গেলে খুব সাবধান। একটু অসতর্কতায় খুরের মতো আঁচড় কাটবে গায়। চোখ বন্ধ করে খুব কায়দায় পা ফেলতে হয়। এভাবে দুটা পাহাড় পেরুলেই তুমি বাকহারা হয়ে যাবে। কি দরকার মেরুজয়ে বেরুবার। কি দরকার এভারেস্টের। এর চেয়ে কম আনন্দ নেই এখানে। দেখবে টলটলে জলের একটা স্বচ্ছ সরোবর। রহস্যঘেরা পাহাড়গুলো থমথমে মুখ নিয়ে উঁকি মারছে সেই জলে। একটা মিষ্টি বাতাস এসে তোমাকে হামি খাবে। তোমার ইচ্ছে হবে এখনই সেই জলে ডুবে মরতে।

সিকি শতক শেষে আবার রেল স্কুলে যাই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। যে রেল স্কুলকে খুঁজে পাওয়া যেত রেইনট্রির ঠাসবুনটের মধ্যে লাল টুকটুকে একটা বোতামের মতো সেই রেল স্কুল একটা নিঃসঙ্গ ন্যাড়া পাহাড়ের উপর মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে জোড়া ড্যাবা ঘিরে রেইন ট্রি'রা যে সখীনৃত্য করত তারাও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমার শৈশবের শহরতলীটা আজ বড়ো বিবর্ণ। বৃক্ষহীন একটা বিরাটায়তন বস্তি।

Whatsoever thing and loathsome, thatsover thing and slimy. Whatsoever thing are stinking, sickening, ghastly, oozy, decaying and decayed, morbiferous, feculent, miasmatic, matarious and repulsive- these things abound. And over everything steadily, slowly, pitilessly, drenchingly, comes down by night and by day the dull, deadly rain like a pall covering the flaccid corpse of the soil.

১৩৭ বছর আগে এরকমই এক বর্ষণ মুখর আগস্টের রাতে বর্ষা-বন্দি এক ইংরেজ সাহেব নিঃসঙ্গ বাংলোয় বসে তার বাল্য বন্ধুকে লিখছিলেন চট্টগ্রামের বৃষ্টির কথা। ভদ্রলোক হোমসিকনেস আর অনভ্যাসতার কারণে হয়ত চট্টগ্রামকে 'চিটাগং দা লোথসাম' লিখেছিলেন। কিন্তু আজ সত্যি সত্যি বর্ষায় চট্টগ্রাম 'লোথসাম'। আমার মতো এই নগরীর লোকজন এখন বর্ষায় ঘর থেকে বেরুতে ভয় পায়। আবার ঘরে থাকতেও। উভয় সংকট। অথচ আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগেও আমরা এসব কল্পনা করিনি। যদ্দুর মনে পড়ে ২০০৭-র ১১ জুন বড়ো একটা চপেটাঘাত দিয়ে প্রথম নগরবাসীকে জাগাল প্রকৃতি। সেদিন প্রবল বর্ষণে সোয়া শ'মানুষ মাটি চাপা পড়ে মারা যায়। এক ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে নগরীতে। তারপর সে নিয়ে অনেক লেখালেখি কাটাছেঁড়া হয়েছে। কেউ দোষ ধরে পুলিশের, কেউ প্রশাসনের, কেউ কর্পোরেশনের। আমি তখন দৈনিক প্রথম আলোয় একটি লেখা লিখেছিলাম। শিরোনাম ছিল: 'সে আমারই পাপ!' একটা মাত্রা পর্যন্ত আইন অমান্যের প্রবণতা থাকলে আইন প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আইন অমান্যের প্রবণতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, তখন আইনই বাতিল বলে গণ্য হয়। এই শহরের অবস্থা এখন সেই পর্যায়ে। যেদিকে চোখ দেবেন, আইন কানুন নীতি নৈতিকতার বালাই নাই। সবাই মিলে বিবেকবর্জিতভাবে এই শহরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।প্রকৃতি যখন এই নিয়ে হঠাৎ মাথা চাড়া দেয় তখন সবাই রে রে করে ওঠে। এর দিকে ও অভিযোগের তীর ছুঁড়ে। আর ওর দিকে এ। পুরো একটা ব্লেমগেম। কিন্তু সব ব্যাটা অপরাধী। যখন আর দোষী ঠিক করা যায় না, তখন সিটি কর্পোরেশনের ঘাড়ে। বলছিলাম বিমস সাহেবের কথা। চট্টগ্রাম ডিসি অফিসের সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের মানুষকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তার লেখার ছত্রে ছত্রে চট্টলাবাসী নিয়ে গালমন্দ। অথচ দুর্মুখও চট্টগ্রামের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এক জায়গায় এভাবে লিখেছেন: ... আর এ সবের মাঝে সতেজ সব বৃক্ষ, পাম, বট, আম ও অন্যান্য গাছ, বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীর লতা আর ঘন আগাছা। মাঝে মাঝে কালো বদ্ধ জলাশয়। এই নিচু এলাকার উত্তরে কিছু পাহাড়, যে গুলির মাঝে বয়ে যাচ্ছে ঝরণা। প্রতিটি পাহাড়ে ঘিরে থাকা ক্যাসুরিনার (শিরিষ) মাঝে একজন ইউরোপিয়নের বাড়ি। পাহাড়ের ঢালটা টারমানিক প্লান্টে ঢাকা। এ ছাড়াও আছে বিশাল একটি আদালত, পাবলিক অফিস, বড়সড় একটি প্রোটেস্টান্ট গির্জা, স্কুল এবং পোস্ট অফিস। এসব বেলে পাহাড় ফুঁড়ে এখানে-সেখানে উঠেছে সতেজ পানির ঝরণা যা অধিবাসীদের খাওয়ার পানির চাহিদা মেটায়। আর সে কারণে প্রত্যেক মালিক সীমানা দিয়ে তা ঘিরে রাখে। এসব পাহাড় চুড়ো থেকে যতদূর চোখ যায় দেখা যায় উর্বর সমতল। দিগন্তে চমৎকার নীল পাহাড়ের সারি। এত চমৎকার দৃশ্য এর আগে আমার চোখে পড়েনি। (কোই হ্যায়? পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান/ মুনতাসির মামুন)

কি, গা'টা শিউরে উঠছে? মনে হচ্ছে কোন স্বর্গোদ্যানের বর্ণনা পড়লাম এতোক্ষণ। এই আমার আসল চট্টগ্রাম। আসুন পুরো তো সম্ভব হবে না, যতটা সম্ভব প্রিয় চট্টগ্রামকে তার আপন প্রকৃতির মতো করে সাজিয়ে তুলি। সে নিরাপদ থাকুক, আমরাও।

Potential of rubber wood- as a source of timber

Dr. Khurshid Akhter

Rubber (Hevea brasiliensis Muell Arg.) trees are extensively grown in about 30 countries of the world for the production of natural rubber. Rubber plantations are confined to tropical and subtropical regions making a total area of about 90,000 km2, of which 91% present in Asia, 6% in Africa and 3% in Latin America. Malaysia, Indonesia and Thailand are accounts for about 75% of the global rubber plantations. Rubber trees are mainly raised for the production of natural rubber. But after 30-35 years, latex cannot be collected economically from the rubber trees. Then the production decreases gradually and during re-plantation, a considerable quantity of rubber wood are obtained.

In Bangladesh, Rubber tree was first introduced in 1910 to the tea gardens of Fatikchari upzilla in Chittagong and Sylhet district. In 1954, rubber plantation was made by Forest Department at Madhupur of Tangail, Hazarikheel of Chittagong and Tetulia of Panchaghar districts. In 1960 plantation was established by Forest Department in Raozan of Chittagong and Cox's Bazar districts. In 1962, plantation of rubber tree was handed over to Bangladesh Forest Industries Development Corporation (BFIDC), and further plantations was made in Chittagong, Sylhet, Tangail and Sherpur regions.

Up to 1997, BFIDC comprises of 13,212 ha. of rubber plantation in 16 rubber states . So far, 20 different clones of rubber have been introduced in Bangladesh through but grafting of high yielding variety mainly of Malaysia (Rashid, 2006). Chittagong Hill Tracts Development Board (CHTDB), several multi-national companies and private entrepreneurs raised rubber plantations from1962 to 2007. Until 2005, all these organizations raised about 27,386 ha. of rubber plantation in the country.

Rubber Plantation

The potential of rubber wood as a source of timber has already been recognized in India, Sri Lanka and Indonesia. In Malaysia, an increasing volume of sawn rubber wood is being used for furniture manufacturing and other applications. Research was carried out at Bangladesh Forest Research Institute (BFRI) to determine the different properties and improve the quality of rubber wood. For its end uses different properties like seasoning, machining and hand tool, finishing, strength, veneering, plywood and particle board making etc. were determined.

Chief Research Officer, Forest Products Wing, Bangladesh Forest Research Institute

Rubber logs

The wood possess excellent properties for interior designing, wood working and furniture making due to its attractive light colour, beautiful grain structure, smooth finish and light weight Compared to Indian and Malaysian rubber wood, The wood of this tree is marketed for a wide variety of end products, such as furniture, parquet, paneling, flooring, wood based panels and indoor building components, as an alternative timber species .In addition to latex and wood production, rubber trees also play an important role in carbon sequestration. The major problem in rubber wood utilization is its low durability. In natural state, rubber wood is highly susceptible to insect and fungal infestations due to its high starch content.

The high humidity in Bangladesh possesses a severe sap stain and mold problem in rubber wood. Additionally, the moisture content of timber provides conductive conditions for the entry and establishment of the fungus . A wide variety of fungi causes decay of rubber wood. The causal sap stain fungus Botryodiplodia theobromae while typical genera of mold fungi have also been identified . It was reported that the optimum temperature was 30o c for the initial establishment and growth of B. theobromae . No growth was found at 50oc and 60oc. But fungus could tolerate and survive at high temperature once it was established inside the wood. It was found that the natural durability of rubber wood is poor. It can withstand only 6-9 months in stake yard test. Preservative treatment is therefore necessary to protect the timber from wood degrading agents during service.

The texture of rubber wood is fairly even and medium course with moderately straight and slightly interlocking grain. the wood is whitish yellow when freshly cut and turns to light straw or light brown with occasional light pinkish tinge as drying progresses. The wood is soft to moderately hard, light to moderately heavy with average weight of about 515 kg/m3 (32 lbs/ cu.ft) at 12% moisture content. The wood is diffuse porous in appearance. The sapwood and hard wood are indistinguishable by colour. Wood is pale yellowish while on fresh cut, becoming brownish or cream to reddish brown on exposure with darker streaks at the irregular interval.

The wood of this tree is marketed for a wide variety of end products, such as furniture, plywood particle board and indoor building components. It was stated that rubber wood could be utilized as raw material for ply wood and particle board manufacture. Rubber wood is easy to work in sawing and machining. It is also suitable in narrow gauge band saw blade which is widely used in sawmilling sector of Bangladesh. Rubber wood has acceptable working properties ; planning, shaping, boring, mortising and turning. Other tests of planning, shaping boring, mortising by carpenters hand tools show excellent working qualities. The results indicate that rubber wood can be used for manufacture of furniture. It has an extensive use in doors, windows, house constructing and furniture. Sawn timber from the rubber plantation of Bangladesh Forest Industries Development Corporation (BFIDC), are being used for making furniture.

Half secretariat table

Two seated sofa

Seasoning is the most important and effective measure for wood protection and utilization of wood. Due to the presence or movement of moisture in wood, different stresses are developed in different parts of the wood. Consequently, cracks, shrinkage, warping etc. are developed in the material and hence it is necessary to maintain the moisture to a uniform level throughout the timber and equilibrium with the external condition of humidity. In Bangladesh, the equilibrium moisture content of wood attains as low as 10% during the winter and goes up to 18% during the monsoon season. As such, considering the whole year, timber is said to be properly seasoned if it is dried to about 12 – 14% moisture content

Rubber wood can be seasoned well in both air and kiln drying method. It is found as moderately strong. Freshly felled sawn rubber wood contains moisture 100 to 150 %. Moisture content of sawn timber lowers down gradually up to 12 –14 % for making furniture and construction material. Different wood drying methods such as air, kiln and solar drying are practiced in BFRI for seasoning of rubber wood. Required times are 6, 20-25 and 45-50 days for kiln, solar and air-drying respectively. Rubber wood is medium dense timber and exhibits lower radical, tangential and volumetric shrinkage.

DOOR

WINDOW

Logs should be stored under water in log ponds if it would not be possible to process in sawmill within 3-4 days. A mixture of boric acid, borax and sodium pentachlorophenol are used for preservation of rubber wood but today pentachlorophenol not encouraged for lumber treatment since, it is highly toxic to human and animal, and strictly prohibited to some countries. For making indoor furniture from rubber wood, water borne preservatives by diffusion method are used. Borax or boric acid at 1-10% concentration can be used as preservative. To keep the rubber as fresh as sawn wood color, it should be treated immediately after sawing, otherwise stain may occur.

Rubber wood logs and planks can be prevented temporarily from early deterioration by spraying of mixture of 3% boric acid and 2% borax solution. For long time protection, rubber wood can be treated by diffusion, soaking and pressure process. Rubber wood is treated by CCB (copper sulphate, sodium dichromate, boric acid) solution when it is used in outdoor condition and treated by BB (borax, boric acid) solution when it is used in indoor condition.

Chair

Cushion Chair

Tapping of rubber trees starts in the fifth to seventh year after planting and continues for 25-30 years. The classical method for tapping is the removal at each tapping of only a thin layer of bark from the out end, thus permitting a smooth flow of latex and allowing the bark to regenerate. A special knife is used to incise the bark so as to wound the resin canals without damaging the cambium. However, improper tapping in smallholdings often has negative consequences for wood recovery. After 30 years, a decline in latex production renders further tapping of the trees uneconomical, although smallholders may continue for many years. The trees are then removed and replaced with new seedlings.

BED

Chest of drawer

Rubber wood is fine, straight grained and light yellowish to white in colour similar to the civit (Swintonia floribunda) or champa (Micalia champaca). In consideration to extractives, chemical components and water repellent property of rubber wood, the species may be suitable for indoor purposes, chemical pulping and conversion products. Based on working properties by machine and hand tools, mechanical properties using universal testing machine and other related equipment, furniture & construction material and other product were made. The properties were compared with different commercial wood and found closely comparable to gamar wood. It is suitable for furniture manufacture owing to its low shrinkage and good dimensional stability. Rubber wood can also be made durable by using preservative treatment. By using technology and following scientific procedure, the quality of rubber wood can be improved. Thus the potential use of rubber wood can decrease pressure on traditional timber species.

References

Akhter, K; De, B.C; Younus-uzzaman, M. 1994. Natural durability and treatability of rubber (Hevea brasiliensis) wood.

Akhter, K.; Salam , A. and Chowdhury, M. H. 2013. Natural durability and preservative treatment of rubber (Hevea brasiliensis) wood. Proceedings of Forestry technologies for capacity building. 18-19 February, 2013, Bangladesh Agricultural Research Council. Farmgate ,Dhaka-1215, Bangladesh

Ali, M. 1985. Bangladeshi Rubber Gaser Autit, Bartaman abong Bhabiswat (in Bangla). Rubber Bichitra. Yearly Journal of BFIDC. 73, Motijheel Commercial Area, Dhaka. 1-3

Basak, A.C. 1999. Diseases and disorders of rubber tree and their management. Bulletin. 5. Forest Protection Series. Banglsdesh Forest Research Institute, Chittagong. 14pp

Hasnin, et.al. 1992. Assesment of rubber wood (Hevea brasiliensis) for plywood and particle board manufacturing . Bulletin 6. Composite wood product series, Bangladesh Forest Research Institute, Chittagong. 8pp.

Hossain, A.T.M. Emdad. 2001. Effect of NPK fertilizer on the latezx yield of Hevea brasiliensis Muell.Arg. in the rubber estate, Ph.D. thesis. Department of Soil, Water and Environment. University of Dhaka.

Jamaludin, M.A; Midon, M.S; HoSo; Rahman,M.A; 2002 Strength of T-shaped furniture joints made from rubber wood (Hevea brasiliensis) and yemane (Gmelina arborea).Journal –of-Tropical-Forest-Prodicts.8:2, 143-159.

Khurshid Akhter (2005). Preservative treatment of Rubber Wood (Hevea brasiliensis) to increase its service life.Section –2 Process. 36 Annual Meeting, Bengalore, India. The International Research..Group on Wood Preservation .

Khurshid Akhter, Md. M. Rahaman, M. H. Chowdhury and Md. Zahirul Alam 2014. Development of composite furniture using bamboo strips, bamboo mat and rubber wood veneer Proceedings IRG Annual Meeting (ISSN 2000-8953) © IRG/WP 14-40679 Paper prepared for the 45th IRG Annual Meeting St George, Utah, USA ,11-15 May 2014.

Mohiuddin , M. 1993 Anatomical studies of rubber wood (Hevea Brasiliensis (Hbk.) Muell. Arg.) .Bangladesh Journal of Forest Science , Vol.22 Nos 1&2. 57-60.

Qasem, M.A; Hannan, M.O; Khaleque, M.A; Haque, M.S. 1981. Some machining properties of five hard wood of Bangladesh. Bano Biggan patrika. Bangladesh Forest research Institute, Chittagong. 10 (1&2) :1-7pp

Rahman, M.A.1988. Disease of Hevea brasiliensis in Bangladesh. Bano Biggan Patrica vol:17 (1&2). 74pp.

Sattar, M.A. 1995. Utilization of rubber wood: A timber from non-conventional source, Bangladesh Journal of Forest Science 24(1):1-6.

Md. Abdul Khaleque, 2010. POTENTIAL USE OF RUBBER WOOD AS FURNITURE AND CONSTRUCTION MATERIAL. Ph. D. Thesis. IFESCU. Chittagong University.

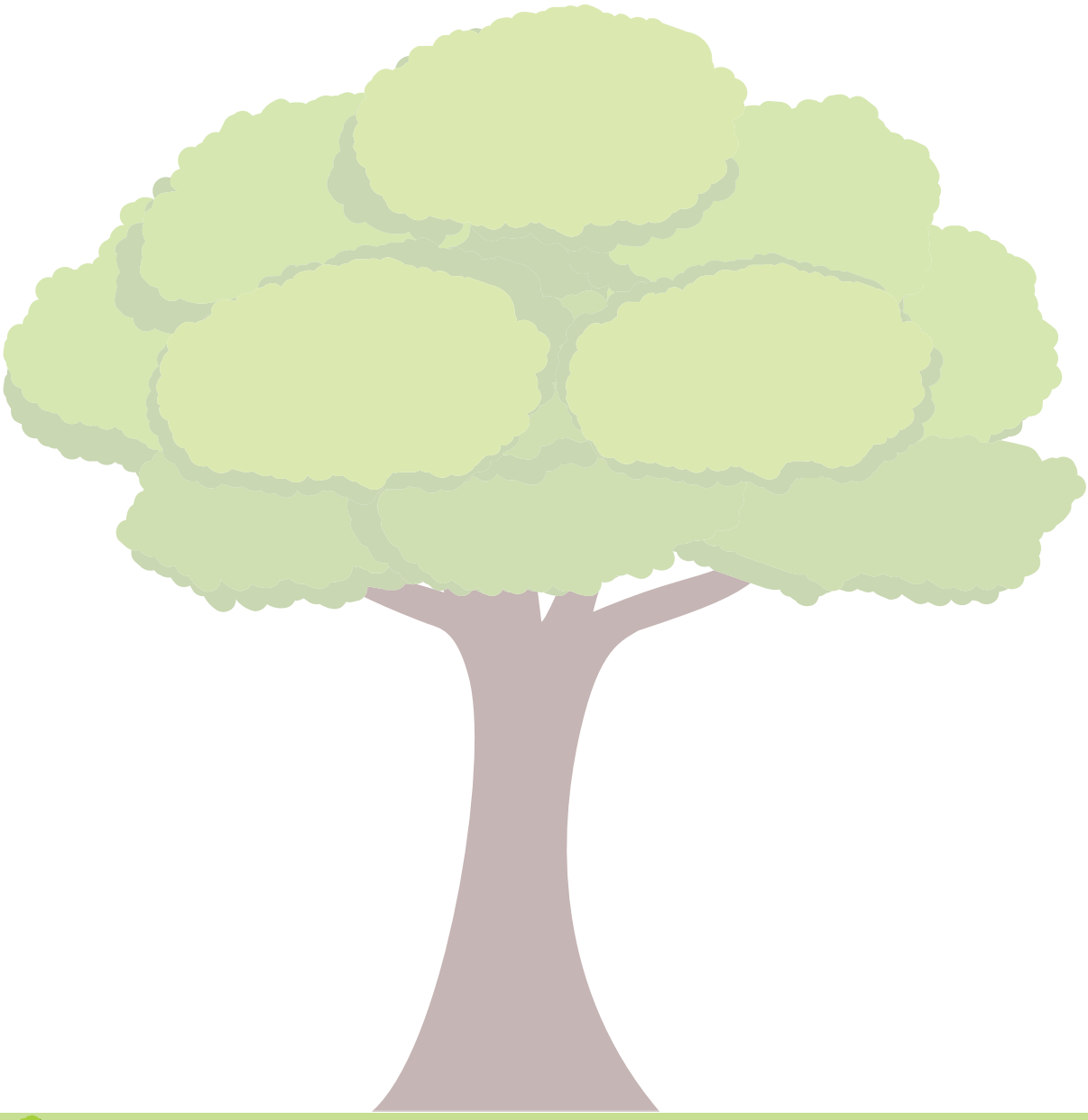

Importance of Zoonosis in Captive Wildlife Conservation

S M Golam Mowla

A zoonosis is any disease or infection that is naturally transmissible from vertebrate animals to humans. Animals thus play an essential role in maintaining zoonotic infections in nature. Zoonoses may be bacterial, viral, or parasitic, or may involve unconventional agents. Hotspots—areas with high biodiversity as well as high human population density—where zoonoses are most likely to be found. Jones and colleagues (2008) identified such hotspots in Figure-1: By conducting "smart surveillance," researchers are able to target their resources and efforts in areas where human–animal interaction is most likely to provide conditions favorable to zoonoses.

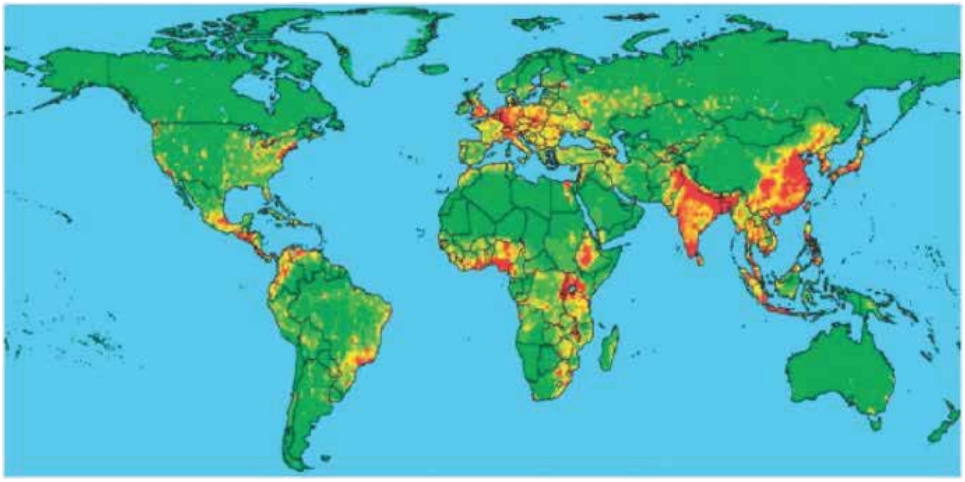

Figure- 1: Emerging infectious disease hotspots. Hotspots are indicated in red and include areas of high biodiversity and high human population density, which may correlate to high connectivity between humans and wildlife. **SOURCE: Jones et al. (2008).**

Drivers of Zoonotic Diseases:

1. International trade and travel: Inadequate inspection of cargos worldwide lead entry of infected animals, insect vectors, and diseased plant products undetected into geographic areas where natural parasites, predators, may be absent and host resistance is lacking.

A prominent example is the foot and mouth disease outbreak that devastated the UK in 2001. It originated from a container load of Chinese meat that was described as something else on the bill of lading. Millions of containers were unloaded at various ports around the world, but it was not possible for inspectors to peer into every one.

2. Global climatic image: It has been established that the occurrence of more spread of Vector-borne zoonotic diseases such as yellow fever and certain encephalitis is found as the geographic range of their mosquito vectors increases. Warming temperatures, considerably long rainy season and shorter winters play promising role in the establishment of the tropical diseases dengue and malaria in more temperate areas of the world.

3. Habitat destruction: The driving force of animal habitat destruction that is deforestation leads the wildlife reservoirs of zoonotic diseases to find their habitation to come into closer proximity with humans. The sudden emergence of Nipah virus disease in pigs and humans in Southeast Asia in the late 1990s may have been caused by rapid deforestation. The natural reservoir for Nipah virus appears to be fruit-eating flying foxes (bats in the

Divisional Forest Officer, Wildlife Management and Nature Conservation division, Chittagong.email:gmowlabfd@gmail.com

genus Pteropus).
As deforestation reduced their native food sources, flying fox populations were thrust into closer contact with commercial fruit orchards and fruit trees on pig farms, where the virus spread to pigs and then to humans. Recently in Bangladesh bats were found to be reservoir of Nipah virus.

4. Over population: As human populations increase and encroach upon wildlife habitat, people get more contact with wild animals and the diseases they carry. Population pressures increased the consumption of bush meat; as a result they are more exposed to infected blood and tissues during butchering.

5. Ecotourism: Tourism activities can introduce diseases to wildlife. Serious diseases such as malaria, measles, and tuberculosis were among those most likely to be transmitted to Primates by human visitors.

6. Food safety: A good number of emerging infectious zoonotic diseases threaten the safety of our food supply. The control of these diseases requires the collaborative efforts of various agencies. Veterinarians, public health and human health professionals all should continually work together in the trace-back and control of food-borne illnesses. Reducing the microbial load entering the food chain by implementing herd, flock and health initiatives reduces the challenge on food safety management systems and controls in food processing plants, commercial catering establishments and in domestic kitchens. Changing consumer lifestyles are creating a demand for more ready-to-cook and ready- to-eat meals, and this is adding more steps to the food chain, presenting more opportunities for things to go wrong.

7. Biodefence: There are some zoonotic diseases not familiar to the general medical community but these exist as potential agents of bio-terrorism against human populations. Zoonotic bio-terrorism agents need to be seriously considered as these can target agriculture, causing economic disruptions and undermining consumer confidence in food supplies.

The threat of bio-terrorism and emerging infectious diseases has stimulated various public health agencies to recommend promptly enhanced surveillance activities to supplement existing surveillance plans. Furthermore, the concept of agro- terrorism has also emerged, emphasizing the potential major risk that the economy of a country could be massively disrupted by the introduction of highly contagious infectious disease outbreaks into the livestock or wildlife populations.

The health of wildlife is directly linked to that of both domestic animals and humans. Diseases among wild animals can also provide early warnings of environmental damage, bioterrorism, and other risks to human health.

Disease outbreaks among wildlife are a complex enterprise, involving not only many steps, but also many fields of expertise, as illustrated in **Figure- 2.**

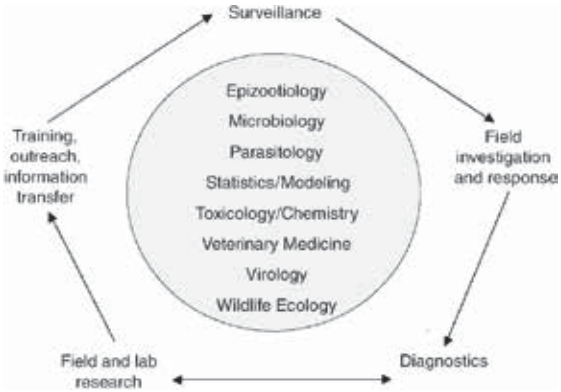

Figure-2: Complexity of disease investigation in wildlife populations. SOURCE: **Dein and Wright (2008).**

The complexity begins with the significant variation around the world in the ways humans interact with different kinds of wild animals. A primary difference exists between cultures whose subsistence depends on agriculture and wildlife, and in which direct contact is thus a feature of everyday life, compared to more prosperous societies, in which interaction takes place primarily in the context of leisure activities. Because some subsistence economies are directly dependent on animals for survival, disease outbreaks among wildlife can have a dramatic impact under these circumstances.

One Health Initiative:

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.

The interdependence of humans, animals, and their environment has never been more important than at the present time. In our global world, the free easy movement of people and animals has vastly increased, and along with it, there has been a corresponding exponential increase in the risk of exposure to zoonotic agents.

Current Scenario of Bangladesh Forest Department in Wildlife Conservation:

- ❏ At present under wildlife nature conservation circle Forest Department operating limited passive surveillance activities on few wildlife diseases with 05 (Five) wildlife hospitals throughout the country:
- ❏ 02 - at Safari Park (Gazipur & Cox'sbazar)
- ❏ 03 - at Wildlife Rescue Centers (Sylhet, Rajsahi and Khulna)
- ❏ 06 - wildlife veterinarians and one veterinary epidemiologist actively engaged with this activities

Wildlife Center: Being to be established by Forest Department through a world bank funded project - "Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection Project" and will act as a center of excellence for national wildlife conservation, education and research in future in the country.

Conservation practices in Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park, Dulahazra, Cox's Bazar :

To conserve wildlife from extinction, ex-situ conservation practices have been taken by Bangladesh Forest Department through protected area management like, Safari Park, Eco-park etc. Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park, Dulahazra, Cox's Bazar is the pioneer Safari Park of Bangladesh which was established in 1998 with an area of 900 hectares. With the major goal of serving the national need of biodiversity conservation education, research, recreation and in-situ and ex-situ conservation of the threatened, extinct and endangered animals.

Wildlife Population in Safari Park :

Class	Species	Captive population	Rescued and released
Mammal	23	138	675
Birds	21	59	
Reptile	9	150	141
Total	53	347	816

Contribution to Conservation breeding: While Safari park is the home of critically endangered, endangered and extinct in wild animals, Conservation breeding practices has been done to improve their population size & few of them breed successfully in captivity. Records are given below:

Class	Name of the Species	Number of offspring	Conservation status
Mammals	Asiatic Black Bear	2	Critically endangered (IUCN Red list, BD-2015)
	Royal Bengal tiger	2	Critically endangered (IUCN Red list, BD-2015)
	Asiatic Lion	5	Endangered (IUCN)
	Hippopotamus	5	Vulnerable(IUCN)
	Wildebeest	3	List concern(IUCN)
	Hog deer	3	Critically endangered (IUCN Red list, BD-2015)
Bird	Pea fowl	4	Regionally extinct(IUCN Red list, BD-2015)
Reptile	Salt water crocodile	20	Endangered (IUCN Red list, BD-2015)

Major out breaks in Safari Parks:

SL.No.	Name of Disease	Victim	Year of occurance
01.	Rabies	3 wildebeest died; Source of infection was Wild fox	2012
02.	Elephant Herpes virus	1 elephant calf (7 years old) died	
03.	Trypanosomiasis	1 lion calf died	2008
04.	New castle Disease	3 Emu Bird died	2011
05.	African Horse sickness	8 Zebras	Gazipur Safari Park
06.	Canine distemper disease	2 lion cubs died	Gazipur Safari Park

Most common diseases under passive surveillance are:

- ✓ Rabies,
- ✓ Anthrax
- ✓ Tuberculosis
- ✓ Avian Influenza
- ✓ Some parasitic Diseases

There are large water bodies in parks and every year a lot of migratory birds shelter here, so probability of outbreak of Avian influenza in the park is high.

Animal keeper or animal caretaker can be infected by directly or indirectly such as by handling diseased animal, secretion (feces, urine, and nasal dropping) from infected animals.

1. Salmonella infection by handling snakes and turtles.
2. E coli infection by handling wild animals where some of the animals are infected.

Vaccination schedule:

Sl.No.	Category	Disease Name
01.	Herbivores	I. FMD(Footh and mouth disease), II. HS(Hemorrhagic septicemia), III. Anthrax
02.	Carnivores	I. Feline pan leucopenia, II. Triquine (Blood protozol vaccine), III. Hexa dog (Canine distemper,Canine Parvo,Leptospirosis,Rabies,Canine Adeno virus,)
03.	Primates	I. Rabies, II. Tuberculosis.
04.	Birds	I. ND (Newcastle disease), II. Fowl Cholera, III. Mycoplasma etc.

Wildlife diseases may have profound effects on an ecosystem, or be evidence of threats to an ecosystem. Moreover, once a wild population has been depleted or eliminated, there is no mechanism for its replacement, as there would be for livestock.

Present Collaborative activities by Bangladesh Forest Department:

(a) With icddr,b:

- Jointly involved with an active surveillance program on Avian Influenza through a collaborative project-" Role of waterfowl in Avian influenza" from 2010 to 2012
- 1172 wild birds sampled and 0.33% (16) were found positive to Avian Influenza virus A

(B) With IUCN:

- Working with a recently launched (from 15th January, 2015 project) project on "Investigation of Wild to Domestic Bird Avian Influenza Transmission: Multi-year Monitoring and Surveillance Program".
- Main objective is to identify migratory patterns wild birds and to quantify the possible transmission of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) from wild to domestic birds.

(C) With Eco-Health Alliance:

- Jointly involved with active surveillance program in wildlife through Novel pathogen discovery program in high risk human-wildlife interface under PREDICT-2 and target species are wild rodents
- Bats and Rhesus monkey.
- Targeted Nipah virus surveillance in Fruit bats.

Challenges for Inter-sectoral collaboration:

- Poor wildlife disease diagnostic and surveillance facility: at present there is no wildlife disease diagnostic laboratory at national level and major constrain in wildlife disease diagnosis, surveillance and monitoring.
- Weak wildlife expertise and capacity: at present Forest Department has limited skilled technical staffs (veterinarians, epidemiologists, laboratory technician etc.) and resources for wildlife disease diagno sis, surveillance and reporting. Capacity building activities (staff training, infrastructure development, modernization of wildlife handling & restraining equipments etc.) should strengthen.
- Fund and technical support: to ensure equitability in partnership availability of funding source and technical support is needed for capacity development.

Requirements:

In Wright's view, a truly effective wildlife disease prevention program is critical to protecting human health. He identified the following requirements for establishing and sustaining such a program:

- Greater awareness and understanding of the importance of wildlife health;
- Substantial resources to build or improve capabilities;
- Mandatory reporting for wildlife diseases;
- Standardization of observations and reporting; and
- A global clearinghouse for reporting.

Wildlife disease reporting system:

Figure-3: Proposed structure for a wildlife disease reporting system. **SOURCE: Dein and Wright (2008).**

Dein (Dein and Wright 2008) suggested, however, that the existing infrastructure is "minimal" and that the challenge is not just to increase awareness of the ways in which wildlife can affect the health of domestic

animals and humans, but to broaden understanding of shared risk. He pointed out that new threats may come from a newly emerging virus or "some garden variety [pathogen] like tuberculosis or plague." He closed with the observation that "a lot of [the] technological issues are more easily overcome than the people issues, and the mission issues," such as the best way to share data, which data are most useful, getting permission to share them, and acting on them.

Opportunities:

- **Joint response and surveillance for EIDs:** Scope to work together with recently emerging Infectious diseases and zoonoses in country/region such as Nipah, Anthrax, Avian Influenza and Rabies.
- **Logistics, security, and finance**
- **Design and implantation of collaborative research:** Applied coordinated research could be conducted on zoonotic diseases of wildlife origin to mitigate risk of spillover, evaluation and transmission of etiological agent. e.g. Nipah , Avian Influenza
- **Laboratory support;**
- **Epidemiological investigation:** Opportunity to study movement pattern of influenza viruses from wild birds to domestic poultry species and human;
- **Infection control and containment;**
- **Clinical management;**
- **Information management, media relations, and social mobilization; and**
- **Expertise in environmental health or medical anthropology.**
- **Operationalization of One Health activities for control of zoonotic diseases. Operational and technical coordination.**

Conclusion:

The compelling message is that sustained disease surveillance is a basic human and animal health necessity because ongoing interactions among humans, animals, and the environment will inevitably lead to disease emergence or re-emergence, which has the clear potential to disrupt or destabilize societies, trade, economies, and hence, national security. Thus, building an understanding of the importance of and commitment to disease surveillance, and the capacity and resources to comply with existing guidelines, are essential to improving surveillance for emerging infectious diseases of zoonotic origin worldwide.

References:

1.Article on Global trends in emerging infectious diseases - Kate E. Jones, Nikkita G. Patel, Marc A. Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John L. Gittleman & Peter Daszak ;Nature 451, 990-993 (21 February 2008) | doi:10.1038/nature06536

2. IOM (Institute of Medicine) and National Research Council (NRC). 2008. Achieving sustainable global capacity for surveillance and response to emerging diseases of zoonotic origin: Workshop summary. Washington, DC: The National Academies Press.

3. Dein, J., and S. Wright. 2008 (unpublished). Wildlife disease surveillance and investigations. Presented at the Institute of Medicine/National Research Council Workshop on Sustainable Global Capacity for Surveillance and Response to Emerging Zoonoses, Washington, DC, June 25–26.

DRONES FOR WILDLIFE CONSERVATION

Md. Modinul Ahsan

1. Introduction

In a technological context, a drone is an unmanned aircraft. Drones are more properly known as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) or Unmanned Aircraft Systems (UASes). Fundamentally, a drone is a flying robot. The aircrafts may be remotely controlled or can fly autonomously through software-controlled flight plans in their embedded systems working in conjunction with onboard sensors and GPS. Drones are generally classified based on their propellers and purpose of use. Drones can bear heavy loads, contain camera, stabilizers and be equipped with or without GPS. Uses of drone in diversified activities e.g. from delivery of goods to photography, agricultural farming to wildlife protection, monitoring traffic offences to finding out missing people, and exploring mineral resources hard-to-reach to scientific research etc. which are normally difficult for the human being have been gaining popularity (TechTarget 2017).

Now a days the UAVs are mostly allied with the military, where they are used initially for anti-aircraft target practice, intelligence gathering and then, more controversially, as weapons platforms. Drones are also used in a wide range of citizen roles ranging from search and rescue, surveillance, traffic monitoring, weather monitoring and firefighting to personal drones and business drone-based photography, as well as videography, agriculture and even delivery services. Apart from these, the drones are also used for conservation purposes from watching out for elephant poachers in Africa to looking for orangutans in Indonesia. The drones are able to monitor areas out of reach for humans and get a much wider view than someone on the ground could and the surveys and monitoring operations carried out with drones actually more accurate and effective than operations carried out by trained scientists and conservationists on the ground (TechTarget 2017).

2. History of drone use cases

The first generally used drone was a full-size retooling of the de Havilland DH82B "Queen Bee" biplane, which was fitted out with a radio and servo-operated controls in the back seat. The plane could be conventionally piloted from the front seat, but, generally, the plane flew unmanned and was shot at by artillery gunners in training. The term drone dates to this initial use, a play on the "Queen Bee" nomenclature (TechTarget 2017).

In late 2012, Chris Anderson, editor in chief of Wired magazine, retired to dedicate himself to his drones company, 3D Robotics Inc. The company, which started off specializing in hobbyist personal drones, now markets its solutions to photography and film companies, construction, utilities and telecom businesses, and public safety companies, among others. In late 2013, Amazon was one of the first organizations to announce a plan to use commercial drones for delivery activities. Others have since followed suit; for example, in September 2016, Virginia Polytechnic Institute and State University began a test with Project Wing, a unit of Google owner Alphabet Inc., to make deliveries, starting with burritos produced at a local Chipotle restaurant (TechTarget 2017)..

Other common drone applications include drone surveillance and drone journalism, as unmanned aircraft systems can often access locations that would be impossible for a human to get to. Drone education is also expanding; Embry-Riddle Aeronautical University, long a training ground for the aviation industry, now offers a Bachelor of Science in Unmanned Systems Applications, a Master of Science in Unmanned Systems and an undergraduate minor in Unmanned Aerial Systems (TechTarget 2017).

3. Use of drones

Drones usually conjure images of serious military unmanned flight equipment, typically in the form of unmanned aerial vehicle, unmanned aerial system or remotely piloted aircraft. With their impressive track record based on their lithe configuration and versatile maneuverability in hostile environment, drones have

Divisional Forest Officer, Wildlife Management & Nature Conservation Division, Khulna. Email: ahsanmodinul@gmail.com

altered the manner in which wars are being fought. Now, the same technology and expertise in the form of 'eco-drones' is all set to revolutionize and redefine the environmental conservation arena. Over the past five years, the application of drone technology, especially in the field of wildlife conservation, has increased phenomenally. It has in the process, set an example of successful civilian use of drones (Sriraj 2015).

In 2011, Brazil proved the peaceful credentials of this technology when it acquired 14 drones and used them for wildlife conservation, fighting illegal logging, mining and poaching. This proved to be an immense asset to the authorities and also aided them in the enforcement of environmental laws. Since then, the non-military use of drones, especially for wildlife conservation, has become a well-known option. In the South Pacific region, National Oceanic and Atmospheric Administration scientists are using drones to gather health data on sperm whales, while the Sea Shepherd Conservation Society is utilizing drones to track and photograph Japanese whaling vessels deemed by the organization to be engaged in illegal hunts (Sriraj 2015).

Recently, the World Wildlife Fund has initiated a drone-based project with the aim to observe and document movements of the endangered wildlife threatened by illegal poaching. India has started using the drone technology for wildlife protection with nearly 10 States in the country already using drones to keep tab on endangered animals. However, the use of drones is at very premature level in Bangladesh, this is partly due to the evolving regulations, policy, availability of dependable and affordable technology and guidelines of operations. If the drones have to move beyond the usage in wildlife conservation and other miscellaneous act such as restaurant deliveries, this technology needs to be upgraded to the next level where it can be applied to a large-scale issue where the limitless potential of the drones can make a vast difference (Sriraj 2015).

Environmental conservation and biodiversity preservation is an apt area where many organizations are already putting in tremendous work; these institutions can be encouraged to incorporate use of eco-drones in their projects. Historically, researchers and environmental scientists had to rely on either days of trekking through tough terrains or opt for expensive alternatives such as aircraft surveys to collect precious data. As a result, conservation initiatives were performed infrequently-sometimes decades apart resulting in time intervals during which great environmental changes took place that subsequently went unrecorded (Sriraj 2015). However, the drones can be used in the following sectors (Bird 2014):

Arctic Surveillance • First Responders • Forest Fire Management • Pipeline Monitoring • Power line Monitoring • Cinema and TV applications • Environmental Survey • Forest and Land Survey • Agriculture and Crop Spraying • Crime Scene Surveys • Offshore Monitoring • Critical Infrastructure Protection • Internal Waterways • Mineral Surveys

Poaching and Game Surveys • Wildlife Surveys • Atmospheric and Ocean Studies • Border Integrity • Crowd Control and Monitoring • Ice Flow Monitoring • Pollution Detection • Search and Rescue • Arctic Communication • Counter Narcotics • Enclosed Area Security • News Services • Traffic Monitoring

4. Importance of drones in wildlife management

Conservation researchers and wildlife biologists are increasingly using drones to save money and improve the accuracy of their fieldwork, flying unmanned aircraft over migrating birds, spying on rhinoceros poachers and photographing forest density. Drones are inexpensive, easy to use and can provide more accurate data in some cases than researchers can get with traditional methods. They are particularly handy for counting the number of animals in a given location and surveying habitat in difficult-to-access areas. Traditionally, researchers hired pilots to maneuver airplanes overhead, or recruited teams of biologists to trudge through the forest in order to complete these tasks (Nordam 2015)

a. Terrestrial wildlife

The drones, now-a-days are found very powerful tool in wildlife ecology and can provide novel remote sensing data at fine spatial and temporal scales (Anderson and Gatson 2013). Applications of UAS technology are diverse and growing, ranging from sampling airborne microbes, to locating wildlife poachers, to providing data on cetacean behavior and body condition. As the technology and regulatory frameworks improve, research applications are diversifying rapidly. The terrestrial wildlife has long relied on aerial surveys to quantify their abundance, distribution, and habitat. Recently, UAS have been used to carry out these key functions, and to capture data that were previously difficult to collect using manned aircraft. Count-based estimates of abundance have been obtained by UAS for water-birds at wildlife refuges (USGS 2014), white pelican (Pelecanus erythrorhynchos) breeding colonies (USGS 2014), sandhill crane (Grus canadensis) migratory stop-over sites (USGS 2011), snow goose (Chen caerulescens) and Canada goose (Branta canadensis) flocks (Chabot and Bird 2012), and greater sage-grouse (Centrocercus urophasianus) lek sites (Hanson et al. 2014). Thus the drones can be used for wildlife ecological analysis of terrestrial habitat in future widely.

b. Marine wildlife

Marine species are notoriously difficult to study, and manned aircraft have played a key role in investigations of their distributions, movements, abundance, and body condition. Advances in UAS technology have made it possible to successfully survey marine mammals at primary feeding, birthing, and haul-out areas up to 150 km from shore (Koski et al. 2009). Similar to the constraints of manned aerial surveys, detection of mammals by UAS surveys is strongly dependent on wave conditions and the color of the animal, and is maximized by high-resolution imagery (Koski et al. 2009). Dugongs (Dugong dugon), sperm whales (Physeter macrocephalus), killer whales (Orcinus orca), and bowhead whales (Balaena mysticetus) have been successfully surveyed using fixed-wing and multicopter UAS fitted with high-resolution digital cameras (Hodgson et al. 2013; NOAA 2014a; Durban et al. 2015; Koski et al. 2015). In addition to counting marine mammals, useful information on body condition, age, and sex can be obtained.

c. Spatial ecology

Advances in technology – such as higher payload capacity of small UAS and miniaturization of multi-spectral and hyper-spectral sensors in conjunction with improved computer -processing capabilities – have allowed practitioners to monitor habitat for fish and wildlife species. Data collected through traditional remote-sensing techniques (eg manned aircraft or satellite) are often too coarse in resolution to suit fine-scale ecological studies (Wulder et al. 2004). Commercially operated satellite sensors can now produce data at finer resolutions; however, operational constraints include prohibitively high costs associated with acquiring images, cloud contamination of regions of interest, and the inability to repeat measurements over required timescales (Loarie et al. 2007). It has been argued that UAS equipped with remote-sensing payloads (eg RGB cameras, color IR sensors, and light-weight thermal systems) may help to resolve issues associated with spatial ecology (Anderson and Gaston 2013).

Small UAS can hover at lower altitudes to capture fine-scale habitat metrics such as forest canopy gaps and understory plant diversity (Getzin et al. 2012). Additionally, the flexible maneuverability of UAS may circumvent issues associated with cloud contamination and minimize time between site revisits (Herwitz et al. 2004). Fine-resolution remotely sensed data obtained via UAS have been used to quantify habitat characteristics in a number of studies. For example, habitats of wetland birds, including the US federally listed Yuma clapper rail (Rallus longirostris yumanensis) and south-western willow flycatcher (Empidonax traillii extimus).

On the other hand imagery was obtained via UAS has also been applied to delineate localized cover types, estimate percentage of bare ground (Breckenridge et al. 2011), catalog forest composition (Dunford et al. 2009), and calculate leaf area index and chlorophyll content (Berni et al. 2009; McGwire et al. 2013). Furthermore, UAS equipped with IR or high-resolution cameras have been used to monitor the distributions of invasive species (Zaman et al. 2011; Wan et al. 2014), produce vegetation maps (Laliberte et al. 2011), and identify forest canopy mortality (Dunford et al. 2009).

5. Negative impacts of drone on wildlife

The drones are not away from creating negative impacts on wildlife. Researchers from the University's Unmanned Research Aircraft Facility (URAF) or Adelaide Drone Hub, say that drones are a useful tool for field research and their use is growing in popularity. But, they warn in a report published in the Cell Press journal Current Biology, this new technology could also have undesirable and unforeseen impacts on wildlife and there is currently little understanding of the risks (https://www.laboratoryequipment.com/ news/2016/05/researchers-recommend-steps-limit-drone-disturbance-wildlife; accessed on 14 March 2017.) It has also been found that bird can be stressed while incubating in their nests which might affect the offspring. Study conducted by Ditmer et.al in 2015 on black bear shows that UAV flights affect on movements and heart rates responses on free-roaming American black bears. They also observed that there was a consistent strong physiological response but infrequent behavioral changes in the black bear.

6. Limitations

Major limitations to the widespread adoption of UAS include difficulties in obtaining permits for use, limited survey range, and data -processing time. Many of the small, battery-powered multi-copters that are favored due to their low costs, energy efficiency, and ease of operation must be recharged or have batteries replaced approximately every 20 minutes, thereby restricting survey range. Larger UAS are capable of longer flights and greater payloads but are prohibitively expensive for most researchers Furthermore, many small UAS cannot currently be flown safely during severe weather conditions (Weissensteiner et al. 2015).

Another current limitation of UAS involves the processing of large amounts of data generated by surveys. Digital photos, video, and other remote-sensing data often require a substantial time investment for data organization and processing; however, automated programs have been developed to improve the efficiency of this procedure (Groom et al. 2011). In addition, the effectiveness of UAS in replicating results obtained by traditional surveys of wildlife is currently being debated, and the accuracy and precision of UAS-derived population estimates is being tested. Promisingly, recent research on the effectiveness of UAS in estimating wildlife population parameters (eg Koski et al. 2009; USGS 2011; Martin et al. 2012; Goebel et al. 2015) shows that this technique can indeed be highly accurate.

7. Drone in Bangladesh

Like most of the ICT related innovations, positive and negative coverage on Unmanned Aerial Vehicles (UAV), Unmanned Aircraft Systems (UAS) or Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) (popularly known as "drones") in popular media is the recent regulatory concern for obvious reasons, even though they promise epoch-making deliverables. When conscious readers condemn the fatalities suffered by the civilians as a consequence of military drone attacks on terrorists, people are simultaneously fascinated to enjoy stunning photographs captured by using drones (Karim, 2016). This machine can be used in the inaccessible forests especially

in the mangrove forests and hill forests. This can be highly useful in monitoring forest and wildlife crime and fire hazard with special care. However, unregulated use of drones has raised some privacy, safety and security concerns too, the most important being the aviation security issue. Between April to October 2016, 23 near misses collisions between the aircraft and drones were investigated by the UK Airprox Board, where 12 were at 'a serious risk of collision', and 1 was passed within 25m of a Boeing 777 near the Heathrow Airport. In 2014, Magistrate Court in the UK fined one £800 and awarded costs of £3500 for dangerous and illegal flying of drone in restricted airspace over a nuclear submarine facility (Karim 2016).

Drones, capable to contain cameras, can create serious privacy challenges too and a case of such nature is now pending in the USA Federal Court. The Supreme Administrative Court of Sweden has recently banned the use of surveillance drone cameras without special permit. In 2015, House of Lords of EU Committee called for compulsory registration of all types of drones to track and manage drone traffic and handle safety concerns (Karim 2016).

Use of drones for different purposes have been gaining popularity in Bangladesh too and news reports covered stories on seizure of drone components from Islamic militants, use of drone by the South African Cricket team during their practice session, inspection of Padma Bridge and seizure of drones, with or without owners, in different occasions even though the present Import Policy does not contain specific provisions on drone import in the country. Following the experience of other countries, the national aviation regulator, the Bangladesh Civil Aviation Authority (CAAB) has also issued Circular to provide information, instructions, requirements, procedures and standards for drone operation in the country's airspace. This Circular includes some blanket provisions to widely cover the operation of RPAS for any professional and/or non-professional purposes like aerial photography, geomantic surveying, crop observation, advertising, research and development by obtaining a Special Flight Operation Certificate (SFOC). A major and sound pilot has to meet additional requirements, inter alia, e.g. safe and not reckless or negligent operation to ensure aviation safety and protection of life or property, subscribe to liability insurance etc. The RPAS Operator needs to take prior permission 45 days before the intended date of operation. For import of RPAS, permission from the CAAB is also required (Karim 2016).

There are still rooms to improve this CAAB Circular. Instead of covering wide and general provision on registration and operation, provisions developed on the basis of UAV classification seems to work better. Besides, the Circular only refers to penalties and fines for reckless and negligent use of RPAS and procedural aspects are not covered. Thus, it is uncertain how to prove anyone guilty and how to fix the amount of fine if found someone guilty. Moreover, the requirement for ‘appropriate liability insurance’ requires further clarification. As the CAAB Circular suggests the pilot, operator or importer to follow the manufacturer's instructions, a prospective applicant should carefully look at the manufacture's liability clause and jurisdiction issue while assessing and signing the purchase agreement (Karim 2016)..

8. Conclusion

The burgeoning application of UAS in ecological and wildlife demonstrates that a growing number of scientists are embracing this novel technology to meet their needs. This technology has been used to address a broad diversity of eco-successfully logical research and problems, and can be a cost-effective, safe, relatively quiet, and effective alternative to traditional survey techniques. Despite the advantages of conducting field research with UAS, major obstacles to their widespread adoption by ecologists include regulatory limitations, data-processing time, and fuel capacity or battery life. At this time, UAS are best suited to situations where they can be launched from platforms or areas that are relatively close to the target, and are not suited for areas The future utility of UAS for ecologists is expected to be determined by the regulatory framework of the aviation administrations within each country in which they are operated, rather than by technological limitations (Vincent et al. 2015). In most countries, UAS must be operated within line-of-sight and lengthy permitting processes are necessary (Anderson and Gaston 2013).

REFERENCES

Anderson K and Gaston KJ. 2013. Lightweight unmanned aerial vehicles will revolutionize spatial ecology. Front Ecol Environ 11: 138–46.

Berni JA, Zarco -Tejada PJ, Suarez L, and Fereres E. 2009. Thermal and narrowband multispectral remote sensing for vegetation monitoring from an unmanned aerial vehicle. IEEE T GeoSci Remote; doi:10.1109/T-GRS.2008.2010457.

Breckenridge RP, Dakins M, Bunting S, et al. 2011. Comparison of unmanned aerial vehicle platforms for assessing vegetation cover in sagebrush steppe ecosystems. Rangeland Ecol Manag 64: 521–32.

Chabot D and Bird DM. 2012. Evaluation of an off-the-shelf unmanned aircraft system for surveying flocks of geese. Waterbirds 35: 170–74.

Durban JW, Fearnbach H, Barrett-Lennard LG, et al. 2015. Photogrammetry of killer whales using a small hexacopter launched at sea. J Unmanned Veh Syst 3: 1–5.

Dunford R, Michel K, Gagnage M, et al. 2009. Potential and constraints of unmanned aerial vehicle technology for the characterization of Mediterranean riparian forest. Int J Remote Sens 30: 4915–35.

Getzin S, Wiegand K, and Schoning I. 2012. Assessing biodi-versity in forests using very high-resolution images and unmanned aerial vehicles. Methods Ecol Evol 3: 397–404

Goebel ME, Perryman WL, Hinke JT, et al. 2015. A small unmanned aerial system for estimating abundance of and size of Antarctic predators. Pol Biol; doi:10.1007/s00300-014-1625-4.

Groom G, Petersen IK, Anderson MD, and Fox AD. 2011. Using object-based analysis of image data to count birds: mapping of lesser flamingos at Kamfers Dam, Northern Cape, South Africa. Int J Remote Sens 32: 4611–39.

Hanson L, Holmquist-Johnson CL, and Cowardin ML. 2014. Evaluation of the Raven sUAS to detect and monitor greater sage-grouse leks within the Middle Park population: US Geological Survey Open-File Report 2014–1205. Reston, VA:

Herwitz SR, Johnson LF, Dunagan SE, et al. 2004. Imaging from an unmanned aerial vehicle: agricultural surveillance and decision support. Comput Electron Agr 44: 49–61.

Hodgson A, Kelly N, and Peel D. 2013. Unmanned aerial vehicles (UAVs) for surveying marine fauna: a dugong case study. PLoS ONE 8: e79556

Karim, E. M. 2016, in the Daily Star Drone In Bangladesh: Safety concerns and regulation (URL: http://www.thedailystar.net/law-our-rights/law-vision/drone-bangladesh-safety-concerns-and-regulation-1335874

Koski WR, Allen T, Ireland D, et al. 2009. Evaluation of an unmanned airborne system for monitoring marine mammals. Aquat Mamm 35: 347–57.

Loarie S, Joppa L, and Pimm S. 2007. Satellites miss environ-mental priorities. Trends Ecol Evol 22: 630–32.

Laliberte AS, Winters C, and Rango A. 2011. UAS remote sensing missions for rangeland applications. Geocarto Int 26: 141–56.

Mark A. Ditmer, John B. Vincent, Leland K. Werden, Jessie C. Tanner, Timothy G. Laske, Paul A. Iaizzo, David L. Garshelis, and John R. Fieberg 2015. Bears Show a Physiological but Limited Behavioral Response to Unmanned Aerial Vehicles. 2278 Current Biology 25, 2278–2283, August 31, 2015 ª2015 Elsevier Ltd. (Available at: http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(15)00827-1.pdf)

Martin J, Edwards HH, Burgess MA, et al. 2012. Estimating distribution of hidden objects with drones: from tennis balls to manatees. PLoS ONE 7: e38882

McGwire KC, Weltz MA, Finzel JA, et al. 2013. Multiscale assessment of green leaf cover in a semi- arid rangeland with a small unmanned aerial vehicle. Int J Remote Sens 34: 1615–32.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 2014a. Spying on sperm whales.

Sriraj K, 2015 in The Pioneer; URL: http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/drones-for wildlifeconser-vation.html); Accessed on 14 March 2017 www.nmfs.noaa.gov/sto-ries/2013/03/3_07_13sperm_whales.html. Viewed 12 Jan 2015.

Nordam A. 2015. In International Business Times. Drones Take Flight As Wildlife Research Tools While Conservationists Debate Their Proper Role. Available at http://www.ibtimes.com/drones-take-flight

wildlife-research-tools-while-conservationists-debate-their-proper-2052379
USGS. http://pubs.usgs.gov/of/2014/1205/pdf/ofr2014-1205.pdf. Viewed 24 Mar 2016.
USGS (US Geological Survey). 2011. Cranes and drones: strange airfellows? www.fort.usgs.gov/science-feature/127.
USGS (US Geological Survey). 2014. US Geological Survey National Unmanned Aircraft Systems Project website. http:// rmgsc.cr.usgs.gov/UAS.
Wan H, Wang Q, Jiang D, et al. 2014. Monitoring the invasion of Spartina alterniflora using very high resolution unmanned aerial vehicles imagery in Beihai, Guangxi (China). Sci World J; http://dx.-doi.org/10.1155/2014/638296.
Weissensteiner MH, Poelstra JW, and Wolf JBW. 2015. Low budget ready-to-fly unmanned aerial vehicles: an effective tool for evaluating the nesting status of canopy-breeding bird species. J Avian Biol 46: 425 30.
Wulder MA, Hall RJ, Coops NC, and Franklin SE. 2004. High spatial resolution remotely sensed data forecosystem characterization. BioScience 54: 511–21
Zaman B, Jensen AM, and McKee M. 2011. Use of high-resolution multispectral imagery acquired with an autonomous unmanned aerial vehicle to quantify the spread of an invasive wetlands species. Geoscience and Remote Sensing Symposium 2011 IEEE International; 24–29 Jul 2011; Vancouver, Canada. doi:10.1109/I-GARSS.2011.6049252.

A Short Focus on Soil Erosion in Bangladesh

Dr. Mohammad Zahirul Haque

Introduction

Soil erosion is a trenchant environmental complication throughout the global and local level terrestrial ecosystems. When soil is left exposed, raindrops hit and loosen the soil particles and then with minimum of 2% slopes, it starts moving toward downhill. Sheet erosion is the dominant type of soil erosion. The impact of soil erosion is intensified on sloping land. Erosion inflicts multiple and serious problems to a developed eco community such as agricultural crop, forests or water body. The major theoretical viewpoint on soil erosion focuses on growing population pressure, that enhances people migrating to and conversion of forest areas into homestead and agriculture. Research revealed that the increasing rate of soil loss is severe after clear felling of forest (Certini 2005). Deposition of eroded soil particles in fields, floodplains, and water bodies are major environmental concerns. Soil erosion reduces soil productivity, scars the landscape, and causes downstream damage. Sediment accumulation in water bodies affects water quality and its storage capacity, biological activity, and reduces recreational potential (Lal 1998).

Bangladesh is a highly dense populated country. Its watershed is prone to land degradation due to deforestation and other anthropogenic interference which explores soil erosion. River bank erosion is a serious hazard that directly or indirectly causes the suffering of annually about one million people. A large number of people living in both rural and urban areas frequently become the victims of flooding annually. Therefore to keep the watershed healthy it is important to know the erosion rate, its effects and mitigating measures.

Table 1: Present scenario of Bangladesh river condition and siltation

Length of inland waterways	24,000 km
Least available depth range	3.90 m to 1.50 m
Annual quantum of silt	2.5 billion tons

(Source: modified from Bangladesh Waterways Assessment.doc, BWDB)

A research on suspended sediment concentrations throughout the Ganges-Brahmaputra River System was conducted. It revealed that during the high-discharge monsoon season, suspended sediment concentrations vary widely throughout different geomorphological classes of rivers such as main river channels, tributaries, and distributaries. The sediment loads in these classes indicate that 7% of the suspended load is diverted from the Ganges and Ganges-Brahmaputra rivers into southern distributaries. The calculations show that the Ganges carries 262 million tons/year of sediment and the Brahmaputra carries that of 387 million tons/year. Again the conjoined Ganges-Brahmaputra River carries annually 530 million tons of sediment which is 80% of the sum of the loads that the Ganges and Brahmaputra rivers carry from upstream of the confluence. The remaining 20% of sediment is diverted from the main river by the distributaries and deposited along the main river channel during overbank flooding (Barua 1990). The total length of inland waterways in the country is24,000 km and the annual quantum of silt deposits 2.5 billion tons (Table 1).

Source of sediment

The Ganges and Brahmaputra rivers drain 3/4 of the Himalayan mountain range, carrying ~ 1,000,000,000 metric tons of sediment to the Bengal Basin, or ~7% of the world flux of sediment to the oceans.

Assistant Conservator of Forests, Development Planning Unit, Bangladesh Forest Department

Accelerated soil erosion in the hilly regions of the country occupies about 1.7 million hectares with the erosion rate of 2.0 to 4.7 ton/ha per year (Source: Bangladesh Agricultural Research Institute, BARI).

Causes of Soil erosion

Bangladesh is a tropical country, situated mainly on the deltas of large rivers flowing from the Himalayas. The highest elevation of the delta area is ±150 m (±500 ft) above sea level, and most of the area is one or two meter (a few feet) above sea level. Its soil consists mostly of fertile alluvium. During the rainy season floodwater covers most of the land surface. The northwestern section of the country is drained by the Tista River. The hilly regions are in the east, notably in the Chittagong Hill Tracts to the southeast and the Sylhet District to the northeast.

An estimated soil loss rate in hilly area of Bangladesh is 4.2 tons/ha/yr. and 7-120 tons/ha/yr. on 30-40% and 40-80% slopes, respectively (BARI). This huge erosion occurs due to mainly shifting cultivation. Besides soil loss, significant quantities of plant nutrients are also depleted from top layer causing tremendous soil degradation. In addition, the country is losing its forest area at the rate of about 3% annually due to deforestation. The deforested area becomes susceptible to severe water erosion, which is about 102 tons/ha/yr. In Bangladesh, bank erosion is caused by strong river current during the rainy season.

About 1.7 million hectares of floodplain areas are prone to riverbank erosion. Some areas of Bangladesh are also affected by wind erosion, particularly in the Rajshahi and Dinajpur regions during the dry months of the year. The soils eroded from the hills are deposited somewhere in the downstream (Goodbred and Kuehl 1998). Burial of agricultural land by sandy over-wash is a common feature in areas adjoining the active river channels and hill streams. The entire northern and eastern piedmont alluvium and the Chittagong Hill Tracts are adversely affected by the deposition of coarse materials brought down by runoff water. Table 2 shows the drivers of soil erosion in different region of Bangladesh.

Table 2: Drivers for soil erosion in different region of Bangladesh.

Region	Drivers	
	Natural	Human intervention
North-west	Tista avulsion and shifting; and Brahmaputra avulsion and westward migration of the Brahmaputra	Groundwater abstraction and Tista Barrage
North central	Brahmaputra avulsion-Changes of flow regime in distributaries	Unplanned settlement, industrialization along the distributary rivers in this region, Ground water extraction
North east	Brahmaputra avulsion	-
South east	Tectonic uplifting, i.e. up-folding, delta pro-gradation	Unplanned settlement, industrialization along the distributary rivers in this region
South west	Deltaic subsidence Delta pro-gradation	Dry season flow diversion, coastal polders

Factors for Soil erosion

- Rainfall: Huge rainfall increases more runoff with topsoil
- Soil particle: Clay soil resists the rain water infiltration and supports runoff.
- Topographic factor: The topography of a given landscape, its rainfall and/or wind

exposure influences the land's susceptibility to soil erosion

- Vegetation Cover: Land areas covered by plant biomass (living or dead) are more resistant to wind and water erosion as rain drop and wind energy are dissipated by the biomass layer and the topsoil is held together by the biomass
- Support practice: Natural vegetation, construction site, terracing etc.

Effects of Soil Erosion

Water erosion is the most widespread form of degradation affecting 25% of agricultural land of Bangladesh. Soil erosion reduces the general productivity of the terrestrial ecosystems. Soil erosion increases water runoff due to decreasing of water infiltration and the water-storage capacity of the soil. In addition, during the erosion process organic matter and essential plant nutrients are removed from the soil and soil depth is reduced. Research found that one ton of fertile topsoil averages 1 to 6 kg of nitrogen, 1 to 3 kg of phosphorus, and 2 to 30 kg of potassium, whereas the topsoil on the eroded land has an average nitrogen content of only 0.1 to 0.5 kg per ton. Erosion substantially reduces soil depth. If soil depth is reduced from 30 cm for deep soils to even less than 1 cm for thin soil then plant root space can be minimized and the plants could be stunted. Soil erosion accelerates river bed siltation which needs huge expenditure. An official statement of Water Resources Ministry reveals that an estimated cost of TK 9,56,834 crore will be required for conducting the dredging works of 2100 kilometers of 24 major rivers across country over the next 15 years aiming to increase and maintain their navigability.

Two simple empirical models used for soil erosion evaluation

Many different erosion and sediment/nutrient transport models are used. Among those the Universal Soil Loss Equation (USLE) model is used in tropical countries. The model has undergone much research followed by modifications such as RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation and MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) as described in Table 3.

Table 3: RUSLE and MUSLE Equation

The Equation for RUSLE Model:	The Equation for MUSLE Model*:
A=R*K*LS*C*P Where, A – Annual soil loss, in tons ha^{-1} $year^{-1}$ R – Rainfall erosivity factor K – Soil erodibility factor LS – Topographic factor (Zhang et al. 2013)(Zhang et al. 2013) C – Cover management factor P – Support practice facto	$Y= (Q \times Q_p)^{0.56} \times K \times LS \times C \times P \times 11.8$ Where, Y - sediment yield to the stream network in metric tons, Q - runoff volume Q_p - peak flow rate in m^3 s^{-1} K - soil erodibility factor LS - slope length and gradient factor C - over management factor and can be derived from land cover data P - erosion control practice factor which is a field specific value

*To estimate sediment yield by MUSLE model, it is required to calculate runoff, peak flow rate, soil erodibility factor, length and slope factor, vegetation cover factor and management practice factor.

Significance of Soil Erosion Evaluation

Comprehensive study on soil erosion evaluation for Bangladesh watershed scale had not yet been done except some few erosion assessments conducted in Chittagong hill tracts.

Mitigating Measures/ Recommendation

Based on the discussion above, following mitigating measures can be adopted:

- Comprehensive evaluation of soil erosion for all watersheds in Bangladesh
- Identification of sediment source such as degraded / uncovered sloppy areas; Construction site especially in hilly areas such as infrastructure, road, hill cut area, landslide areas, human settlements in the hills etc.
- Erosion Control technologies: Reliable and proven soil conservation technologies include ridge planting, no-rill cultivation, crop rotations, strip cropping, grass strips, mulches, living mulches, agroforestry, terracing, contour planting, cover crops, and windbreaks. Each conservation method may be used separately or in combination with other erosion controlled techniques

Conclusion

A green watershed contributes:

- Reduced runoff and thereby minimum erosion from the main river basins and sub basins
- Keep the river navigable and maintain water quality and thus save massive expenditure of dredging.
- Dense vegetation can contribute to Carbon sequestration and reduce greenhouse effect.

REFERENCE

Barua, D.K. (1990) Suspended sediment movement in the estuary of the Ganges-BrahmaputraMeghna river system. Marine Geology 91(3), 243-253.

Certini, G. 2005. Effects of Fire on Properties of Forest Soils: A Review. Oecologia 143(1): 1-10

Goodbred, S.L. and Kuehl, S.A. (1998) Floodplain processes in the Bengal Basin and the storage of Ganges–Brahmaputra river sediment: an accretion study using 137 Cs and 210 Pb geochronology. Sedimentary Geology 121(3), 239-258.

Lal, R. 1998. Soil Erosion Impact on Agronomic Productivity and Environment Quality. Critical Reviews in Plant Sciences 17(4): 319-464.

Zhang, H., Yang, Q., Li, R., Liu, Q., Moore, D., He, P., Ritsema, C.J. and Geissen, V. (2013) Extension of a GIS procedure for calculating the RUSLE equation LS factor. Computers & Geosciences 52, 177-188.

আগর প্রজাতির বনায়নে বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে অধিক লাভ

এম এ তাহের হোসেন

আগর বৃক্ষ প্রজাতি (Aquilaria malaccensis) উষ্ণমন্ডলীয় চিরসবুজ বনাঞ্চলের উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদ হতে সুগন্ধি তেল "আগর" উৎপাদন হয় যার চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এ সুগন্ধি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে আগর প্রজাতির বনায়ন সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার বন ভুমি থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ির আঙ্গিনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। অধিকাংশ ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগানে ৭ থেকে ১০ বছর বয়সের বাছাইকৃত আগর বৃক্ষের মূল কান্ড কৃত্রিম পেরেক পদ্ধতি (Nailing method) প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কৃত্রিম পেরেক প্রয়োগের মাধ্যমে আগর শিল্পের কাঁচামাল সঞ্চয়নের ব্যবস্থা করা হয়। পেরেক প্রয়োগের ৫ থেকে ৮ বছর পর কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কাঁচামাল আগর বৃক্ষে সঞ্চিত হয়। অতঃপর সুগন্ধি তেলের কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য আগর বৃক্ষ কর্তন করা হয়। বাগান সৃজনের পর হতে পরিপক্ষ সময়কাল সাধারণতঃ ১৫ বৎসর বয়সে আগর প্রজাতির এ বৃক্ষ কর্তন করা হয়। বৃক্ষের এই পরিপক্ষ বয়সকে আদর্শ সময়কাল (Standard period) বিবেচনা করে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করা হয়। পরিপক্ষ বয়সের বৃক্ষ কর্তনের পর উক্ত ভূমিতে পরবর্তী আর্বতের (Rotation) আগর প্রজাতির চারা রোপণ অব্যাহত রাখা হয়। সে কারণে আগর বাগানে অসম বয়সের (Uneven-aged plantation) বৃক্ষরাজি বিদ্যমান । এ অসম বয়সের বাগানে এক থেকে চৌদ্দ বছরের বৃক্ষ প্রজাতি দৃশ্যমান । বৃক্ষে সঞ্চিত আগর শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন ধাপে প্রক্রিয়াকরণের ফলে উপজাত (By products) দ্রব্যসহ মূল্যবান সুগন্ধি তেল "আতর" উৎপাদিত হয়।

চিত্র ১: সুজানগর ব্যক্তি মালিকানাধীন আগর বাগান (বড়লেখা, মৌলভীবাজার)

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে আগর বাগান সৃজনের গুরুত্ব নিরুপণে রাবার ও আকাশমনি প্রজাতির সাথে এর তুলনা করার জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। প্রজাতিসমুহের ব্যয় খাতের পর্যলোচনায় দেখা যায় যে স্বল্প পরিমাণ ভুমিতে অধিক বিনিয়োগের সুযোগ শুধুমাত্র আগর বাগানে সম্ভব। আগর বৃক্ষ রোপণ থেকে কর্তনের সময়কাল পর্যন্ত চারা উত্তোলন ও রোপণ খাতে মোট খরচের ৩ শতাংশ ব্যয় হয় এবং অবশিষ্ট ৯৭ শতাংশ পেরেক প্রয়োগ খাতে ব্যয় হয়।

এ এলাকার আগর, রাবার ও আকাশমণি বৃক্ষের বাগানসমুহের মধ্যে পরিপক্ষ সময়কাল তথা ১৫ বৎসর বয়সের আগর বৃক্ষ থাকলেও অন্য ২ প্রজাতির উল্লেখিত বয়সের বাগান ছিলনা। সে কারণে রাবার ও আকাশমণি বৃক্ষের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ভিন্ন এলাকার বাগান হতে সংগ্রহ করা হয়।

রিসার্চ অফিসার, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম।

সারণী-১ আগর, রাবার ও আকাশমনি বৃক্ষপজাতির প্রতি হেক্টর বাগানের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাগান সৃজনের বছর/বয়স	প্রজাতি সমুহ	বাগানের অবস্থান	খাত	বর্তমান মূল্যে ("০০০" টাকা/হেঃ)			আর্থিক আয় হার (%)
				বিনিয়োগ		নিট মুনাফা	
				বাগান সৃজন	পেরেক পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া করণ*		
১৫ বৎসর	আগর	বড়লেখা	ব্যক্তি মালিকানা	২৪	৮১৭	১৬৬২	৩৬
২০০০-০১	রাবার	ফটিকছড়ি	বিএফআইডিসি	১৬	৬২	২৬	১৯
১৫ বৎসর	আকাশমনি	উপকূলীয় অঞ্চল	আনুষঙ্গিক (Secondary)	৪১	২৬৩	৭৫১	৩৫

*রাবার ও আকাশমনি বাগানের ১৫ বৎসর বয়সের বৃক্ষের কর্তন ও বাজারজাত করণ ব্যয় ধরা হয়।

উল্লেখিত প্রজাতিসমুহের বাগানে ১৫ বৎসর সময়কালে উৎপাদিত সম্পদের চলমান বাজার ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে সৃজন হতে কর্তন পর্যন্ত রাবার (১৯%) এবং আকাশমনি বাগানে (৩৫%) উৎপাদিত সম্পদের তুলনায় আর্থিক উপার্জন দক্ষতা তথা আর্থিক আয় হার (ঋজজ) আগর বাগানেই (৩৬%) বেশী । এছাড়াও চলমান বন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত সম্পদের নিরিখে রাবারের তুলনায় ৬৩ গুণের অধিক এবং আকাশমনির তুলনায় ২ গুণের অধিক নিট মুনাফা আগর বাগানেই অর্জন করা সম্ভব।

আগর, রাবার ও আকাশমনি বৃক্ষ কর্তন পরবর্তি পর্যবেক্ষন করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে রাবার ও আকাশমনির তুলনায় আগর বৃক্ষ হতে আগরের কাচাঁমাল তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এমনকি প্রতিবন্ধিদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠি বিশেষভাবে প্রতিবন্ধিদের কর্মসংস্থান সুযোগ থাকায় এটি ১টি সম্ভাবনাময় খাত, যেখানে মজুরদের শ্রেণি ভেদে আয় উপার্জনে সমতা আনয়নেও যথেষ্ট সহায়ক হবে। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

বিনিয়োগের বেসরকারী খাত হচ্ছে অর্থনীতির প্রাণ, যার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক (এউচ) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার অর্জন এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো খাত টেকসই হয়। দেশের ব্যাংক সেক্টর থেকে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহের গতি তুলনামূলকভাবে শ্লথ থাকায় ব্যাংক তারল্যের (খরয়ঁরফ সড়হবু) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক সময়ে এ সেক্টরে পর্যাপ্ত তারল্যের কারণে সম্প্রতি ব্যাংক সুদের হারও নিম্নমূখী। সুদের হার নিম্নমূখী প্রবণতার কারণে আগর বাগানের পরিপক্ষ (৭-১০ বৎসর) বয়সের বৃক্ষে পেরেক প্রয়োগের (৯৭ শতাংশ) ব্যয় খাতে ব্যাংক বিনিয়োগের জন্য বাগান মালিকপক্ষের উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এ খাতের বিনিয়োগে ঝুঁকির মাত্রাও কম। সুতরাং বাগান মালিক ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে আগর বাগানে সর্বোচ্চ ৮ বছরের জন্য পুঁজি (ব্যাংকে বিদ্যমান অত্যধিক তারল্য) বিনিয়োগ করলে একদিকে ব্যাংকের রাজস্ব যেমন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে স্ব স্ব বাগান মালিকদের আয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। যার ফলে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির কারণে সামাজিক সমতা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার মাত্রা অধিক সুরক্ষিত হবে।

আগর বৃক্ষ হতে উৎপদিত চুড়ান্ত পণ্য হিসাবে সুগন্ধি তেল "আতর" শতভাগ রপ্তানীমুখী। এ রপ্তানীমূখী পণ্যের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভর এ দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের কোন বিকল্প নেই।

অতএব, কাঙ্খিত পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের প্রয়াসে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আগর প্রজাতির বাগানের উন্নয়ন, সম্প্রসারন ও যথাসময়ে প্রক্রিয়া করনের ব্যবস্থা গ্রহণ সময়ের দাবি বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেত চাষাবাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

শেখ এহিউল ইসলাম, বিভাগীয় কর্মকর্তা
মোঃ মাহাবুব আলম, রিসার্চ অফিসার
মোহা. আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ৭১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলীয় এলাকার আয়তন প্রায় ৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের ৩২ ভাগ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলার ৪৮ টি উপজেলা উপকূলীয় এলাকার অর্ন্তভূক্ত। এ এলাকায় ৬.৮৫ মিলিয়ন বসতবাড়ি রয়েছে। বাংলাদেশের বসতবাড়িগুলি একটি বাড়ি একটি খামার হিসাবে পরিচিত। বসতভিটাগুলো কাঠ, জ্বালানী, ফল, বাঁশ, বেত, শাকসব্জি, পশুখাদ্য, গৃহনির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের উৎস হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে সর্বত্রই বাঁশ চাষ হয়ে থাকে। দেশের প্রায় ৮০ ভাগ বাঁশের সরবরাহ গ্রামীণ উৎস থেকে পাওয়া যায়। বাঁশ একটি কাষ্ঠল প্রকৃতির সোজা কাণ্ডযুক্ত ঘাস জাতীয় দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় পুনঃ উৎপাদনশীল অর্থকরী বনজ সম্পদ। সারা পৃথিবীতে প্রায় ১,২৫০ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩৩ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বনে ৭ টি প্রজাতি এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৬ টি প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। বাঁশকে গরীবের কাঠ বলা হয়। কারণ গ্রামীণ গরীব মানুষেরা প্রধাণতঃ বাঁশ দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি নির্মাণ করে থাকে। বাঁশ গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। কাগজ তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া কৃষি কাজে ও মাছ ধরার উপকরণ তৈরী, রিক্স, গরুর গাড়ী, নৌকার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি তৈরী, আসবাবপত্র ও সৌখিন দ্রব্যাদী তৈরী, ঝুড়ি ও চাটাই তৈরীতে বাঁশ ব্যবহার হয়ে থাকে। বাঁশের কচি কাণ্ড (কোড়ল) সুস্বাদু সব্জি হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং বিশ্বের অনেক দেশে দিন দিন এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাঁশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে। বাঁশ অন্য যে কোন গাছের তুলনায় দ্রুত গতিতে ক্ষতিকর কার্বন গ্যাস শোষণ করতে পারে এবং এর শিকড় কার্যকরভাবে মাটি ক্ষয় রোধ করতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাঁশের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। তবে চাহিদার তুলনায় এর উৎপাদন অপর্যাপ্ত। বাঁশের বংশ বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপকহারে বাঁশ চাষ করা প্রয়োজন। কিন্তু উপকূলীয় এলাকায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাঁশের বংশ কম দেখা যায় এবং বসতবাড়ীতে বাঁশের চাষাবাদ কম হয়ে থাকে। কৃষকেরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব স্বল্প পরিসরে বসতভিটায় বাঁশের চাষ করে থাকে।

বাঁশের ন্যায় বেতও একটি পুনঃ উৎপাদনশীল কাঁটাযুক্ত আরোহী উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী বনজ সম্পদ। বাংলাদেশে ১০ প্রজাতির বেত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জালিবেত এবং সুন্দি বেত গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যান্য প্রজাতির বেত বন-জঙ্গলে জন্মে থাকে। দেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর বেত জন্মে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বেত ঝাড়গুলো বসতবাড়ির আশেপাশে, পানির কিনারায়, আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মাতে দেখা যায়। বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র যেমন- চেয়ার, টেবিল, সোফা, মোড়া, খাট, দোলনা, ঝুড়ি, ধামা, সেলফ্, লাঠি ইত্যাদি তৈরী করা হয়। লম্বা বেত ফালা করে হস্তশিল্পের নানা দ্রব্যাদি বুনন ও বাঁধার কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। পাকা বেতফল খেতে সুস্বাদু। বর্তমানে বাংলাদেশে বেত আর সহজলভ্য নয়। এটি অতিরিক্ত আহরণ ও বন উজাড়ের ফলে খুবই কমে গেছে এবং এর উৎপাদন সীমিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে উপকূলীয় বসতবাড়ি ও বন জঙ্গলে বেত নাই বললেই চলে। উপকূলীয় এলাকায় বাঁশ ও বেতের উৎপাদন বাড়াতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বসতভিটায় বাঁশ ও বেত চাষ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি একটি গবেষণা পরিচালনা করে উপকূলীয় বসতবাড়ীতে বাঁশ ও বেত চাষে আশাব্যঞ্জক সফলতা পেয়েছে।

বাঁশ ও বেত প্রজাতি নির্বাচন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন প্লানটেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম এবং কক্সবাজার এলাকার বসতবাড়িতে ২০১০ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাঁশের ২ টি প্রজাতি যথা- বাইজ্জা বাঁশ (Bambusa vulgaris) ও বরাক বাঁশ (B. balcooa) এবং বেতের দুইট প্রজাতি যথা- জালি বেত (Calamus

পান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, রূপাতলী, বরিশাল-৮২০৭

tenuis) এবং কেরাক বেত (C. viminalis) চাষ বিষয়ক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় বাঁশের ২ টি প্রজাতিই বসতভিটা বনায়নের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে সমগ্র উপকূলীয় এলাকার জন্য বাইজ্জা বাঁশ অধিক উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। আবার উপকূলীয় পূর্বাঞ্চলে বেতের ২ টি প্রজাতিই উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তবে সমগ্র উপকূলীয় এলাকার বসতভিটায় বনায়নের জন্য জালি বেত অধিক উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া গেছে।

কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উত্তোলন

বাঁশের বংশ বিস্তারের জন্য কৃষকেরা সাধারণতঃ মুথা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বাঁশের ব্যাপক চাষাবাদের জন্য মুথার সরবরাহ না পাওয়া এবং মুথার বেঁচে থাকার হার কম হওয়ায় কৃষকেরা বাঁশ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কাজেই, কঞ্চিকলমের মাধ্যমে বাঁশের বংশ গতি অপরিবর্তিত রেখে দ্রুত বংশ বিস্তার করা সহজ। এটি একটি লাগসই প্রযুক্তি যা বাঁশ চাষের জন্য প্রয়োজন অনুসারে চারা উৎপাদন করা যায়। কঞ্চি থেকে চারা উৎপাদনের জন্য বালির প্রোপাগেশন বেড তৈরী করতে হক্ষে। সমতল ভূমিতে ১.২ মিটার (৪ ফুট) চওড়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা নার্সারী বেড বালি দিয়ে ২১-৩০ সেন্টিমিটার উঁচু অথবা মাটি অপসারণ করে ২১-৩০ সেন্টিমিটার গভীর গর্ত করে বালি দিয়ে পূর্ণ করে বেড প্রস্তুত করা যায়। সারা বছরই কঞ্চিকলম কাটা যায় তবে মে-জুন মাস কঞ্চিকলম কাটার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সুস্থ সবল ১-২ বছর বয়সী বাঁশের গা ঘেঁষে আঙুলের মত মোটা কঞ্চি হাত করাত দিয়ে কঞ্চির গোড়া সহ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। কঞ্চি কাটার পর গোড়া থেকে ৩-৫ গিট রেখে বা দেড় হাত লম্বা আকৃতিতে কাটতে হবে। কর্তিত কঞ্চিসমূহ বালতির পানিতে ভিজিয়ে বা চটের ভেজা বস্তা দিয়ে জড়িয়ে আর্দ্র অবস্থায় নার্সারীতে আনতে হবে। সংগৃহীত কাটিংয়ের গোড়ার শল্কপত্র আঙুল দিয়ে ছাড়িয়ে বালির বেডে ২-৩ সেন্টিমিটার দুরত্বে সারিবদ্ধভাবে ৭-১০ সেন্টিমিটার বালির গভীরে ঢুকিয়ে রোপণ করতে হবে। এরপর গোড়া সামান্য চাপ দিয়ে এঁটে দিতে হবে। প্রোপাগেশন বেডে কঞ্চিকলম রোপণের পর ঝরণা দিয়ে দিনে ৩/৪ বার নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। ২০-৩০ দিনের মধ্যে কঞ্চির গিট থেকে নতুন শাখা ও পাতা গজিয়ে বেড সবুজ আকার ধারণ করবে এবং কলমের গোড়ায় প্রচুর শিকড় গজিয়ে যাবে। তখন কলমগুলোকে পলিব্যাগে স্থানান্ড্র করতে হবে। নার্সারী বেডে প্রচুর পানি দিয়ে ভিজিয়ে শিকড়যুক্ত কঞ্চিকলম সতর্কতার সাথে বেড থেকে তুলতে হবে। শিকড়যুক্ত কঞ্চিকলমগুলি ২৫ী ১৫ সেন্টিমিটার আকারের পলিব্যাগে গোবর সার মিশ্রিত মাটি ভর্তি করে লাগাতে হবে। পলিব্যাগে স্থানান্ড়রিত কঞ্চিকলম ৭-১০ দিন ছায়ায় রাখতে হবে এবং প্রতিদিন ২/৩ বার পানি দিতে হবে। এরপর ব্যাগগুলো নার্সারীতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে আরো ১০-১১ মাস পরিচর্যা করতে হবে। পরবর্তী বর্ষা মৌসুমে কঞ্চিকলম নির্বাচিত জমিতে রোপণ করতে হবে।

কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে উত্তোলিত নার্সারীতে বাইজ্জা বাঁশের চারা

বাঁশের চারা রোপণের স্থান নির্বাচন

উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়ীর আশেপাশে ও তৎসংলগ্ন পুকুরপাড়, খালের পাড় এবং রাস্ড়ার ধারে বাঁশের বাগান সৃজনের জন্য স্থান নির্বাচন করা যায়। জমির উচ্চতা ও ঢাল এমন হতে হবে যেন জোয়ারের বা বৃষ্টির পানি জমে না থাকে এবং কখনই সেখানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়। নির্বাচিত স্থান আলোযুক্ত হতে হবে। কোন গাছের নীচে কিংবা ঘন ছায়াযুক্ত স্থানে বাঁশের চারা রোপণ করা যাবে না।

কঞ্চিকলম রোপণ পদ্ধতি ও পরবর্তী পরিচর্যা

বর্ষা শুরুর সাথে সাথে অর্থাৎ মে-জুন মাসে নির্বাচিত স্থানের আগাছা পরিষ্কার করে ৫ মিটার দুরত্বে কঞ্চিকলম রোপণের জন্য স্থান চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত স্থানে কাঠি পুঁতে রাখতে হবে। কঞ্চিকলম রোপণের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে চিহ্নিত স্থানে ৩০ X ৩০ X ৪৫ সেন্টিমিটার গভীর গর্ত করতে হবে। গর্ত প্রতি ৫ কেজি গোবর সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ৫ গ্রাম এমপি সার গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তটি ভর্তি করে রাখতে হবে। জুন মাসের সময় যখন বৃষ্টি শুর" হবে তখন কঞ্চিকলমের পলিথিন ব্যাগটি বেড দিয়ে কেটে ফেলে দিয়ে মাটির বলসহ চারাটি নির্ধারিত গর্তে লাগিয়ে দিতে হবে। চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে সামান্য উঁচু করে মাটি চেপে দিতে হবে। কঞ্চিকলম রোপণের পর সহায়ক খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে চারা হেলে না পড়ে। গৃহপালিত গবাদিপশু কঞ্চিকলম খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সেজন্য কঁচি চারা রক্ষার জন্য প্রতিটি চারায় খাঁচা অথবা ঘেরা বেড়া দিতে হবে। রোপণ পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ড় বছরে দুইবার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে। কঞ্চিকলম রোপণের প্রথম বছরে মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন বৃষ্টি হয় না তখন প্রতিটি চারার গোড়ায় সপ্তাহে দুই দিন ১ কলস করে পানির সেচ দিতে হবে। নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে কঞ্চিকলম রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হবে।

পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীতে ৪ বছর বয়সের বাইজ্জা বাঁশের ঝাড়

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড এলাকায় ৫ বছর বয়সের বাইজ্জা বাঁশের ঝাড়

নার্সারীতে বেতের চারা উত্তোলন পদ্ধতি

বেত সাধারণতঃ বীজ এবং রাইজোম বা সাকার দ্বারা চাষ করা যায়। তবে ব্যাপকহারে চাষাবাদের জন্য বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

বীজ সংগ্রহ ও বীজতলায় বপন পদ্ধতি

জালিবেতের ফল এপ্রিল-জুলাই মাসের মধ্যে এবং কেরাক বেতের ফল বছরে ২ বার ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল এবং আগস্ট-অক্টোবর মাসের মধ্যে পরিপক্ক হয়। বাহ্যিকভাবে সুস্থ, সবল ও অপেক্ষাকৃত মোটা বেত গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ছাই মিশিয়ে চটকিয়ে বা তারজালি দিয়ে ফলের বহিরাবরণ ও মাংসল অংশ সহজেই সরিয়ে ফেলা যায়। আবার সংগৃহিত পাকা ফল পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজের আবরণ নরম হয়। এরপর ফল চটের বস্ড়ায় ভরে আছড়িয়ে বীজের খোসাসহ নরম অংশ বীজ থেকে আলাদা করা যায়। এরপর বীজ পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করা হয়। বীজ সংগ্রহের ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজ বপন করা উত্তম। বীজতলা তৈরির জন্য ৩-৪ বার মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করতে হবে। ঝুরঝুরে মাটির সংগে পরিমাণ মতো গোবর সার মিশিয়ে বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। সংগৃহিত বীজ ২ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে অথবা বীজ সরাসরি শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে অথবা ৩ থেকে ৫ মিনিট ৫% মাত্রার সালফিউরিক এসিডে ভিজিয়ে তারপর ধুয়ে বপন করলে অঙ্কুরোদগম হার বেশি পাওয়া যায়। বীজগুলোকে ছাই মাখিয়ে বীজতলার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে এবং বীজের উপর ২ সে.মি. পুরু গুড়া মাটির আবরণ দিতে হবে। বীজ বপনের পর প্রতিদিন সকালে বীজতলায় হালকাভাবে ঝর্ণা দিয়ে পানি দিতে হবে।

পলিব্যাগে চারা স্থানান্তর

জালিবেত সাধারণতঃ বপনের ২১ দিন পর এবং কেরাক বেত বপনের ২-৩ মাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার ১ থেকে ২ মাসের মধ্যে দুটি পাতা সম্পূর্ণভাবে বের হলে অথবা চারা ৪-৫ সে.মি. লম্বা হলে বীজতলা থেকে চারা পলিব্যাগে স্থানান্ড়র করতে হবে। চারা স্থানান্তর করার জন্য ২৫ সে.মি.X ১৫ সে.মি. আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা উত্তম। তবে খরচ কমানোর জন্য ১৫ সে.মি. X ১০ সে.মি. পলিব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। তিন ভাগ মাটি এবং এক ভাগ গোবর সারের মিশ্রণ পলিব্যাগে ভর্তি করে নার্সারী বেডে সাজিয়ে রাখতে হবে। সূচালো কাঠির মাথা দিয়ে বীজতলার ছোট চারাগুলোকে কিঞ্চিৎ মাটিসহ তুলে পলিব্যাগে রোপণ করতে হবে। পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা ১ বছর নার্সারীতে রাখার পর মাঠে রোপণের উপযুক্ত হবে।

বেতের চারা রোপণের স্থান নির্বাচন

উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়ীর আশেপাশে ও তৎসংলগ্ন অনাবাদি পতিত জমি, রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে, গ্রামীণ বসতবাড়ির সীমানায় বেত লাগানোর জন্য উপযুক্ত স্থান। বেত চাষের জন্য পৃথক কোনো জমির প্রয়োজন নেই অন্যান্য বৃক্ষের নীচে সাথী ফসল হিসেবে বেত চাষ করা যায়। বেত আরোহী উদ্ভিদ বিধায় অবলম্বনের জন্য দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ যথা- রেইন-ট্রি, মেহগনি, কড়ই, আকাশমনি, রাজকড়ই ইত্যাদি গাছের সাথে রোপণ করা ভাল।

বেতের চারা রোপণ পদ্ধতি ও পরবর্তী পরিচর্যা

বর্ষা শুরুর সাথে সাথে অর্থাৎ মে-জুন মাসে নির্বাচিত স্থানে ২ মিটার দুরত্বে বেত রোপণের জন্য স্থান চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত স্থানে কাঠি পুঁতে রাখতে হবে। জীবন্ড় বেড়ার ক্ষেত্রে আরো কম দুরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের জন্য চিহ্নিত স্থানে ৩০ সে.মি. X ৩০ সে.মি. X ৩০ সে.মি. আয়তনের গর্ত করতে হবে। মাটির বলসহ চারাটি গর্তে ঠিকমতো বসিয়ে চারপাশের মাটি চারার গোড়ায় সামান্য উঁচু করে চেপে দিতে হবে। রোপণ পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ড় বছরে দুই বার করে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে বেত রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে এটি পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হবে। বেত একবার রোপণ করলে একটি প্রতিষ্ঠিত নতুন ঝাড় থেকে পরবর্তী ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত বেত সংগ্রহ করা যায়।

নোয়াখালী জেলার চর আলাউদ্দীনে ৪ বছর বয়সের জালি বেতের ঝাড়

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড (বগাচতর) এলাকায় ৪ বছর বয়সের কেরাক বেতের ঝাড়

উপকূলীয় এলাকায় বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেত চাষ বিষয়ক গবেষণা সাফল্য

পান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ ২০১০ সাল হইতে ২০১৬ সাল পর্যন্ড় উপকূলীয় এলাকার বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেতের চাষ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণার প্রারম্ভে উপকূলীয় কৃষকদের বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেতের পপুলেশনের উপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাক্ষালীর ১৫% বসতবাড়িতে, ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীর ২% বসতবাড়িতে, নোয়াখালী জেলার চর আলাউদ্দীনের ৭% বসতবাড়িতে এবং চট্রগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড'র ৮% বসতবাড়িতে বাঁশ ঝাড় পাওয়া যায়। অপরদিকে উলেখিত এলাকায় বেতের ঝাড়ের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য ছিল। গবেষণায় ২০১০ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ড় কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে উত্তোলিত মোট ১৫,০০০ টি বাঁশের চারা এবং বীজ থেকে পলিব্যাগে উত্তোলিত জালি ও কেরাক বেতের মোট ২০,০০০ টি চারা নির্বাচিত ১,৭০০ জন কৃষকদের মাঝে বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় রোপণের জন্য বিতরণ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, রোপণের চার বছর পর চর কুকরী-মুকরীতে ছোট বড় মিলে প্রতি ঝাড়ে গড়ে ২১ টি এবং রাঙ্গাবালীতে গড়ে ১৫ টি বাঁশ উৎপন্ন হয়েছে। রাঙ্গাবালীতে বাঁশের বর্ধন হার সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায়। সেখানে সর্বোচ্চ ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা বাঁশ পাওয়া গেছে। আবার চর কুকরীতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ মিটার লম্বা বাঁশ উৎপন্ন হয়েছে। সমগ্র গবেষণা এলাকায় জীবিতের হার গড়ে ৪০.৫০%, গড় উচ্চতা ১১.৩১ মিটার, গড় ব্যাস ৪.৬৭ সেন্টিমিটার এবং ঝাড় প্রতি গড়ে ১৫ টি বাঁশ উৎপন্ন হয়েছে (সারণি ১)।

সারণি ১। উপকূলীয় বসতবাড়িতে রোপিত চার বছর বয়সের বাইজ্জা বাঁশের বর্ধন বিবরণী।

স্থান	জীবিতের হার (%)	গড় উচ্চতা (মি.)	সর্বোচ্চ উচ্চতা (মি.)	গড় ব্যাস (সে.মি.)	সর্বোচ্চ ব্যাস (সে.মি.)	ঝাড় প্রতি বাঁশের সংখ্যা
রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী)	৩০	১৬.৩০	২০.৫৩	৫.২৯	৬.৮৪	১৫.৫০
চর কুকরী-মুকরী (ভোলা)	৪৭	১৩.৪১	১৭.৯৪	৪.১৬	৫.৭৩	২১.২০
চর আলাউদ্দীন (নোয়াখালী)	৫১	৫.৬১	১০.১১	৪.২৭	৬.৩৯	৫.৯২
কলাতলী (কক্সবাজার)	৩৪	৯.৯১	১৬.৩৪	৪.৯৮	৭.০৫	১৬.১০
গড়	৪০.৫০	১১.৩১	-	৪.৬৭	-	১৪.৬৮

গবেষণার বেতের ক্ষেত্রেও আশানুরূপ সফলতা পাওয়া গেছে। রোপণের চার বছর ছয় মাস পর চর কুকরী-মুকরীতে ঝাড় প্রতি গড়ে ২৭ টি এবং রাঙ্গাবালীতে গড়ে ২৫ টি জালি বেত উৎপন্ন হয়েছে। রাঙ্গাবালী ও চর কুকরী-মুকরীতে জালি বেতের বর্ধন হার সবচেয়ে ভাল। চর কুকরী-মুকরীতে সর্বোচ্চ ২১ মিটার লম্বা এবং রাঙ্গাবালীতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ মিটার লম্বা বেত উৎপন্ন হয়েছে। সমগ্র গবেষণা এলাকায় জীবিতের হার গড়ে ৩৬.৭৫%, গড় উচ্চতা ৮.০০ মিটার, গড় ব্যাস ১.৪০ সেন্টিমিটার এবং ঝাড় প্রতি গড়ে ১৭ টি বেত উৎপন্ন হয়েছে (সারণি ২)।

সারণি ২। উপকূলীয় বসতবাড়িতে রোপিত চার বছর ছয় মাস বয়সের জালি বেতের বর্ধন বিবরণী।

স্থান	জীবিতের হার (%)	গড় উচ্চতা (মি.)	সর্বোচ্চ উচ্চতা (মি.)	গড় ব্যাস (সে.মি.)	সর্বোচ্চ ব্যাস (সে.মি.)	ঝাড় প্রতি বেতের সংখ্যা
রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী)	৩৮	১৩.০৩	২০.০	১.৪৩	২.৯৮	২৪.৭০
চর কুকরী-মুকরী (ভোলা)	৪২	১০.১৮	২১.১৫	১.৩৯	২.৮৬	২৭.৪৫
চর আলাউদ্দীন (নোয়াখালী)	৪০	৫.৬০	৭.৫০	১.২৬	৩.১৮	১০.৩২
কলাতলী (কক্সবাজার)	২৭	৩.২০	৯.২০	১.৫৩	৩.২৫	৭.২৯
গড়	৩৬.৭৫	৮.০০	-	১.৪০	-	১৭.৪৪

উপসংহার

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বসতবাড়িতে বাঁশ ও বেত চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উত্তোলন এবং বীজ থেকে বেতের চারা উত্তোলন পূর্বক উপকূলীয় এলাকায় বসতবাড়ির নির্বাচিত স্থানে চাষাবাদ করলে বাঁশ ও বেতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার হবে এবং জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি ঘটাবে। ফলে উপকূলীয় জনমানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধে বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমি ক্ষয়রোধে বাঁশ ও বেত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। কাজেই সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় বাঁশ ও বেতের চাষাবাদের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন।

আমাকে বৃক্ষ করে দাও

মোঃ জায়েদ হোসেন ভূইয়া

মতিঝিল, কাকলি আর গুলিস্তানের
যানজট, সীসা আর কার্বন মনোক্সইড,
বখাটে দালানের সশ্রম কারাদন্ড হতে
জামিন প্রার্থনা করছি।

আমাকে একটিবারের জন্য প্যারেলে মুক্ত করে দিন
মাই লর্ড।

মুক্ত আমি চলে যাব আলীকদমে
মেঘেরা যেথায় ঘুমায় পাহাড়ের কাঁধে
সহোদরা হব পাহাড়ি স্রোতস্বিনীর
পাথর আর জলের খুনসুঁটি দেখে দেখে
কাটিয়ে দেব সারা বেলা।

ঝিরি ঝিরি পাহাড়ি বৃষ্টিতে ভিজব রোডোডেনড্রন ফুলে ফুলে
আলির গুহার গুম গুম আওয়াজের ইকোর বিপরীতে
অম্লজানে ভরে দিব অসুস্থ এই নগরগুলোকে
রাঙাব জীবন ফেব্রুয়ারীতে সালাম, বরকত, জব্বারের
রক্তরাঙ্গা শার্ট কৃষ্ণচূড়া, পলাশ আর রক্ত জবাতে
একাত্তরে শেখ মুজিব মহীরুহ বৃক্ষ হয়ে
ছায়া দেব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

বিধাতা, মানুষ না করে সবুজ বৃক্ষ করে দাও
বৃক্ষের জিহবা নাই
মিথ্যা বলে না ভাই,
সারা দেশে সবুজ অক্সিজেন ফ্যাক্টরী চাই।

Medakocchopia National Park: Challenges to overcome

Mohammad Yousuf

Introduction: Medakocchopia National Park (MKNP) is nationally known for protecting the most extensive stands of mature critically endangered Garjan (Dipterocarpus turbinatus) trees in Bangladesh. MKNP is a tropical semi-evergreen forest on low hills in Fulchari Range of Cox'sbazar North Forest Division. The park is a potential area for climate change mitigation and adaptation with the Carbon-di-oxide sequester capacity of 687 tons per hectare. Originally the entire park area was a rich garjan forest. But due to anthropogenic pressure, some parts have been converted into illegal settlements by the encroachers and some parts of plain low lands are being cultivated for agriculture by the local villagers and farmers. MKNP is bordered by 13 villages where most of the people depend directly or indirectly upon forest. Encroachment by settlement and agriculture has been associated with tree poaching, hunting, and collection of fuel wood, bamboo, cane and other forest products. This is encouraged by sawmills in the vicinity and unemployment. With the successful implementation of Assisted Natural Regeneration (ANR), MKNP presently becomes one of the biodiversity hot spot and attracts more local and foreign tourists, visitors, academics and researchers. Nature lovers can walk through different foot-trails of 1-2 hours walking path and can enjoy enormous green beauty of the park. However, MKNP is facing now some severe challenges and immediate attempts should be taken to overcome those challenges.

Description:

a) **Location and Area:** Medakocchopia National Park (MKNP) is situated in Medakocchopia Block of Medakocchopia Beat of Fulchari Range under Cox'sbazar North Forest Division in Khutakhali Union of Chakaria Upazila of Cox'sbazar District. The park is around 40.0 km north from Cox'sbazar and 5.0 km south from Dulahazara Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park and located on both sides of Cox'sbazar-Chittagong Highway with an amazing undulating landscape of 395.93 ha of which reserved forest (RF) area is 358.99 ha and the rest 36.94 ha area is of protected forest (PF).

b) **Declaration as National Park:** The forest area is declared as Medakocchopia National Park under the provision of Wildlife Preservation Order 1973 in the year 2004 by the Gazette Notification No. moef (br-3)-32/2003/356 dated 04/04/2004.

c) **Forest Type:** The ecological type of the forests of Medakocchopia National Park is tropical semi-ever green forest.

d) **Vegetation Cover:** The most part of Medakocchopia National Park is covered with dominant and co-dominant hundred years old mature and over-mature Dipterocarpus turbinatus and some other garjan trees of the species of Dipterocarpus costatus, Dipterocarpus alatus and Dipterocarpus gracilis. Other associated native forest trees present include Telsur (Hopea odorata), Boilam (Anisoptera scaphula), Gamar (Gmelina arborea), Chapalish (Artocarpus chaplasha), Jam (Syzigium spp), Jarul (Lagerstroemia speciosa), Kadam (Anthocephalus kadamba), Arjun (Terminalia arjuna), Polash (Butea monosperma), Batna (Quercus spp.), Civit (Swintonia floribunda), Uri am (Mangifera sylvestris), Sonalu (Cassia fistula), Amloki (Emblica officinalis), Horitoki (Terminalia chebula), Bohera (Terminalia belerica), Dumur (Ficus hispida), etc.

e) **Wildlife Status:** Medakocchopia National Park is now the area of more diversified wildlife. It is the home of some 13 amphibian species, 30 reptile species, 21 mammal species and 168 bird species. With the implementation of Assisted Natural Regeneration (ANR), MKNP area has now become a good shelter of most threatened wild Asian Elephant. It is the home of Hog Badger, White-crested Laughing Thrush and the globally vulnerable Great Slaty Woodpecker. Among 16 indicator bird species found in the forest area of Bangladesh except Sunderban, 11 are available in Medakocchopia National Park area. These include Red Junglefowl, Oriental Pied Hornbill, Green-billed Malkoha, Crested Serpent Eagle, Scarlet Minivet, Greater Racket-tailed Drongo, White-rumped Shama, Common Hill Myna, Abbott's Babbler, Puff-throated Babbler and Crimson Sunbird.

Assistant Conservator of Forests, Cox'sbazar North Forest Division

f) **Population, Literacy rate and Profession:** Approximately 3500 families are living within the area of MKNP and in surrounding 13 villages. Total population is approximately of 19,249 persons of which male 10,514 nos. and female 8,775 nos. Literacy rate is around 24%. Out of total population 87% are Muslim and rest are Hindus and Buddhists. Most people are dependent on agriculture.

Co-Management Status:

a) Date of formation of co-management: 17th November 2009
b) Area coverage: 395.93 hectares
c) Co-management council: 01 no.
d) Co management committee: 01 no.
e) Village Conservation forum: 13 nos.
f) Community patrolling group (CPG): 1 no.
g) CPG member: 35 nos. (Male- 31 nos. and female- 4 nos.)
h) Nishorgo Shohayok (VCF level Facilitator): 13 nos.
i) Peoples Forum: 01 no, member- 26 nos. (Male- 13 nos. and female- 13 nos.)
j) Eco-tour guide: 06 nos.

Plantation activities:

a) A.N.R: 100.0 ha in 2014-15.
b) Cane plantation: 20.0 ha in 2013-14.
c) Ornamental tree plantation: 2.0 ha (5,000 nos. of seedlings) in 2012-13.

Eco-tourism activities:

a) Park office: 1 no.
b) Parking area: 200 sq m.
c) Picnic corner: 1 no.
d) Round shed: 1 no
e) Visitors' round shed: 2 nos. (done by CREL)
f) CPG patrol shed: 3 nos. (done by CREL)
g) Ticket counter: 1 no. (done by CREL)
h) CMC office: 1 no. (done by CREL)

Prevailing threats and challenges:

a) The proposed Dohazari - Cox'sbazar railway will go through Medakocchopia National Park splitting it into two parts by removing some potential garjan mother trees. This will create noise pollution, habitat fragmentation and casualty risk to the wildlife including most threaten Asian elephant residing in the park.
b) The Cox'sbazar - Chittagong highway going through Medakocchopia National Park will be further expanded into 4-lane that will also create further habitat fragmentation and casualty risk to the wildlife leaving narrower space for most threaten Asian elephant residing in the park.
c) A tendency of the evicted families from the alignment of the railway and 4-lane highway to further encroach the remaining national park areas and make illegal settlements to take refuge over there.
d) Electric line, telephone line, optical fiber line, etc. going through the park disturbs root system and crowns of the trees of the alignment.
e) Illegal occupation and conversion of the park land by some unauthorized educational and religious institutions, illegal settlements, hat-bazars, agriculture, etc.
f) Excessive illegal human settlements in the park gives scope for over exploitation of forest resources and thus making human-elephant conflicts. They use younger natural regenerations as fuel-wood and do not allow them to grow up.
g) Use of younger garjan trees and saplings in the near-by salt production fields.
h) Lack of manpower and improper logistic support.
i) Lack of transport, fuel and lubricants.

j) No fund for implementing more ANR and guarding the ANR already established.
k) Influence of politicians and influential in unauthorized occupation of the forest lands and construction of illegal settlements over there and opposing by them in case of eviction of encroachments from forest lands.
l) Disputes of land ownership over forest lands of national park resulting differences in the maps and records of R.S survey and B.S survey. Some notified reserved and protected forest lands of national park were intentionally or mistakenly recorded as private lands or khas lands in the B.S survey though these were originally recorded in the R.S survey as forest lands.
m) Traditional system of forest villages and forest villagers and the uncontrolled and unmanaged usufruct right over forest land they exercise is the great concern today for forest department.
n) Vested interest of some of the co-management committee and council members of graving forest lands and not releasing the forest lands for scientific management of national park which were previously occupied, settled and cultivated by them illegally.
o) Lack of approved long term master plan/management plan for the scientific management of the national park.

Suggestions/recommendations to overcome the threats and challenges:

a) The proposed railway and 4-lane highway should be aligned, designed and constructed in such a way of incurring less cost and minimum loss to the national park.
b) There should be an arrangement of sufficient over-pass and under-pass corridor for the uninterrupted and easier movement of wild elephant and some other wild animals.
c) Electric line, telephone line, gas line, optical fiber line and other utility pipe lines can go through beneath the island in the middle of the 4-lane highway to avoid damages of crown and root system of the forest.
d) All kinds of illegal establishments, settlements and encroachments should immediately be evicted and the identified landless poorer can be rehabilitated in a minimum area of ecovillages inside or outside the PA providing necessary facilities.
e) Sufficient skill development trainings and alternative income generation activities should continuously be carried out among the local poor to make them self-sufficient and divert them from forest dependency.
f) Fast growing firewood plantation can be established in the impact zone of national park to meet acute demand of fuel-wood.
g) Substitute of garjan pole can be popularized in salt production.
p) Immediate measures should be taken to correct the false records of forest lands as private or khas lands in BS survey maps and records which were originally recorded in the RS survey as forest lands.
h) Traditional system of forest villages and forest villagers should critically and justifiably be examined and the forest lands over which they do practice their usufruct right can be taken under scientific forest management.
i) Sufficient professional trained staffs should be employed with modern equipment and all necessary logistic supports.
j) Sufficient fund for implementing more ANR and guarding the ANR already established should be provided.
k) Transport facilities should be provided with the supply of necessary fuel and lubricants.
l) Sufficient number of modern arms and ammunition should be provided and regular training should be arranged for the field staffs.
m) Long term master plan/management plan for the scientific management of the national park should be undertaken.
n) Protected Area Rules and/or Co-management Rules should be designed in such a manner that no illegal occupier of forest land can possess any of the positions of Co-management Committee and Co-management Council of the Protected Area.
o) Remuneration of the Community Patrol Group members should reasonably be increased.

Figure 1 MKNP

Figure 2 MKNP

Figure 3 MKNP

“সবুজ হবে মোদের মন“

এ,বি,এম নজরুল ইসলাম

এই আমাদের জন্মভূমি
এইতো মোদের দেশ
সবুজ শ্যামল সুখের রেশ
লাগবে তখন আহা বেশ।

গাছ লাগাই আর ফসল ফলাই
থাকবে না কোথা খালি
মাটি ভেদে থাকবে গাছ
হো'ক না সেথা বালি।

নদী নালা খালে বিলে
গাছ লাগাই পথের ধারে
ঘরের ছাদে-মাটির টবে
আরো লাগাই নদীর পাড়ে।

লাগাবো গাছ উঠতি চরে
সাগর তীরে পাহাড় পরে
যখন,গাছের পাতা নড়ে চড়ে
হৃদয় মন কার না কাড়ে ?

অক্সিজেন বিলিয়ে দেয়
সারাদিনমান রেখে।
কার্বন-তো শুষিয়ে নেয়
গভীর রাতের আঁধারে।।

ফরেস্ট রেঞ্জার, সামাজিক বন বিভাগ,বগুড়া

টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন সংরক্ষণ:
সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস -২০১৭

- মার্জিয়া লিপি

২০০৮ সালের মার্চের ২৩ তারিখে টেকনাফ বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের শীলখালী সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বন পাহারা দলের সদস্য রফিকুল ইসলাম সাহসিকতার সঙ্গে বন রক্ষা করতে গিয়ে বন দস্যুর হাতে শহীদ হন; জীবন উৎসর্গ করেন। রফিকুল ইসলাম ছাড়াও কাপ্তাইএর হিরু মিয়া ও অন্যান্য সদস্য - যাঁরা বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতি সংরক্ষণে বনের সম্পদ রক্ষায় জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন – তাঁদের আত্মত্যাগের স্মরণে ও সম্মানে, সকল সবুজ শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশে বনবিভাগ, ইউএসএইড ও রক্ষিত এলাকায় আশেপাশে বসবাসকারীদের যৌথ উদ্যোগে এই দিনটিকে উদযাপিত হচ্ছে 'সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস'।

চিত্র: সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস - ২০১৬ তে "সাসটেইনেবল ফিনান্সিং অব কো-ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক সংলাপ

জীবন ও জীবিকার অন্যতম অবলম্বন প্রকৃতি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রকৃতির অবদান অনস্বীকার্য। অথচ প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, উন্নয়ন কার্যক্রম, বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের বনজ সম্পদ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। হ্রাস পেয়েছে বনে বসবাসকারী জীববৈচিত্র্য ও উদ্ভিদরাজি; লুপ্ত হয়েছে অনেক পাখি ও বন্যপ্রাণী । বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে আসছে। সময়ের বিবর্তনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের জনবলের পক্ষে সারাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বিশাল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন এখন আর সঠিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না - প্রয়োজন সম্পদ রক্ষায় নির্ভরশীল জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ অবস্থার উন্নয়ন ও উত্তরণের জন্যে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই সহ ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় সরকার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এই অংশীদারীত্বই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। সম্পদ রক্ষায় ও ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন । দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় এই ধারণাটি নতুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে জনগণের অংশগ্রহণে সফলতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করে আসছে। আশির দশকে আমাদের দেশেও সফলতার সঙ্গে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত সামাজিক বনায়নের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০০৩ সালে ইউএসইইড এর আর্থিক সহায়তায় বন বিভাগ বন ব্যবস্থাপনায় নিসর্গ প্রকল্পে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পাইলটিং করেছে। সরকারের প্রজ্ঞাপণের বলে বনবিভাগ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন, সুশীল সমাজ, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, রক্ষিত এলাকার বনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একযোগে সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। জলাশয় ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাও সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণের সমন্বয়েও এরূপ সংগঠন রয়েছে। আইপ্যাক (ইন্টিগ্রেটেড প্রটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট) প্রকল্প সময়কালে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে । ২০১৩ সালে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এণ্ড লাইভীহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্পে - ২১ টি রক্ষিত এলাকায় ২৭ টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কৌশলে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতি বছর বনবিভাগ ও সকলের সাথে যোগাযোগ করে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। পরিকল্পনার ভিত্তিতে বন, বন্যপ্রাণী ও বনের উপর নির্ভরশীল মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জীবন ও জীবিকার উন্নয়নেও কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন বন আর প্রকৃতি সংরক্ষণে কাজ করছে আগামী প্রজন্মকে নিয়ে সুন্দর একটা বাংলাদেশে বেঁচে থাকার জন্যে। প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকায় যারা বাস করে, বনের আশে পাশে যারা বেড়ে উঠে তারা নিজেদেরকে প্রকৃতির অংশ মনে করে। নিজেকে মনে করে প্রকৃতির সন্তান, বনকে মনে করে নিজের মায়ের মতো। বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা-সিডর-আইলা-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে বনভূমি মানুষকে মায়ের মতো আগলে রাখে, আশ্রয় দেয়। বনের কাঠ, গোলপাতা থেকে তারা ঘর-বাড়ী, আসবাব পত্র তৈরি করে, নদীর মাছে জীবিকা অর্জন করে, বনের ফল ও মধু তাদের পুষ্টি যোগায়।

চিত্রঃ সিপিজি এর সদস্যদের বন পাহাড়া

চিত্রঃ বিশ্ব বাঘ দিবস উদযাপন

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনে প্রায় ১৬০০ কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপ (সিপিজি) এর প্রতিনিধি বনপ্রহরীদের সাথে বন পাহারা দিচ্ছে। যৌথ টহল দল (সিপিজি) সদস্যরা কিভাবে বন পাহারা দিতে হয়, গাছ-মাছ-বন্যপ্রাণীর অবস্থা বুঝতে হয়, রিপোর্ট রাখতে হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছে, দেশ-বিদেশ থেকে প্রকৃতি সংরক্ষণে বন পাহারায় বিভিন্ন সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছে। টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের খুরশীদা বেগম বনের যৌথ অংশীদারিত্বের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই পুরস্কার ২০১২' অর্জন করেছেন। সহ ব্যবস্থাপনায় তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এই পুরস্কার পান। 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তৃতীয় বিশ্ব বন সপ্তাহের সভায় ইটালির রাজধানী রোমে খুরশীদা বেগম এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। তিনি 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই' পুরস্কারটি অর্জন করেন একজন প্রথম নারী পরিবর্তনকারী হিসেবে তাঁর সমাজে ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। টেকনাফ অভয়ারণ্যের খুরশীদা বেগম প্রথম নারী যিনি বাংলাদেশে প্রথম নারী কমিউনিটি পাহাড়া দলের সূচনা করেন।

চিত্রঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় সিপিজি সদস্য খুরশীদা বেগরমের 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই' পুরস্কার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি

সব ধরনের সক্ষমতা থাকার পরও সংগঠন অকার্যকর হয়ে পড়ে মূলত যে কারণে তা হচ্ছে তহবিলের অভাব। আয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট উৎস না থাকলে এবং খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠান বেশিদিন ভালোভাবে পরিচালিত হয়না। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠান যদি হয় সেবা মূলক তা হলে জনগণের প্রত্যাশা থাকে বেশী। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রতি নির্ভরশীর মানুষের আকাঙ্খা ভিন্ন। এই পদ্ধতির মূল আকাঙ্খাই হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, স্থানীয়ভাবেই বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুবিধা স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করা। এ ক্ষেত্রে সংগঠনের স্থায়িত্বের জন্যে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য তহবিল সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা ও টেকসই বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সহ-ব্যবস্থাপনার অংশ। এ তহবিল সংগ্রহ হতে পারে রক্ষিত এলাকা দর্শনার্থীদের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যেমন গাড়ী পার্কিং, বনে হাইকিং, ঐতিহ্যবাহী উপহার সামগ্রী বিক্রয়, নিরাপদে রাত্রি যাপণের ব্যবস্থা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য দাতা সংস্থার কাছ থেকে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য আবেদন করে তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন খরচ নির্বাহের জন্য সার্ভিস চার্জ নেয়া যেতে পারে। সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ ডাক বিভাগ কিংবা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবেও রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ তহবিল সংগ্রহের কোনো একক উৎসের উপর নির্ভর না করে সৃজনশীলভাবে বহুমাত্রিক উৎস বিবেচনা করতে হবে।

চিত্রঃ স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের পরিচালনায় প্রকৃতি পর্যটন

অর্থনেতিক সক্ষমতা কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব অর্জনের পূর্ব শর্ত। আমাদের এই দেশ প্রকৃতি-পর্যটনের জন্য খুব বেশী উপযোগী - আমাদের প্রকৃতি, পাহাড়, বন্যপ্রাণী, নিসর্গ আর জলাজঙ্গল। প্রকৃতি-পর্যটন হতে পারে আমাদের অন্যতম আয়ের পথ - যেখানে সরকার পর্যটনের পুরো আয় সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রদান করবে। ফলে বনের উপর অপরিকল্পিত ভাবে সম্পদ আহরণকারী ও নির্ভরশীল মানুষের আয়ের পথ সুগম হবে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে বনের ও বনজীবি মানুষের । সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও বন পাহাড়া দলের সদস্যদের মাধ্যমে প্রকৃতি পর্যটন সংরক্ষিত এলাকাগুলোয় একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের অবকাশ সৃষ্টি করে উপরন্তু ঐ এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। তবে এসকল প্রকৃতি পর্যটন খুব সতর্কভাবে সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে অবস্থান জীববৈচিত্র্যের কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। একই সঙ্গে এ পর্যটন খাত থেকে উদ্ভুত বা সৃষ্ট আয় থেকে যাতে করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও বন পাহাড়া দলের সদস্যরা উপকৃত হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম প্রচার- প্রচারণায় শুধুমাত্র প্রকৃতি অনুরাগী ও প্রকৃতি বান্ধব পর্যটকদের এসকল পর্যটন স্থানসমূহে আসার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হবে। সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি পর্যটন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ- প্রকৃতি সংরক্ষণে সচেতনতা ও প্রকৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিবিধ জীবিকায়নের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের পথ সুগম করে।

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের প্রকৃতি সংরক্ষণ ও জীবিকা উন্নয়নে ম্যানগ্রোভ নার্সারী ও রপ্তানীযোগ্য সূতার তৈরী খেলনা

বাণিজ্যিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে প্রতিবেশ বান্ধব কোনো কাজের জন্য সহায়তা যা - প্রকৃতি সংরক্ষণে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অথবা সহ- ব্যবস্থাপনা সংগঠনের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বেশ কয়েকটি আর্থিক উৎসের সুযোগ হতে পারে-

সরকার হতে বার্ষিক বরাদ্দ; জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ হতে উন্নয়ন বরাদ্দ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা; শিল্প-কারখানার মালিকদের কল্যাণ তহবিল, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ব্যাংকএর সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল, সামাজিক বনায়ন, প্রকৃতি পর্যটন, ব্যক্তিপর্যায়ে অনুদান, সিএমসির জন্য এনডোমেন্ট ফাণ্ড, সরকারের জলবায়ু তহবিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০১৭ সালে সহ-ব্যবস্থাপনা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ''টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন সংরক্ষণ"। টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সকলের অংশদারীরত্বের মিলিত ও কার্যকর প্রয়াস প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে কাঙ্খিত অর্জনের লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে।

জাতীয় স্বার্থে বন সৃজন অপরিহার্য

আফতাব চৌধুরী

মানুষসহ সমগ্র প্রাণীজগতের প্রতি প্রকৃতির অমূল্য অবদান অরণ্য। অরণ্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ (ফরেস্ট)। শব্দটি মূল লাতিন ভাষার শব্দ 'ফরেস' থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে 'আউটসাইড'। এ 'আউটসাইড' শব্দটি গ্রামের সীমা নির্দেশ করেছিল। যেখানে অনাবাদি জমি মনুষ্য বসতি অঞ্চলেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট এক অঞ্চল হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। সমগ্র বিশ্বের ভৌগোলিক আয়তনের এক তৃতীয়াংশই বনাঞ্চল। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকার জীবজন্তুর আবাসভূমি এ বনাঞ্চল সমূহ। মানব সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে নানা ভাবে সহায়তা করা ছাড়াও পরিবেশ দূষণমুক্ত করে রাখে। উপরন্তু জলবায়ুর উপাদান যেমন উষ্ণতা, বর্ষণ, আর্দ্রতা ইত্যাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করে অরণ্যগুলো আবহাওয়া তথা জলবায়ু বহু পরিমাণে মানব সমাজের অনুকূল করে তোলে। শুধু কি এটাই? দেশের অরণ্যরাজি পাহাড়ি অঞ্চলের পাদদেশে পানি প্রবাহের ধারাও নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরে রাখে। বনাঞ্চলের উপকারিতার শেষ নেই। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের কথা, প্রকৃতি প্রদত্ত এ অমূল্য সম্পদের সংকোচন ঘটছে দ্রুতহারে আমাদের এদেশে।

জাতিসংঘের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৯১ সালে বিভিন্ন কারণে এক কোটি সত্তর লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল ভূপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সবুজভূমি, মরুভূমি, পাহাড়, পুকুর,হ্রদ, নদী, সাগর ইত্যাদির মতো বনাঞ্চলও বাস্তুতন্ত্রও ধ্বংসযজ্ঞে সক্রিয় তথা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে মানব সমাজ। বর্তমানে বিশ্ব ভূখন্ডের মাত্র ত্রিশ শতাংশেই বনভূমি রয়েছে। বিশ্বে প্রতি বছর ১ কোটি হেক্টর ক্রান্তীয় অরণ্যভূমি ধ্বংস হয়।

যে কোন দেশের ভৌগলিক আয়তনের শতকরা ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন যদিও বাংলাদেশে আছে মাত্র ৭/৮ শতাংশ। এ পরিমাণহ্রাস পাওয়াটা নিঃসন্দেহে চিন্তা জনক বিষয়। প্রতি ২৪ ঘন্টায় দেশে প্রায় ১ লক্ষ গাছ ধ্বংস হয় বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। যখন-তখন বনাঞ্চল সংহার করার ফলে অন্যান্য কুফলের সঙ্গে মরুভূমির সম্প্রসারণ ঘটছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিশাল বনাঞ্চল কেবল মানুষের লোভে ধ্বংস হয়েছে। চাষাবাদ, শিল্পায়ন, নগরায়ণ এ তিন কারণই মুখ্যত বনভূমি ধ্বংসের জন্য দায়ী। আর এক্ষেত্রে কৃষির জন্য সর্বাধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। কৃষিকাজের সম্প্রসারণ বনভূমি ধ্বংসের জন্যও দায়ী।

দ্রুতহারে অরণ্যাঞ্চল কমে আসার কুফল মানব সমাজ ইতিমধ্যেই ভোগ করছে। আধুনিক মানব সভ্যতাকে গতি প্রদান করার ব্যাপারে উলেখযোগ্য অবদান রয়েছে বনভূমির। কিন্তু অরণ্যসমূহের প্রতি মানুষ যে অন্যায় আচরণ করছে তা একদিন মানব সভ্যতার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করবে। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সইডের ভারসাম্য রক্ষায় বৃহৎ পরিমাণের সবুজ গাছ-গাছালি উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভূ-মন্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাস-কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমন্ডলে বেড়ে গেছে। দ্রুতহারে বনানী ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। ভূ-মন্ডলের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন বিজ্ঞানীমহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

অরণ্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে কার্বন-ডাই-অক্সইডের পরিমাণ কম করে তা নয়, অন্যভাবেও সহায়তা করে। প্রকাশিত দুটি তথ্যেই এর প্রমাণ মিলে। ২.৫ একর বিশিষ্ট একটি বনাঞ্চল বায়ুমন্ডলের প্রায় ৪ টন পরিমাণের ধুলো শোষণ করতে পারে। এছাড়া একটি ঘন অরণ্যভূমি বছরে প্রতি একর জমিকে গ্রাস করতে পারে এমন ০.১৬ টন সালফার-ডাই-অক্সইড অপসারণে সমর্থ হয়। আমরা সবাই জানি সালফার-ডাই-অক্সাইড এক ধরনের দূষিত গ্যাস। শব্দদূষণ রোধের ক্ষেত্রেও অরণ্যের ভূমিকা রয়েছে। গাছ শব্দের তীব্রতা ১০ থেকে ১৫ ডেসিবল কমাতে পারে।

ভূমিস্খলন রোধ, বৃষ্টির পানি ধরে রাখা, মরুভূমির বিস্তার রোধ, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর উপাদান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলবায়ু, আবহাওয়া, মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীকুলের অনুকূলে রাখা ইত্যাদি বহু সুফল ছাড়াও ঔষধিগুণ বিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ উদ্ভিদ অরণ্যে পাওয়া যায়। গাছপালা নিধনের ফলে আমরা যে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়োল মারছি তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

অরণ্যঘেরা কোনও এলাকার বায়ু আর্দ্র অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ুপ্রবাহের উষ্ণতা স্বাভাবিক ভাবেই শীতল অবস্থায় থাকা বনভূমির বায়ুর সংস্পর্শে কমে এবং এর ফলে বৃষ্টি হয়। এ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় ভাবে বর্ষণের বিতরণেও অরণ্য প্রভাব ফেলে। বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে অনেক সময়ে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মরুভূমির বালিকণা, ঘূর্ণিঝড় অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির সম্প্রসারণ ঘটায়। গাছ-গাছালি থাকলে মরুভূমির বিস্তার বাধা পায়, কারণ বালিকণা আটকে থাকে গাছের লতাপাতায়। তা ছাড়া, বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়ে মরুভূমির শুস্ক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয় না। ফলে মরুভূমি বিস্তার লাভ করতে পারে না। অরণ্যের এ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ভারতের একমাত্র মরুভূমি থর মরূভূমির লাগোয়া অঞ্চলে ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮ কিলোমিটার চওড়া অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ করে অরণ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা এক বিরাট সাফল্য।

বাতাস ও পানির আঘাতে ভূমির ক্ষতি হয়। অরণ্য কিন্তু এ ক্ষতি থেকে ভূমিকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের দেশে বছরে হাজার হাজার একর জমি বাতাস পানি দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অরণ্য ধ্বংস হওয়ার ফলেও ভূমির খলন দ্রুত ঘটছে। অন্যদিকে জুম চাষের জন্য দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বনাঞ্চল অনেকটা কমেছে। আর এতে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বেড়েছে। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে জুম চাষ নামে পরিচিত স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। জুম চাষের জন্য দেশে বছরে হাজারো হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হয় বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। ক্রান্তীয় অরণ্যাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রতিদিন লুপ্ত হচ্ছে মানব সমাজের প্রয়োজনীয় ১০০ ধরনের মূল্যবান বনজ সম্পদ।

বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বনজ জীব-জন্তুর আবাসভূমির অভাব ঘটছে এবং অনেক বন্য জীবজন্তু খাদ্যভাব বা অন্যান্য কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়াও জনবসতি গুলোতে তারা বেরিয়ে আসার ফলে অনেক মূল্যবান মানব জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটছে। হাতি, বাঘের উপদ্রবের খবরও মাঝেমধ্যে সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে। অরণ্যভূমি ধ্বংসের অন্যতম কুফল এটা। বনাঞ্চলের উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর সংরক্ষণ তথা রক্ষণাবেক্ষণের ওপর বর্তমানে যথেষ্ট সরকারী, বেসরকারী এমনকি সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায়েও গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বনানীকরণ ও পুনর্বনানীকরণের উপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক বনানীকরণ কর্মসুচি ক'বছর আগে শুরু করেছিল সরকার। অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি প্রোগ্রামে এক টুকরো জমিতে চাষাবাদ, গাছ লাগানো ইত্যাদি করা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পতিত জমির সদ্ব্যবহার হয়। এর ফলে চাষিরা শস্য ছাড়াও পশুখাদ্য, জ্বালানি হিসেবে খড়ি, ফলমূল ও কাঠ পান।

পর্যাপ্ত বনভূমি থাকার পরও প্রতিবেশী দেশ ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভূটান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম তাদের নিজ নিজ দেশের বনাঞ্চলকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ সকল দেশে সামাজিক বনানীকরণ বিভাগ অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি, কম্যুনিটি ফরেস্ট্রি, কর্মাশিয়াল ফরেস্ট্রি এবং আরবান ফরেস্ট্রিসহ বিভিন্ন কর্মসুচী হাতে নেয়া হয়েছে। অরণ্য সমূহের উপর মানব সমাজের বিভিন্ন কারণে প্রয়োগ করা চাপ কম করাটা সামাজিক বনানীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। বনাঞ্চলগুলোর নিবাসী মূল্যবান বন্যপ্রাণীগুলোর সংরক্ষণের জন্যও প্রণয়ন করা হয়েছে নানা কর্মসূচী। ভারত সম্ভবত বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যেখানে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দেশে বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রোজেক্ট টাইগারের জন্য কুড়িটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য বাছাই করা হয়েছে। বন্য জন্তুগুলোর প্রাকৃতিক আবাসভূমি অরণ্যসমূহের সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বছরব্যাপী বন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারতসহ অন্যান্য দেশে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আমি এখানে ক'টি উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাই, আশা করি পাঠকমহল অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, সততা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা থাকলে যে কোন মহৎ কাজে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং এতে সফলতা আসে- যেমন ২০১৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব রাহাত আনোয়ারের (বর্তমান সিলেটের জেলা প্রশাসক) নেতৃত্বে ''সবুজ তারাগঞ্জ গড়ি'' কর্ম পরিকল্পনার আওতায় ১৩৫টি রাস্তায় সকাল ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে মাত্র ১ ঘন্টা সময়ে আড়াই লাখ গাছের চারা রোপণ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ৪৫টি ওয়ার্ডের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জন-প্রতিনিধি, ইমাম, সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, কৃষকসহ বিভিন্ন পেশার ৩৫ হাজার মানুষ ৪৬০ কিলোমিটার রাস্তার উভয় পার্শ্বে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকি, মেহগনি, বকুল,

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়াসহ ৪০ প্রজাতির ফল, ফুল, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেন। চারা গাছ রোপণের এ মহৎ কাজে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের প্রত্যেকেই রোপিত গাছের চারা বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন উপস্থিত জন সমাবেশে।

জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ারের মহৎ এ উদ্যোগ সকল মহলে প্রশংসিত হয়। জেলার অনেকেই বৃক্ষ রোপণের মত মহৎ কাজে আগ্রহী হয়ে গাছের চারা রোপণে এগিয়ে আসেন এবং অনেক সরকারী বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এমনকি ব্যক্তি পর্যায়েও অনেকেই গাছের চারা রোপণ করে তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন বৃক্ষরোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তা বাঁচিয়ে রাখা এবং বনাঞ্চল সৃষ্টি করা এক মহৎ কাজ। তিনি এও বলেন যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে কোন মহৎ কাজে সফলতা আসেই।

আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রয়াসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে যদি আমরা বৃক্ষরোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করি তাহলে এদেশকে সবুজে সমৃদ্ধ করা কোন কঠিন কাজ নয় এবং এটাই হবে সবচেয়ে মহৎ কাজ, যা প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই প্রয়োজন।

আমাদের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট পাহাড়ী দেশ ভুটানের দিকে তাকাই। এদেশের জনসংখ্যা মাত্র ৩ লাখের মত। ভূটানের রাজা জিগমে খেসর পিয়াল ও রানী জেটসুন প্রেমার ঘরে জন্ম নিয়েছে প্রথম সন্তান । এ উপলক্ষে দেশের জনগণ এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন প্রজাতির বিশেষ করে ফলজ ১ লক্ষ আট হাজার গাছের চারা একদিনে রোপন করেছেন দেশের জনগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে । গত ৫ ফেব্রুয়ারী রাজা খেসর রানী প্রেমা তাদের প্রথম সন্তান জন্ম হওয়ার ঘোষণা দেন। প্রতিটি গাছে নবজাতকের জন্য এক একটি প্রার্থনা সেটে দেওয়া ছিল। দীর্ঘায়ূ, সুন্দর সহানুভূতির প্রতীক গাছকে বৌদ্ধ ধর্মে পবিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। গাছের চারা রোপনের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৮ হাজার সংখ্যাটিই মানা হয়েছিল। কেননা বৌদ্ধরা ১০৮ সংখ্যাটি পবিত্র বলে মনে করেন। ৮২ হাজার পরিবার ১টি করে গাছের চারা রোপন করেছে। গাছের চারা রোপন করে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে রোপিত গাছের প্রতিটি চারা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করে বড় করে তুলবে। এতে ছোট দেশ ভূটান আরও সমৃদ্ধশালী হবে। এর আগের বছর এক ঘন্টায় ৫৯ হাজার ৬৭২ টি গাছের চারা রোপন করে বিশ্ব রেকড সৃষ্টি করেছিল এ ভূটানিরাই। উলেখ্য ভূটান ছোট দেশ হলেও ফলজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাদের দেশের প্রতিটি মানুষই দেশপ্রেমিক, রাজাভক্ত এবং দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ল্যাবি এইচ এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. ডাবিউ জামান বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ নিয়ে এক গবেষণা করে জানিয়েছেন দেশের সড়ক, রেলপথ, নদী, খালের দুই পাশে চা বাগানের পরিত্যক্ত ভূমি এবং টিলা পাহাড়ে পরিকল্পিত ভাবে ১২০ কোটি ফলদ বৃক্ষ লাগিয়ে ১০ বছরে মাত্র ফল ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ করা খুবই সহজ। এতে ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে এই সঙ্গে ৫০-৬০ লক্ষ টন ফল বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। পশু পাখির আগমন ভারবে, সুন্দর হবে পরিবেশ, অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, দেশ হবে সমৃদ্ধশালী। আমাদের সরকারের নীতি নির্ধারকরা এ ব্যাপারে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসলে এ কাজে সফলতা খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

যে কোনও প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য জনগণের সহযোগিতা জরুরী। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে বনধ্বংসে লিপ্ত দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হতে হবে। সরকারকেও এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। মনে রাখতে হবে মূল্যবান একগুচ্ছ গাছ ধ্বংস করতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু সে গাছ গজিয়ে উঠতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রবীণ সাংবাদিক-কলামিস্ট। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার (১ম স্বর্ণ পদক) প্রাপ্ত।

f) **Population, Literacy rate and Profession:** Approximately 3500 families are living within the area of MKNP and in surrounding 13 villages. Total population is approximately of 19,249 persons of which male 10,514 nos. and female 8,775 nos. Literacy rate is around 24%. Out of total population 87% are Muslim and rest are Hindus and Buddhists. Most people are dependent on agriculture.

Co-Management Status:

a) Date of formation of co-management: 17th November 2009
b) Area coverage: 395.93 hectares
c) Co-management council: 01 no.
d) Co management committee: 01 no.
e) Village Conservation forum: 13 nos.
f) Community patrolling group (CPG): 1 no.
g) CPG member: 35 nos. (Male- 31 nos. and female- 4 nos.)
h) Nishorgo Shohayok (VCF level Facilitator): 13 nos.
i) Peoples Forum: 01 no, member- 26 nos. (Male- 13 nos. and female- 13 nos.)
j) Eco-tour guide: 06 nos.

Plantation activities:

a) A.N.R: 100.0 ha in 2014-15.
b) Cane plantation: 20.0 ha in 2013-14.
c) Ornamental tree plantation: 2.0 ha (5,000 nos. of seedlings) in 2012-13.

Eco-tourism activities:

a) Park office: 1 no.
b) Parking area: 200 sq m.
c) Picnic corner: 1 no.
d) Round shed: 1 no
e) Visitors' round shed: 2 nos. (done by CREL)
f) CPG patrol shed: 3 nos. (done by CREL)
g) Ticket counter: 1 no. (done by CREL)
h) CMC office: 1 no. (done by CREL)

Prevailing threats and challenges:

a) The proposed Dohazari - Cox'sbazar railway will go through Medakocchopia National Park splitting it into two parts by removing some potential garjan mother trees. This will create noise pollution, habitat fragmentation and casualty risk to the wildlife including most threaten Asian elephant residing in the park.
b) The Cox'sbazar - Chittagong highway going through Medakocchopia National Park will be further expanded into 4-lane that will also create further habitat fragmentation and casualty risk to the wildlife leaving narrower space for most threaten Asian elephant residing in the park.
c) A tendency of the evicted families from the alignment of the railway and 4-lane highway to further encroach the remaining national park areas and make illegal settlements to take refuge over there.
d) Electric line, telephone line, optical fiber line, etc. going through the park disturbs root system and crowns of the trees of the alignment.
e) Illegal occupation and conversion of the park land by some unauthorized educational and religious institutions, illegal settlements, hat-bazars, agriculture, etc.
f) Excessive illegal human settlements in the park gives scope for over exploitation of forest resources and thus making human-elephant conflicts. They use younger natural regenerations as fuel-wood and do not allow them to grow up.
g) Use of younger garjan trees and saplings in the near-by salt production fields.
h) Lack of manpower and improper logistic support.
i) Lack of transport, fuel and lubricants.

j) No fund for implementing more ANR and guarding the ANR already established.
k) Influence of politicians and influential in unauthorized occupation of the forest lands and construction of illegal settlements over there and opposing by them in case of eviction of encroachments from forest lands.
l) Disputes of land ownership over forest lands of national park resulting differences in the maps and records of R.S survey and B.S survey. Some notified reserved and protected forest lands of national park were intentionally or mistakenly recorded as private lands or khas lands in the B.S survey though these were originally recorded in the R.S survey as forest lands.
m) Traditional system of forest villages and forest villagers and the uncontrolled and unmanaged usufruct right over forest land they exercise is the great concern today for forest department.
n) Vested interest of some of the co-management committee and council members of graving forest lands and not releasing the forest lands for scientific management of national park which were previously occupied, settled and cultivated by them illegally.
o) Lack of approved long term master plan/management plan for the scientific management of the national park.

Suggestions/recommendations to overcome the threats and challenges:

a) The proposed railway and 4-lane highway should be aligned, designed and constructed in such a way of incurring less cost and minimum loss to the national park.
b) There should be an arrangement of sufficient over-pass and under-pass corridor for the uninterrupted and easier movement of wild elephant and some other wild animals.
c) Electric line, telephone line, gas line, optical fiber line and other utility pipe lines can go through beneath the island in the middle of the 4-lane highway to avoid damages of crown and root system of the forest.
d) All kinds of illegal establishments, settlements and encroachments should immediately be evicted and the identified landless poorer can be rehabilitated in a minimum area of ecovillages inside or outside the PA providing necessary facilities.
e) Sufficient skill development trainings and alternative income generation activities should continuously be carried out among the local poor to make them self-sufficient and divert them from forest dependency.
f) Fast growing firewood plantation can be established in the impact zone of national park to meet acute demand of fuel-wood.
g) Substitute of garjan pole can be popularized in salt production.
p) Immediate measures should be taken to correct the false records of forest lands as private or khas lands in BS survey maps and records which were originally recorded in the RS survey as forest lands.
h) Traditional system of forest villages and forest villagers should critically and justifiably be examined and the forest lands over which they do practice their usufruct right can be taken under scientific forest management.
i) Sufficient professional trained staffs should be employed with modern equipment and all necessary logistic supports.
j) Sufficient fund for implementing more ANR and guarding the ANR already established should be provided.
k) Transport facilities should be provided with the supply of necessary fuel and lubricants.
l) Sufficient number of modern arms and ammunition should be provided and regular training should be arranged for the field staffs.
m) Long term master plan/management plan for the scientific management of the national park should be undertaken.
n) Protected Area Rules and/or Co-management Rules should be designed in such a manner that no illegal occupier of forest land can possess any of the positions of Co-management Committee and Co-management Council of the Protected Area.
o) Remuneration of the Community Patrol Group members should reasonably be increased.

Figure 1 MKNP

Figure 2 MKNP

Figure 3 MKNP

“সবুজ হবে মোদের মন“

এ,বি,এম নজরুল ইসলাম,

এই আমাদের জন্মভূমি
এইতো মোদের দেশ
সবুজ শ্যামল সুখের রেশ
লাগবে তখন আহা বেশ।

গাছ লাগাই আর ফসল ফলাই
থাকবে না কোথা খালি
মাটি ভেদে থাকবে গাছ
হো'ক না সেথা বালি।

নদী নালা খালে বিলে
গাছ লাগাই পথের ধারে
ঘরের ছাদে-মাটির টবে
আরো লাগাই নদীর পাড়ে।

লাগাবো গাছ উঠতি চরে
সাগর তীরে পাহাড় পরে
যখন,গাছের পাতা নড়ে চড়ে
হৃদয় মন কার না কাড়ে ?

অক্সিজেন বিলিয়ে দেয়
সারাদিনমান রেখে।
কার্বন-তো শুষিয়ে নেয়
গভীর রাতের আঁধারে।।

ফরেস্ট রেঞ্জার, সামাজিক বন বিভাগ,বগুড়া

টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন সংরক্ষণঃ
সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস -২০১৭

- মার্জিয়া লিপি

২০০৮ সালের মার্চের ২৩ তারিখে টেকনাফ বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের শীলখালী সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বন পাহারা দলের সদস্য রফিকুল ইসলাম সাহসিকতার সঙ্গে বন রক্ষা করতে গিয়ে বন দস্যুর হাতে শহীদ হন; জীবন উৎসর্গ করেন। রফিকুল ইসলাম ছাড়াও কাপ্তাইএর হিরু মিয়া ও অন্যান্য সদস্য - যাঁরা বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতি সংরক্ষণে বনের সম্পদ রক্ষায় জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন – তাঁদের আত্মত্যাগের স্মরণে ও সম্মানে, সকল সবুজ শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশে বনবিভাগ, ইউএসএইড ও রক্ষিত এলাকায় আশেপাশে বসবাসকারীদের যৌথ উদ্যোগে এই দিনটিকে উদযাপিত হচ্ছে 'সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস'।

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস - ২০১৬ তে "সাসটেইনেবল ফিনান্সিং অব কো-ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক সংলাপ

জীবন ও জীবিকার অন্যতম অবলম্বন প্রকৃতি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রকৃতির অবদান অনস্বীকার্য। অথচ প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, উন্নয়ন কার্যক্রম, বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের বনজ সম্পদ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।হ্রাস পেয়েছে বনে বসবাসকারী জীববৈচিত্র্য ও উদ্ভিদরাজি; লুপ্ত হয়েছে অনেক পাখি ও বন্যপ্রাণী । বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে আসছে। সময়ের বিবর্তনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের জনবলের পক্ষে সারাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বিশাল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন এখন আর সঠিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না - প্রয়োজন সম্পদ রক্ষায় নির্ভরশীল জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ অবস্থার উন্নয়ন ও উত্তরণের জন্যে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই সহ ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় সরকার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এই অংশীদারীত্বই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। সম্পদ রক্ষায় ও ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন । দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় এই ধারণাটি নতুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে জনগণের অংশগ্রহণে সফলতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করে আসছে। আশির দশকে আমাদের দেশেও সফলতার সঙ্গে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত সামাজিক বনায়নের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০০৩ সালে ইউএসইইড এর আর্থিক সহায়তায় বন বিভাগ বন ব্যবস্থাপনায় নিসর্গ প্রকল্পে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পাইলটিং করেছে। সরকারের প্রজ্ঞাপণের বলে বনবিভাগ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন, সুশীল সমাজ, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, রক্ষিত এলাকার বনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একযোগে সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। জলাশয় ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাও সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগণের সমন্বয়েও এরূপ সংগঠন রয়েছে। আইপ্যাক (ইন্টিগ্রেটেড প্রটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট) প্রকল্প সময়কালে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে । ২০১৩ সালে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এণ্ড লাইভীহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্পে - ২১ টি রক্ষিত এলাকায় ২৭ টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কৌশলে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতি বছর বনবিভাগ ও সকলের সাথে যোগাযোগ করে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। পরিকল্পনার ভিত্তিতে বন, বন্যপ্রাণী ও বনের উপর নির্ভরশীল মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জীবন ও জীবিকার উন্নয়নেও কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন বন আর প্রকৃতি সংরক্ষণে কাজ করছে আগামী প্রজন্মকে নিয়ে সুন্দর একটা বাংলাদেশে বেঁচে থাকার জন্যে। প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকায় যারা বাস করে, বনের আশে পাশে যারা বেড়ে উঠে তারা নিজেদেরকে প্রকৃতির অংশ মনে করে। নিজেকে মনে করে প্রকৃতির সন্তান, বনকে মনে করে নিজের মায়ের মতো। বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা-সিডর-আইলা-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে বনভূমি মানুষকে মায়ের মতো আগলে রাখে, আশ্রয় দেয়। বনের কাঠ, গোলপাতা থেকে তারা ঘর-বাড়ী, আসবাব পত্র তৈরি করে, নদীর মাছে জীবিকা অর্জন করে, বনের ফল ও মধু তাদের পুষ্টি যোগায়।

চিত্রঃ সিপিজি এর সদস্যদের বন পাহাড়া

চিত্রঃ বিশ্ব বাঘ দিবস উদযাপন

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনে প্রায় ১৬০০ কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপ (সিপিজি) এর প্রতিনিধি বনপ্রহরীদের সাথে বন পাহারা দিচ্ছে। যৌথ টহল দল (সিপিজি) সদস্যরা কিভাবে বন পাহারা দিতে হয়, গাছ-মাছ-বন্যপ্রাণীর অবস্থা বুঝতে হয়, রিপোর্ট রাখতে হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছে, দেশ-বিদেশ থেকে প্রকৃতি সংরক্ষণে বন পাহারায় বিভিন্ন সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছে। টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের খুরশীদা বেগম বনের যৌথ অংশীদারিত্বের জন্য সম্মানজনক পুরষ্কার 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই পুরষ্কার ২০১২' অর্জন করেছেন। সহ ব্যবস্থাপনায় তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এই পুরষ্কার পান। 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তৃতীয় বিশ্ব বন সপ্তাহের সভায় ইটালির রাজধানী রোমে খুরশীদা বেগম এ পুরষ্কার গ্রহণ করেন। তিনি 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই' পুরষ্কারটি অর্জন করেন একজন প্রথম নারী পরিবর্তনকারী হিসেবে তাঁর সমাজে ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। টেকনাফ অভয়ারণ্যের খুরশীদা বেগম প্রথম নারী যিনি বাংলাদেশে প্রথম নারী কমিউনিটি পাহাড়া দলের সূচনা করেন।

চিত্রঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় সিপিজি সদস্য খুরশীদা বেগরমের 'ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই' পুরস্কার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি

সব ধরনের সক্ষমতা থাকার পরও সংগঠন অকার্যকর হয়ে পড়ে মূলত যে কারণে তা হচ্ছে তহবিলের অভাব। আয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট উৎস না থাকলে এবং খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা না থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠান বেশিদিন ভালোভাবে পরিচালিত হয়না। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠান যদি হয় সেবা মূলক তা হলে জনগণের প্রত্যাশা থাকে বেশী। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রতি নির্ভরশীর মানুষের আকাঙ্খা ভিন্ন। এই পদ্ধতির মূল আকাঙ্খাই হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, স্থানীয়ভাবেই বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুবিধা স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করা। এ ক্ষেত্রে সংগঠনের স্থায়িত্বের জন্যে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য তহবিল সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা ও টেকসই বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সহ-ব্যবস্থাপনার অংশ। এ তহবিল সংগ্রহ হতে পারে রক্ষিত এলাকা দর্শনার্থীদের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যেমন গাড়ী পার্কিং, বনে হাইকিং, ঐতিহ্যবাহী উপহার সামগ্রী বিক্রয়, নিরাপদে রাত্রি যাপণের ব্যবস্থা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য দাতা সংস্থার কাছ থেকে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য আবেদন করে তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন খরচ নির্বাহের জন্য সার্ভিস চার্জ নেয়া যেতে পারে। সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ ডাক বিভাগ কিংবা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবেও রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ তহবিল সংগ্রহের কোনো একক উৎসের উপর নির্ভর না করে সৃজনশীলভাবে বহুমাত্রিক উৎস বিবেচনা করতে হবে।

চিত্রঃ স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের পরিচালনায় প্রকৃতি পর্যটন

অর্থনেতিক সক্ষমতা কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব অর্জনের পূর্ব শর্ত। আমাদের এই দেশ প্রকৃতি-পর্যটনের জন্য খুব বেশী উপযোগী - আমাদের প্রকৃতি, পাহাড়, বন্যপ্রাণী, নিসর্গ আর জলাজঙ্গল। প্রকৃতি-পর্যটন হতে পারে আমাদের অন্যতম আয়ের পথ - যেখানে সরকার পর্যটনের পুরো আয় সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রদান করবে। ফলে বনের উপর অপরিকল্পিত ভাবে সম্পদ আহরণকারী ও নির্ভরশীল মানুষের আয়ের পথ সুগম হবে। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে বনের ও বনজীবি মানুষের। সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও বন পাহাড়া দলের সদস্যদের মাধ্যমে প্রকৃতি পর্যটন সংরক্ষিত এলাকাগুলোয় একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের অবকাশ সৃষ্টি করে উপরন্তু ঐ এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। তবে এসকল প্রকৃতি পর্যটন খুব সতর্কভাবে সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে অবস্থান জীববৈচিত্র্যের কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। একই সঙ্গে এ পর্যটন খাত থেকে উদ্ভুত বা সৃষ্ট আয় থেকে যাতে করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও বন পাহাড়া দলের সদস্যরা উপকৃত হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম প্রচার- প্রচারণায় শুধুমাত্র প্রকৃতি অনুরাগী ও প্রকৃতি বান্ধব পর্যটকদের এসকল পর্যটন স্থানসমূহে আসার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হবে। সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি পর্যটন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ- প্রকৃতি সংরক্ষণে সচেতনতা ও প্রকৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিবিধ জীবিকায়নের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের পথ সুগম করে।

চিত্রঃ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যদের প্রকৃতি সংরক্ষণ ও জীবিকা উন্নয়নে ম্যানগ্রোভ নার্সারী ও রপ্তানীযোগ্য সূতার তৈরী খেলনা

বাণিজ্যিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে প্রতিবেশ বান্ধব কোনো কাজের জন্য সহায়তা যা - প্রকৃতি সংরক্ষণে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অথবা সহ- ব্যবস্থাপনা সংগঠনের আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বেশ কয়েকটি আর্থিক উৎসের সুযোগ হতে পারে-

সরকার হতে বার্ষিক বরাদ্দ; জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ হতে উন্নয়ন বরাদ্দ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা; শিল্প-কারখানার মালিকদের কল্যাণ তহবিল, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ব্যাংকএর সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল, সামাজিক বনায়ন, প্রকৃতি পর্যটন, ব্যক্তিপর্যায়ে অনুদান, সিএমসির জন্য এনডোমেন্ট ফাণ্ড, সরকারের জলবায়ু তহবিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০১৭ সালে সহ-ব্যবস্থাপনা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ‘‘টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনা, টেকসই বন সংরক্ষণ”। টেকসই সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সকলের অংশদারীরত্বের মিলিত ও কার্যকর প্রয়াস প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে কাঙ্খিত অর্জনের লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে।

বৃক্ষই জীবনের বন্ধন

বৃক্ষ কবি মোঃ শহীদুল হক আকন্দ

বৃক্ষ জীবনের সাথী সকল কাজের মাঝে,
ঝড় তুফান রক্ষা করে মোদের যত্নে রাখে।
বৃক্ষ প্রকৃতির উপাদান পরিবেশের জন্য এল,
নিজে কিছু না নিয়ে জীবন মানুষকে বিলিয়ে দিল।

বৃক্ষ বন্ধন দেশের চন্দন, সবাই রোপণ করি,
পরিবেশ সুন্দর করতে চল সবুজ বাংলা গড়ি।
বৃক্ষ হতে শক্তি মিলে ধৈর্য্য করি কাজ,
যদি সবাই যত্ন করি, তবেই সবুজ সাজ।

ফলজ বৃক্ষ বাড়ির আঙ্গিনায় শোভা মনরম,
আপন মানুষ দুরে থাকলেও মনটা আনন্দে থাকে চরম।
বৃক্ষরাজ তালগাছ বাংলার লম্বা প্রাণ,
জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও গাছপড়া থেকে দেয় পরিত্রাণ।

বৃক্ষ যতন, সন্তান যতন, এইতো সংসারের খেলা
কষ্টের ফল মধুর বল, ফুরিয়ে যাবে বেলা,
বৃক্ষ মানুষের সমস্যা মিটায় জীবন চলার পথে
চল সবাই জড়িয়ে রাখবো, দুঃখ সুখের সাথে।
বৃক্ষ চন্দন বৃক্ষ বন্ধন, সকলের চোখের মণি,
এমনি সময় আসবে সেদিন, পাব টাকার খনি।

জাতীয় স্বার্থে বন সৃজন অপরিহার্য

আফতাব চৌধুরী

মানুষসহ সমগ্র প্রাণীজগতের প্রতি প্রকৃতির অমূল্য অবদান অরণ্য। অরণ্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ (ফরেস্ট)। শব্দটি মূল লাতিন ভাষার শব্দ 'ফরেস' থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে 'আউটসাইড'। এ 'আউটসাইড' শব্দটি গ্রামের সীমা নির্দেশ করেছিল। যেখানে অনাবাদি জমি মনুষ্য বসতি অঞ্চলেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট এক অঞ্চল হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। সমগ্র বিশ্বের ভৌগোলিক আয়তনের এক তৃতীয়াংশই বনাঞ্চল। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকার জীবজন্তুর আবাসভূমি এ বনাঞ্চল সমূহ। মানব সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে নানা ভাবে সহায়তা করা ছাড়াও পরিবেশ দূষণমুক্ত করে রাখে। উপরন্তু জলবায়ুর উপাদান যেমন উষ্ণতা, বর্ষণ, আর্দ্রতা ইত্যাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করে অরণ্যগুলো আবহাওয়া তথা জলবায়ু বহু পরিমাণে মানব সমাজের অনুকূল করে তোলে। শুধু কি এটাই? দেশের অরণ্যরাজি পাহাড়ি অঞ্চলের পাদদেশে পানি প্রবাহের ধারাও নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরে রাখে। বনাঞ্চলের উপকারিতার শেষ নেই। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের কথা, প্রকৃতি প্রদত্ত এ অমূল্য সম্পদের সংকোচন ঘটছে দ্রুতহারে আমাদের এদেশে।

জাতিসংঘের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৯১ সালে বিভিন্ন কারণে এক কোটি সত্তর লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল ভূপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সবুজভূমি, মরুভূমি, পাহাড়, পুকুর,হ্রদ, নদী, সাগর ইত্যাদির মতো বনাঞ্চলও বাস্তুতন্ত্রও ধ্বংসযজ্ঞে সক্রিয় তথা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে মানব সমাজ। বর্তমানে বিশ্ব ভূখন্ডের মাত্র ত্রিশ শতাংশেই বনভূমি রয়েছে। বিশ্বে প্রতি বছর ১ কোটি হেক্টর ক্রান্তীয় অরণ্যভূমি ধ্বংস হয়।

যে কোন দেশের ভৌগলিক আয়তনের শতকরা ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন যদিও বাংলাদেশে আছে মাত্র ৭/৮ শতাংশ। এ পরিমাণ হ্রাস পাওয়াটা নিঃসন্দেহে চিন্তা জনক বিষয়। প্রতি ২৪ ঘন্টায় দেশে প্রায় ১ লক্ষ গাছ ধ্বংস হয় বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। যখন-তখন বনাঞ্চল সংহার করার ফলে অন্যান্য কুফলের সঙ্গে মরুভূমির সম্প্রসারণ ঘটছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিশাল বনাঞ্চল কেবল মানুষের লোভে ধ্বংস হয়েছে। চাষাবাদ, শিল্পায়ন, নগরায়ণ এ তিন কারণই মুখ্যত বনভূমি ধ্বংসের জন্য দায়ী। আর এক্ষেত্রে কৃষির জন্য সর্বাধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। কৃষিকাজের সম্প্রসারণ বনভূমি ধ্বংসের জন্যও দায়ী।

দ্রুতহারে অরণ্যাঞ্চল কমে আসার কুফল মানব সমাজ ইতিমধ্যেই ভোগ করছে। আধুনিক মানব সভ্যতাকে গতি প্রদান করার ব্যাপারে উলেখযোগ্য অবদান রয়েছে বনভূমির। কিন্তু অরণ্যসমূহের প্রতি মানুষ যে অন্যায় আচরণ করছে তা একদিন মানব সভ্যতার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করবে। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সইডের ভারসাম্য রক্ষায় বৃহৎ পরিমাণের সবুজ গাছ-গাছালি উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভূ-মন্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাস-কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমন্ডলে বেড়ে গেছে। দ্রুতহারে বনানী ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। ভূ-মন্ডলের উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন বিজ্ঞানীমহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

অরণ্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে কার্বন-ডাই-অক্সইডের পরিমাণ কম করে তা নয়, অন্যভাবেও সহায়তা করে। প্রকাশিত দুটি তথ্যেই এর প্রমাণ মিলে। ২.৫ একর বিশিষ্ট একটি বনাঞ্চল বায়ুমন্ডলের প্রায় ৪ টন পরিমাণের ধুলো শোষণ করতে পারে। এছাড়া একটি ঘন অরণ্যভূমি বছরে প্রতি একর জমিকে গ্রাস করতে পারে এমন ০.১৬ টন সালফার-ডাই-অক্সইড অপসারণে সমর্থ হয়। আমরা সবাই জানি সালফার-ডাই-অক্সাইড এক ধরনের দূষিত গ্যাস। শব্দদূষণ রোধের ক্ষেত্রেও অরণ্যের ভূমিকা রয়েছে। গাছ শব্দের তীব্রতা ১০ থেকে ১৫ ডেসিবল কমাতে পারে।

ভূমিস্খলন রোধ, বৃষ্টির পানি ধরে রাখা, মরুভূমির বিস্তার রোধ, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর উপাদান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলবায়ু, আবহাওয়া, মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীকুলের অনুকূলে রাখা ইত্যাদি বহু সুফল ছাড়াও ঔষধিগুণ বিশিষ্ট প্রায় ১০,০০০ উদ্ভিদ অরণ্যে পাওয়া যায়। গাছপালা নিধনের ফলে আমরা যে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়োল মারছি তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

অরণ্যঘেরা কোনও এলাকার বায়ু আর্দ্র অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ুপ্রবাহের উষ্ণতা স্বাভাবিক ভাবেই শীতল অবস্থায় থাকা বনভূমির বায়ুর সংস্পর্শে কমে এবং এর ফলে বৃষ্টি হয়। এ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় ভাবে বর্ষণের বিতরণেও অরণ্য প্রভাব ফেলে। বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে অনেক সময়ে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মরুভূমির

বালিকণা, ঘূর্ণিঝড় অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির সম্প্রসারণ ঘটায়। গাছ-গাছালি থাকলে মরুভূমির বিস্তার বাধা পায়, কারণ বালিকণা আটকে থাকে গাছের লতাপাতায়। তা ছাড়া, বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়ে মরুভূমির শুস্ক অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয় না। ফলে মরুভূমি বিস্তার লাভ করতে পারে না। অরণ্যের এ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ভারতের একমাত্র মরুভূমি থর মরূভূমির লাগোয়া অঞ্চলে ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮ কিলোমিটার চওড়া অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ করে অরণ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা এক বিরাট সাফল্য।

বাতাস ও পানির আঘাতে ভূমির ক্ষতি হয়। অরণ্য কিন্তু এ ক্ষতি থেকে ভূমিকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের দেশে বছরে হাজার হাজার একর জমি বাতাস পানি দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অরণ্য ধ্বংস হওয়ার ফলেও ভূমির খলন দ্রুত ঘটছে। অন্যদিকে জুম চাষের জন্য দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বনাঞ্চল অনেকটা কমেছে। আর এতে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বেড়েছে। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে জুম চাষ নামে পরিচিত স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। জুম চাষের জন্য দেশে বছরে হাজারো হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হয় বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। ক্রান্তীয় অরণ্যাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রতিদিন লুপ্ত হচ্ছে মানব সমাজের প্রয়োজনীয় ১০০ ধরনের মূল্যবান বনজ সম্পদ।

বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে বনজ জীব-জন্তুর আবাসভূমির অভাব ঘটছে এবং অনেক বন্য জীবজন্তু খাদ্যভাব বা অন্যান্য কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়াও জনবসতি গুলোতে তারা বেরিয়ে আসার ফলে অনেক মূল্যবান মানব জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটছে। হাতি, বাঘের উপদ্রবের খবরও মাঝেমধ্যে সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে। অরণ্যভূমি ধ্বংসের অন্যতম কুফল এটা।

বনাঞ্চলের উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর সংরক্ষণ তথা রক্ষণাবেক্ষণের ওপর বর্তমানে যথেষ্ট সরকারী, বেসরকারী এমনকি সামাজিক ও ব্যক্তি পর্যায়েও গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বনানীকরণ ও পুনর্বনানীকরণের উপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক বনানীকরণ কর্মসুচি ক'বছর আগে শুরু করেছিল সরকার। অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি প্রোগ্রামে এক টুকরো জমিতে চাষাবাদ, গাছ লাগানো ইত্যাদি করা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পতিত জমির সদ্ব্যবহার হয়। এর ফলে চাষিরা শস্য ছাড়াও পশুখাদ্য, জ্বালানি হিসেবে খড়ি, ফলমূল ও কাঠ পান।

পর্যাপ্ত বনভূমি থাকার পরও প্রতিবেশী দেশ ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভূটান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম তাদের নিজ নিজ দেশের বনাঞ্চলকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ সকল দেশে সামাজিক বনানীকরণ বিভাগ অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি, কম্যুনিটি ফরেস্ট্রি, কর্মাশিয়াল ফরেস্ট্রি এবং আরবান ফরেস্ট্রিসহ বিভিন্ন কর্মসুচী হাতে নেয়া হয়েছে। অরণ্য সমূহের উপর মানব সমাজের বিভিন্ন কারণে প্রয়োগ করা চাপ কম করাটা সামাজিক বনানীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। বনাঞ্চলগুলোর নিবাসী মূল্যবান বন্যপ্রাণীগুলোর সংরক্ষণের জন্যও প্রণয়ন করা হয়েছে নানা কর্মসূচী। ভারত সম্ভবত বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যেখানে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দেশে বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রোজেক্ট টাইগারের জন্য কুড়িটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য বাছাই করা হয়েছে। বন্য জন্তুগুলোর প্রাকৃতিক আবাসভূমি অরণ্যসমূহের সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বছরব্যাপী বন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারতসহ অন্যান্য দেশে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আমি এখানে ক'টি উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাই, আশা করি পাঠকমহল অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, সততা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা থাকলে যে কোন মহৎ কাজে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং এতে সফলতা আসে- যেমন ২০১৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব রাহাত আনোয়ারের (বর্তমান সিলেটের জেলা প্রশাসক) নেতৃত্বে ''সবুজ তারাগঞ্জ গড়ি'' কর্ম পরিকল্পনার আওতায় ১৩৫টি রাস্তায় সকাল ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে মাত্র ১ ঘন্টা সময়ে আড়াই লাখ গাছের চারা রোপণ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ৪৫টি ওয়ার্ডের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জন-প্রতিনিধি, ইমাম, সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, কৃষকসহ বিভিন্ন পেশার ৩৫ হাজার মানুষ ৪৬০ কিলোমিটার রাস্তার উভয় পার্শ্বে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকি, মেহগনি, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়াসহ ৪০ প্রজাতির ফল, ফুল, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেন। চারা গাছ রোপণের এ মহৎ কাজে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের প্রত্যেকেই রোপিত গাছের চারা বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন উপস্থিত জন সমাবেশে।

জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ারের মহৎ এ উদ্যোগ সকল মহলে প্রশংসিত হয়। জেলার অনেকেই বৃক্ষ রোপণের মত মহৎ কাজে আগ্রহী হয়ে গাছের চারা রোপণে এগিয়ে আসেন এবং অনেক সরকারী বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এমনকি ব্যক্তি পর্যায়েও অনেকেই গাছের চারা রোপণ করে তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন বৃক্ষরোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে তা বাঁচিয়ে রাখা এবং বনাঞ্চল সৃষ্টি করা এক মহৎ কাজ। তিনি এও বলেন যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে কোন মহৎ কাজে সফলতা আসেই।

আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রয়াসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে যদি আমরা বৃক্ষরোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করি তাহলে এদেশকে সবুজে সমৃদ্ধ করা কোন কঠিন কাজ নয় এবং এটাই হবে সবচেয়ে মহৎ কাজ, যা প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই প্রয়োজন।

আমাদের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট পাহাড়ী দেশ ভুটানের দিকে তাকাই। এদেশের জনসংখ্যা মাত্র ৩ লাখের মত। ভূটানের রাজা জিগমে খেসর পিয়াল ও রানী জেটসুন প্রেমার ঘরে জন্ম নিয়েছে প্রথম সন্তান । এ উপলক্ষে দেশের জনগণ এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন প্রজাতির বিশেষ করে ফলজ ১ লক্ষ আট হাজার গাছের চারা একদিনে রোপন করেছেন দেশের জনগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে । গত ৫ ফেব্রুয়ারী রাজা খেসর রানী প্রেমা তাদের প্রথম সন্তান জন্ম হওয়ার ঘোষণা দেন। প্রতিটি গাছে নবজাতকের জন্য এক একটি প্রার্থনা সেটে দেওয়া ছিল। দীর্ঘায়ূ, সুন্দর সহানুভূতির প্রতীক গাছকে বৌদ্ধ ধর্মে পবিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। গাছের চারা রোপনের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৮ হাজার সংখ্যাটিই মানা হয়েছিল। কেননা বৌদ্ধরা ১০৮ সংখ্যাটি পবিত্র বলে মনে করেন। ৮২ হাজার পরিবার ১টি করে গাছের চারা রোপন করেছে। গাছের চারা রোপন করে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে রোপিত গাছের প্রতিটি চারা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করে বড় করে তুলবে। এতে ছোট দেশ ভূটান আরও সমৃদ্ধশালী হবে। এর আগের বছর এক ঘন্টায় ৫৯ হাজার ৬৭২ টি গাছের চারা রোপন করে বিশ্ব রেকড সৃষ্টি করেছিল এ ভূটানিরাই। উলেখ্য ভূটান ছোট দেশ হলেও ফলজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাদের দেশের প্রতিটি মানুষই দেশপ্রেমিক, রাজাভক্ত এবং দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ল্যাবি এইচ এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. ডাবিউ জামান বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ নিয়ে এক গবেষণা করে জানিয়েছেন দেশের সড়ক, রেলপথ, নদী, খালের দুই পাশে চা বাগানের পরিত্যক্ত ভূমি এবং টিলা পাহাড়ে পরিকল্পিত ভাবে ১২০ কোটি ফলদ বৃক্ষ লাগিয়ে ১০ বছরে মাত্র ফল ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ করা খুবই সহজ। এতে ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে এই সঙ্গে ৫০-৬০ লক্ষ টন ফল বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। পশু পাখির আগমন ভারবে, সুন্দর হবে পরিবেশ, অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, দেশ হবে সমৃদ্ধশালী। আমাদের সরকারের নীতি নির্ধারকরা এ ব্যাপারে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসলে এ কাজে সফলতা খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

যে কোনও প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য জনগণের সহযোগিতা জরুরী। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে বনধ্বংসে লিপ্ত দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হতে হবে। সরকারকেও এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। মনে রাখতে হবে মূল্যবান একগুচ্ছ গাছ ধ্বংস করতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু সে গাছ গজিয়ে উঠতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রবীণ সাংবাদিক-কলামিস্ট। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার (১ম স্বর্ণ পদক) প্রাপ্ত।

বনের প্রাণ বন্যপ্রাণি

শেখ মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন

বনের প্রাণ হচেছ বন্যপ্রাণি। বন্যপ্রাণি না থাকলে বন তার প্রাণ হারাবে,সজীবতা মুছে যাবে,স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় সবুজের সমাহার দেখা যাবে না এমনকি পুরো বনভূমি একসময় মরুভূমিতে পরিণত হবে। বর্তমানে বন সংরক্ষণের যেসব পদক্ষেপ নেয়া হচেছ তা শুরু হয়েছে বছর তিনশ আগে। কিন্তু এর আগে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে যে বন ছিল তা কে বা কারা সংরক্ষণ করত।পৃথিবীর এই বিশাল বন কিভাবে ঠিকেছিল। এখন ও প্রাকৃতিক বনে কোন গাছ লাগাতে হয়না, গাছের পরিচর্যা করতে হয়না, সেচ বা পানি দেয়ার প্রয়োজন হয়না, বনের মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হয়না। বনের চারাগাছে যেসব বিভিন্ন ধরনের শূককীট আক্রমন করে তা নিয়ন্ত্রনের জন কোন কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়না। বন সংরক্ষণের এসব কাজ প্রাকৃতিক-ভাবেই বনের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রাণিরাই করে থাকে। এটি মূলত বন ও বন্যপ্রাণির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মিথোস্ক্রিয়তার ফলমাত্র। বন্যপ্রাণি কিভাবে বন সংরক্ষণ করছে তা তুলে ধরতেই এই প্রবন্ধের অবতারনা।

বনে যেসব প্রাণি বাস করে তাদেরকে বন্যপ্রাণি বলে। যেমনু ব্যাঙ, সাপ, কচ্ছপ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি,বাঘ,হরিণ,হাতি,বানর ইত্যাদি। বন্যপ্রাণির প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হচেছ এরা স্বাধীনজীবি। জীবনের কোন পর্যায়ে মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং মানুষের সাহায্য ছাড়াই প্রজননের মাধ্যমে নিজের বংশধারা অব্যাহত রাখতে পারে। বন্যপ্রাণি হচেছ মানুষ বাদে এবং গৃহপালিত নয় এমন উভচর,সরীসৃপ,পাখি ও স্তন্যপায়ী পর্যন্ত চারটি শ্রেণিভূক্ত প্রাণিকে বুঝায়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি কিভাবে বন সংরক্ষণ করছে প্রথমে সেটি আলোচনা করি। বনে কেউ কি কখন ও রাসায়নিক ওষুধ ছিটিয়েছে ? তাহলে এত বিশাল সবুজের সমাহার কিভাবে সম্ভব হল ? বনের এত অসংখ্য পোকা এবং তাদের শূককীট কোথায় গেল। আসলে বন্যপ্রাণি বিশেষত:পতঙ্গভূক পাখি খাবার হিসেবে এদের গ্রহণ করে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রায় সারা বছরই পতঙ্গ খেয়ে উপকার করছে দোয়েল, ফিঙ্গে, টুনটুনি, বুলবুলি, লেজনাচানী, সাতভায়লা, কাঠঠোকরা শ্যমা, কসাই পাখি ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রজাতির কাঠঠোকরা গাছের কান্ডে যেসব পোকামাকড় দেখা যায় সেসব খাবার হিসেবে গ্রহণ করে অতিরিক্ত পোকার আক্রমণ হতে গাছকে রক্ষা করে। অন্যতায় গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হত, ফুল-ফল ধারণ ক্ষমতা লোপ পেত এবং একসময় গাছটি শুকিয়ে মারা যেত।

ফুল হতে ফল হয়,ফল হতে বীজ হয়,বীজ হতে নতুন এক চারার জন্ম হয় এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বট বা বটজাতীয় গাছের ফলের বীজ হতে এভাবে চারার জন্ম হয়না। বটজাতীয় গাছের বীচি পাখির দেহে খাবারের সাথে প্রবেশ করার পর পাখির পাকস্থলী থেকে যে পাচক রস বের হয় তার সাথে বিক্রিয়ার পরই অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত হয়। এইসব পাখি যখন মলত্যাগ করে তখন মলের সাথে ঐসব পাচিত বীজ বেরিয়ে আসার পর বৃষ্টির পানি ও সূর্যের আলোর সহায়তায় অঙ্কুরোদগম হয়। বিভিন্ন প্রজাতির শালিক, বুলবুলি,বসন্ত বাউরি, কোকিল, ইত্যাদি পাখি বটের গোটা গিলে ফেলে। পাখির পেটে বটের গোটার নরম অংশ হজম হয়ে যায় কিন্তু বীচি বিভিন্ন পাচক রসের সাথে বিক্রিয়ার পর মলের সাথে বেরিয়ে আসে এবং জন্ম দেয় এক নতুন বটের।

বনের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কোন সার প্রয়োগ করতে হয়না। বনের ঝরাপাতা,বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পড়ে যাওয়া পুরো গাছ মাটিতে পড়ে পচেঁ গিয়ে মাটিতে মিশে যায় এবং এই পচাঁ মাটি আসলে জৈব সার। তবে এভাবে সার হতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু বিভিন্ন বন্যপ্রাণি বিশেষ করে তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণি যেমন--হরিণ, শুকর, চিত্রা হরিন,হাতী ইত্যাদি গাছের কচিপাত-া,ফুল-ফল খাওয়ার পর অপ্রাচ্য অংশ মল হিসেবে বের করে দেয় যা কম সময়ের মধ্যে মাটিতে মিশে যায়। প্রকৃতপক্ষে এসব মলই বনের মাটিতে জৈব সার হিসেবে ব্যাবহৃত হয় এবং বনের উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

স্থলচর বিভিন্ন তৃণভোজী প্রাণি যেমন শুকর, হরিণ, সজারু, হাতী,পাহাড়ী কচছপ প্রতিদিন বিভিন্ন আগাছার কচিপাতা খেয়ে এদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং বনের মধ্যে আগাছার সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতর রাখে অন্যতায় বিভিন্ন আগাছার কারণে অনেক উপকারী বৃক্ষ জন্মাতে পারত না।

ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর, বন্যপ্রাণী শাখা, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।

বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণে বন্যপ্রাণির ভূমিকা অনস্বীকার্য।শত শত বছর ধরে সুন্দরবন এত সৌন্দর্য্য নিয়ে দাড়িঁয়ে আছে একমাত্র রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কারণে। এই বাঘ মামা না থাকলে চোরা শিকারীরা অনেক আগেই সুন্দরবন উজার করে ফেলত। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বন যেটুকু আছে তা ও আরেক মামা/মৌ হাতীর কারণে। হাতী না থাকলে এসব বনাঞ্চল অনেক আগেই বসতিতে ভরে যেত। একমাত্র হাতীর আক্রমন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোকজন বনের ভেতর ব্যাপকহারে বসতি করার সাহস করছেনা।

পরাগায়ন হচেছ ফুলের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের মিলন। বনে পরাগায়নের এই কাজে কিছু পাখি সরাসরি ভুমিকা পালন করে। মধুচুষকি,ফিঙ্গে, বুলবুলি,ময়না ,ভীমরাজ,শালিক এসব পাখি ফুলের ভেতর ঠোঁটঢুকিয়ে মধু চোষার সময় ঠোঁটের গোড়ায় পালকে পরাগরেণু লাগে। এক ফুলের মধু চোষার পর যখন আরেক ফুলে যায়, তখন পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে পরাগায়ন বা ক্রস ফার্টিলেজেশন হয়।

বন্যপ্রাণি যেমন প্রাকৃতিকভাবেই বন সংরক্ষণ করছে ঠিক তেমনি বন-- বন্যপ্রাণিদেরকে আবাসস্থল ও খাদ্য সরবরাহ করছে।শুধু তাই নয় অসুস্থ বন্যপ্রাণিদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ঔষধি গাছ আছে বনের ভেতরেই। আর বন্যপ্রাণির সবচেয়ে বেশী জরুরী অক্সিজেনতো বনের গাছপালায় সরবরাহ করছে।বন ও বন্যপ্রাণি একের অনুপস্থিতিতে অন্যের অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। একে অপরকে প্রতিনিয়ত নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এভাবেই বন ও বন্যপ্রাণীর পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে সুন্দর ও সবুজ পৃথিবী।

বাংলার বুনোফুল

মোকারম হোসেন

একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মাত্র কয়েক হাত পতিত জমিতে কয়েকজাতের তৃণ-গুল্ম, ঘাস ও লতাপাতার বসবাস। এটা আমাদের মাটির গুণ, প্রকৃতির আর্শিবাদ। হিমালয়ের উজান থেকে ছুটেআসা পলি আমাদের মৃত্তিকাকে করেছে উর্বর। একারণেই আমাদের চারপাশ দুর্মর সবুজে মোড়ানো। শুধু তা-ই নয়, এই সবুজকে আরো বর্ণাঢ্য করে তুলেছে আমাদের বর্ণিল পুষ্পরাজি। এসব পুষ্পমেলার একটি ক্ষুদ্র অংশ বুনোফুল। বুনোফুল যে কতটা ঐশ্বর্যমন্ডিত আর নান্দনিক হতে পারে তা ভালোভাবে খেয়াল না করলে কোনোদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নিত্যদিন পথ চলতে এরাই আমাদের সঙ্গী হয়, মন ভালো করে দেয়। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার চাপে কমে যাচ্ছে ওদের আবাসস্থল। একসময় যে সব বুনোফুল অঢেল ছিল, এখন সেগুলো খুঁজে পাওয়া রীতিমতো সৌভাগ্যের। এই প্রবণতা থামাতে না পারলে নিকট-ভবিষ্যতে আমাদের চারপাশে বুনোফুল বলতে আর কিছুই থাকবে না। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এমন কটি বুনোফুলের পরিচয় জানা যাক।

দাঁতরাঙা

আমাদের পাহাড়ি এলাকা কিংবা শালবন ও শিলামিশ্রিত ভূ-অঞ্চলেই কেবল দাঁতরাঙা দেখা যায়। বিশেষত সিলেটের পাহাড়ি এলাকায় যত্রতত্র চোখে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী প্রস্ফুটন প্রাচুর্য, উজ্জ্বল বেগুনি রঙ এবং গুল্ম আকৃতির হওয়ায় দাঁতরাঙা সবধরনের বাগানেই মানানসই। ফুল ও পাতার সৌন্দর্যেও গাছটি অনন্য। এমন যুৎসই এফুলটি নগর উদ্যানে উপেক্ষিতই বলা যায়। আমাদের সড়ক বিভাজকগুলোতেও এফুল থাকতে পারে। সিলেট ছাড়া পঞ্চগড়, গাজীপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামেও ফুলটি সহজলভ্য। পাহাড়ের ঢালু ও আশপাশের পতিত স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সাদা ও বেগুনি রঙের মধ্যে বেগুনি রঙটাই বেশি চোখে পড়ে। পাতা চকচকে সবুজ, শিরা সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ ও ভারতের নিজস্ব ফুল। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই সহজলভ্য।

দাঁতরাঙা (Melastoma malabathricum) ঝোপাল গাছ, ১ থেকে ২ মিটার পর্যন্ড় উঁচু হতে পারে। পাতা ডিম্ব-আয়তাকার, রোমশ, তাতে সমান্ড়রাল শিরা। প্রায় সারা বছরই ফুল। ডালের আগায় অল্প কয়েকটি ফুল গুচ্ছবদ্ধ থাকে। ফুল বড়, ৫ তেকে ৬ সেমি চওড়া, গন্ধহীন। মাঝখানে হলুদ ও বেগুনি রঙের অসমান কয়েকটি পুংকেশর আছে। ফল ডিম্বাকার। বীজ খুব ছোট, কালো শাঁসে জড়ান। বীজ ও কলমেই চাষ। সিলেটে স্থানীয় নাম লুটকি।

গোট বেগুন/ তিত বেগুন

দেশের সর্বত্রই বুনো হিসেবে জন্মে। বলধা গার্ডেন ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে। গোট বেগুন (Solanum torvum) প্রসারিত গুল্ম, ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, কাে কাঁটা আছে। পাতা ডিম্বাকৃতি। ফুল গুচ্ছাকার, সাদা। ফল গোলাকার, বেরি আকৃতির। ফল কাঁচা অস্থায়ও রান্না করে খাওয়া যায়। আবার সাপের কামড়ে প্রতিষেধক হিসাবেও কাজে লাগে। বীজ থেকে চারা। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় সহজলভ্য।

মটমটিয়া/বনপুঁদিনা

বান্দরবানের মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে বেড়াতে গিয়ে ফুলের সৌন্দর্য নজর কাড়ে। পাহাড়জুড়ে অসংখ্য ফুলের মেলা। রাঙামাটি এবং সিলেটের পাহাড়েও দেখেছি। সমতলেও দুস্প্রাপ্য নয়। দারুণ কষ্ট সহিষ্ণু, পানির নিচেও দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে। পানি সরে গেলে আবার ফুল-পাতায় সজ্জিত হতে বেশি সময় লাগে না। তবে বর্ষায় ডুবে থাকার সময় মটমটিয়ার (Lippia geminata) ঝোপে ছোট মাছদের বেশ আড্ডা জমে। কারণ ঝোপেজমা শ্যাওলা তাদের অন্যতম খাবার। বাকলের ঘ্রাণ চিংড়ি মাছের প্রিয়। এরা বাক্কান বা বনপুঁদিনা নামেও পরিচিত। ঝোপজাতীয় গাছ। ডালপালা ও কা নরম, ভাঙার সময় মট্ করে শব্দ হয় বলেই সম্ভবত এমন নামকরণ। পাতা আয়তাকার, ঝাঁঝালগন্ধি, কিনারা করাতের মতো। বিপরীতমুখী দুই পাতার কোলে ফুল ফোটে, পাপড়ি সংখ্যা ৪-৫, নীলচে গোলাপি রঙের মাঝখানে হলুদের ছিটা। শীত ও বর্ষায় বেশি ফোটে। কেউ কেউ বেড়া তৈরিতেও কাজে লাগান।

বনওকরা/জংলিঘাঘরা

পাহাড়ের কোলে সরু পথের ধারে সকালের ঝলমলে আলোয় হাসসৌজ্জ্বল ফুলটি আমার নজর কাড়ে। দুচোখ ভরে রূপ দেখি। ক্যামেরা তাক করতেই সে রঙ লুকিয়ে ফেলে। নিশ্চয়ই অভিমানী। অবহেলিত বুনোফুল বলেই কী? হতেও পারে। একসময় বনের ধারে, পতিতজায়গায় ও পথপাশে অঢেল দেখা গেলেও এখন সংখ্যায় কমেছে। বনওকরা (Urena lobata) খাড়া ও অমসৃণ ডালের গাছ, ১.২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। পাতা ছড়ানো, কিনারা অসমান, অনমনীয় ও বিপ্রতীপ বিন্যাসের। ফুল ছোট, গুচ্ছবদ্ধ ও গোলাপি রঙের। বৃতির খোলামুখ ৫টি, পাপড়ি সংখ্যা ৫, বাটির মতো গড়ন, পরাগকেশর অসংখ্য। প্রস্ফুটন প্রায় বর্ষব্যাপ্ত। ফল শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে। শিকড় স্নায়ুর প্রদাহে ব্যবহার্য। গাছ থেকে তৈরি হয় ট্যানিন ও ম্যালভিন। মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডেও সহজলভ্য।

Supported by

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

Food and Agriculture Organization of the United Nations

SilvaCarbon

BFI বৃক্ষ ও বন জরিপ বাংলাদেশ

The Bangladesh Forest Inventory (BFI) is a process, led by the Forest Department, with technical assistance from the Food and Agricultural Organization of the United Nations and SilvaCarbon, and financial support of the United States Agency for International Development (USAID).

The BFI collects information about the status of the county's tree and forest resources in order to understand their uses, benefits and values and to assist their sustainable management. The BFI is a continual process of forest resource assessment which began in 2016 and will provide regular, periodic updates perpetually.